বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

*   *   *   *

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

*   *   *   *

এ মুখার্জ্জী এণ্ড কোং ঃ কলিকাতা

প্রকাশক : অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

*　　*　　*

মুদ্রাকর : যোগেশচন্দ্র সরখেল
কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ
৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ　　বৈশাখী পূর্ণিমা ১৩৫৬ সাল

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার পত্নী ও পুত্রকন্যাগণকে।

ভূমিকা

এই গ্রন্থের দশম অধ্যায় ব্যতীত বাকী এগারটি অধ্যায় "প্রবাসীতে" ১৩৫৪ সনের ভাদ্র হইতে ১৩৫৫ সনের চৈত্র পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে বাহির হইয়াছিল।

যে ভ্রমণকে আশ্রয় করিয়া এই গ্রন্থ, তাহা ১৩৫৩ সনের আশ্বিন মাসে আরম্ভ হইয়া পরবর্ত্তী চৈত্রে সমাপ্ত হইয়াছিল। এই সময় মধ্যে গ্রন্থকার বিমানে পাঁচটি মহাদেশ ও তিনটি মহাসাগর অতিক্রম করেন। ভূ-বিষুবরেখা দুইবার এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা একবার অতিক্রম করেন। ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়া এই চারিটি দেশের প্রত্যেকটিতে চার হইতে সাত সপ্তাহ পর্যন্ত অবস্থান করেন। পথে রণবিধ্বস্ত প্রাচ্যদেশ সমূহ প্রত্যক্ষ করেন।

পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় দেশ চতুষ্টয়ে এবং রণবিধ্বস্ত প্রাচ্যে যুদ্ধোত্তরকালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে ভাঙ্গাগড়া চলিয়াছে—তাহার যতটুকু চোখে পড়িয়াছে তাহা তিনি যথাযথ লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিষয়বস্তু পরিস্ফুট করিবার জন্য এই ভাঙ্গাগড়ার কার্য্য কারণ পর্য্যালোচনা করিতেও স্থানে স্থানে চেষ্টা করিয়াছেন। ইতি

কলিকাতা, ৬ই চৈত্র,

১৩৫৫ সন।

সূচীপত্র

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

প্রথম অধ্যায়

কলিকাতা হইতে লণ্ডন

সন ১৩৫৩ সালের আশ্বিন মাস। বঙ্গমাতা দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গাবিধ্বস্তা। তথাপি তাঁহার উদার শারদাকাশে সর্বগ্লানিহারী প্রসন্নতা; শেফালিকাঞ্চলা পদ্ম-পত্র-নয়নার বদনকমলে কাশ-কুসুমের হাসি; আনন্দময়ীর আগমনী গানে বাঙালীর মন সমুৎফুল্ল। দ্রুত-সমাপ্য রাজ-কার্যোপলক্ষ্যে আমি দেশ-দেশান্তরে চলিয়াছি।

১৪ই আশ্বিন,* মঙ্গলবার। সকাল সোয়া আটটায়† দমদম বিমান-ঘাটি হইতে বিমান উড়িল। উঠ্‌তি বিমানের সামনে ও পিছনে দমদম শহরটি সুন্দর দেখাইতেছিল। গৃহরাজি যেন শ্যামলকুঞ্জ-মধ্যবর্তী। নারিকেল-বৃক্ষ-শ্রেণী সবার উপর মাথা তুলিয়া সমীরণ-ভরে হেলিয়া-দুলিয়া আমাকে হাতছানি দিতেছিল। উইলিংডন সেতুর উপর দিয়া গঙ্গা পার হইবার সময় বামে উত্তর-কলিকাতার সৌধশ্রেণী, উত্তুঙ্গ হাওড়ার পোল এবং অসংখ্য নৌকানিষেবিত গঙ্গাস্রোত সমবায়ে এক অপূর্ব দৃশ্য চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিল।

---

* ১লা অক্টোবর, ১৯৪৬। † ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম।

আট হাজার ফুট উঁচু দিয়া ঘণ্টায় প্রায় আড়াই শত মাইল বেগে বিমান গর্জন করিয়া ছুটিতেছে। বর্ষাবিধৌত পরিষ্কার আকাশ। দু-এক টুক্‌রা সাদা মেঘ এখানে ওখানে উপরে ও নীচে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। নীচের দৃশ্যাবলী পরিষ্কার দেখা যাইতেছে।

শস্য-শ্যামলা সরিৎ-মেখলা বঙ্গমাতার রূপ উপর হইতে অপরূপ দেখাইতেছে। মাঝে মাঝে সবুজ গাছে ঘেরা গ্রাম ও শহর। দামোদর নদ ও তাহার উপনদী, শাখানদীগুলি মিলিয়া বঙ্গমাতার তরুলতাশোভিত গাত্রে অপূর্ব আভরণ রচনা করিয়াছে। মাঠের মধ্যে জমির আলগুলি পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ক্রমশঃ লালমাটির দেশে উপনীত হইলাম। অ-প্রসন্ন-সলিলা কুলঙ্কষা শোণ নদীকে দ্রুত অতিক্রম করিয়া সলীলগতি গৈরিক-বসনা গঙ্গানদী দর্শনে পবিত্র বোধ করিলাম। কিছুক্ষণ গঙ্গানদীকে সানন্দে অনুসরণ করিলাম। গঙ্গার মনোরম ছবি অন্তর্হিত হইল। চারিদিকে বিশাল প্রান্তর। গ্রাম ও শহরগুলি এখন আর ঘন নয়। সুরম্য লক্ষ্ণৌ নগরী দর্শনে মন আহ্লাদিত হইল। সহসা নূতন দিল্লীর নূতন সৌধ-শ্রেণী দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বেলা পৌনে বারোটায় বিমান দিল্লীর পালাম বিমানঘাটিতে অবতরণ করিল।

কিঞ্চিদধিক এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর আমরা আবার উড়িলাম। এবার আর সবুজ চোখে পড়ে না। বিস্তীর্ণ মরুভূমি। করাচীর কিছু পূর্বে জলসেঁচের খালগুলি দেখা যাইতে লাগিল।

আবার কিছু কিছু সবুজ দেখা দিতে লাগিল। ন' হাজার ফুট উঁচু দিয়া উড়িয়া বৈকাল প্রায় চারিটায় করাচী বিমানঘাটিতে নামিলাম। বিমানঘাটি হইতে কোম্পানীর বাস আমাদিগকে শহরের প্যালেস্ হোটেলে লইয়া গেল। রাস্তায় উষ্ট্র-পৃষ্ঠারোহী যাত্রীদল দেখিলাম। দিবালোকটুকুর সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার মানসে একটি ট্যাক্সি লইয়া শহর দেখিতে ছুটিলাম। ক্লিফ্টন সমুদ্র-সৈকতে নামিয়া সমুদ্র ও পোতাশ্রয়ের দিবাবসানকালের শোভা প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া লইলাম। বিস্তীর্ণ বেলাভূমি। সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। তন্মধ্যে একটি পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া অকম্পিত দেহে সমুদ্রের ঢেউ উপভোগ করিতেছে। দক্ষিণে চক্রাকার পোতাশ্রয় ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জাহাজসমূহ। সূর্যাস্ত হইয়া গেল। চারিদিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। বঙ্গদেশে আমার গৃহে তখন বিল্ববৃক্ষ-মূলে দুর্গামাতার অকালবোধন হইতেছে। হোটেলে ফিরিলাম।

হোটেলে রাত্রি যাপন করিয়া ভোরে অন্ধকার থাকিতে বিমানঘাটির দিকে রওনা হইলাম। সেখানে পুলিস, শুল্ক ও স্বাস্থ্য বিভাগের ঘাটি অতিক্রম করিয়া সূর্যোদয়কালে সাতটায় পুনরায় উড়া সুরু করিলাম। কিঞ্চিদধিক দশ হাজার ফুট ঊর্ধ্বে ঘণ্টায় প্রায় আড়াই শত মাইল বেগে উড়িতেছি। তথাপি মনে হয় বিমান সম্পূর্ণ স্থির, যেন বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া আছি। কেবল প্লেনের দারুণ গর্জন অনবরত কানে আসিতেছে। আমাদের দক্ষিণে ইরাণের পর্বত-বন্ধুর অনুর্বর উপকূল। বামে

সমুদ্র। উপরে পরিষ্কার নীলাকাশ। নীচে নীলাম্বুরাশির উপর ভাসমান মেঘমালা বালসূর্য-কিরণে উদ্ভাসিত। কোথাও মেঘগুলি সাদা ভেলার মত ভাসিতেছে। কোথাও মনে হইতেছে যেন তূলার পর্বতমালা দাঁড়াইয়া আছে। প্রভাত-সূর্যের কিরণ তাহাদের উপর পড়িয়া সুন্দর দেখাইতেছে। নীচে দু'একখানা ষ্টীমার দেখা গেল। একটি নদী আসিয়া সমুদ্রে মিলিয়াছে। সমুদ্র ছাড়িয়া নদীর উপ র দিয়া উড়িতেছি। ছোট বড় নৌকা ও ষ্টীমার নদীতে চলিতেছে। সহসা অনুর্বর ভূমির মাঝখানে নদীতীরে একখণ্ড তৃণাচ্ছাদিত জমি দৃষ্টিগোচর হইল। অপর তীরে ঘরবাড়ী। প্লেন নামিতে সুরু করিল। নীচে আসিতে দেখিলাম যে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড আসলে বিস্তীর্ণ খর্জুর-বন। ছয় ঘণ্টা উড়িয়া ভারতীয় সময় একটায় আমরা টাইগ্রিস তীরবর্তী বস্‌রা শহরে নামিলাম। তখন স্থানীয় সময় সকাল দশটা। ছয় ঘণ্টায় আমাদের তিন ঘণ্টা সময় লাভ হইয়াছে।

এক ঘণ্টা বস্‌রার খ-পোতাশ্রয়ে বিশ্রাম করিয়া স্থানীয় কর্ম-চারিগণের আতিথেয়তা উপভোগ করিয়া আবার উড়িলাম। তারপর ইরাক ও ট্রান্স-জর্ডনের বিস্তীর্ণ মরুভূমি পাড়ি সুরু হইল। এক স্থানে ডাইনে দূর হইতে ভূমধ্যসাগর দেখা গেল। সুয়েজখালকে অতিক্রমকালে মুক্তামালার মত মনে হইল। খালটি পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হইল। সহসা দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে এক নয়নাভিরাম সবুজ দেশ দেখা গেল। ইহা মিশর

দেশ। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা উড়িয়া নীলনদ-তীরবর্তী কায়রো শহরে নামিলাম।

কোম্পানী কায়রোতে আমাদিগকে হোটেল মেট্রোপলিটনে লইয়া গেল। তখন ঘণ্টাখানেক দিবালোক আছে। একটি গাইড জোগাড় করিয়া ট্যাক্সি লইয়া তৎক্ষণাৎ শহর দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। শহরে ফরাসী ইঞ্জিনীয়রগণের পরিকল্পিত সুন্দর রাস্তা ও বাড়ীগুলি বেশ লাগিল। শহর হইতে দূরে বিশ্ববিখ্যাত পিরামিড্ পর্যন্ত সোজা চলিলাম। পিরামিড্‌গুলি প্রস্তর-নির্মিত, বিরাটকায়; ক্রমশীর্ণায়মান হইয়া ভূতল হইতে আকাশে উঠিয়াছে। কত রাজা ও রাজ্য একে একে মহাকালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বজ্রদেহ পিরামিড্‌শ্রেণী মহাকালের প্রহরীস্বরূপ স্বস্থানে অটল। ইহাদের নির্মাণ-রহস্য আজিও অজ্ঞাত। যুগ যুগ ধরিয়া মরুভূমির মধ্যে উন্নতশীর্ষে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ইহারা মনুষ্যজাতির বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। নয়টি পিরামিড্ দেখিলাম। তিনটি বড়, ছয়টি ছোট। গাইড বলিল, বড়টির উচ্চতা পূর্বে ৫৮১ ফুট ছিল, এখন ৫৫১ ফুট আছে। উপরের ত্রিশ ফুট আলাবাষ্টার নিমিত ছিল। কালক্রমে ভাঙিয়া গিয়াছে। গাইডটির মতে পিরামিড্-গুলি ৩৭৩৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে নির্মিত। বড় পিরামিডের পার্শ্বে রাজা ফারুকের গ্রীষ্মনিবাস। এখন রাজা আলেকজাণ্ড্রিয়ায় আছেন। সান্ত্রী শূন্য প্রাসাদ পাহারা দিতেছে। অদূরে বিরাটকায় স্ফিঙ্ক্‌স্ পূর্বদিকে মুখ করিয়া হাসিতেছে। তখন

দিবালোক প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। সেই আলো-আঁধারের মিলনে স্ফিঙ্ক্‌সের মিষ্টহাসি মিষ্টিক্‌ হইয়া উঠিয়াছে। ইতস্ততঃ অনেকগুলি প্রাচীন মিশরের রাজা-উজিরের সমাধি-মন্দির। মাটি খুঁড়িয়া তাহাদিগকে পৃথিবীর গর্ভ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। মন্দিরমধ্যস্থ পাথরের মূর্তিগুলিতে শিল্পীর নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই। শুক্লা সপ্তমীর চাঁদের আলোকে যথাসম্ভব উহাদিগকে দেখিয়া, আমাদের ভাগ্যগণনা-লিপ্সুদের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ট্যাক্সিতে আসিয়া উঠিলাম। নীলনদের উভয় তীরবর্তী, আলোকাবলী-খচিত শহরের রাত্রি-কালীন দৃশ্য পবম রমণীয় মনে হইল। বাজাব, রাজপ্রাসাদ ও বড় বড় রাস্তাগুলি দেখিয়া হোটেলে ফিবিলাম।

রাত্রি ১টা ২৫ মিনিটে আমরা হোটেল ত্যাগ করিলাম। বিমানঘাটিতে আসিয়া পুলিশ ও শুল্ক-বিভাগের ঘাটিগুলি অতিক্রম করিয়া প্লেনে উঠিলাম। রাত্রি ২টা ২৫ মিনিটে পুনরায় উড়িতে সুরু করিলাম। অন্ধকার ভেদ করিয়া বিমান সগর্জনে চলিয়াছে। যাত্রিগণ স্ব-স্ব আসনের পিঠ যথাসম্ভব নীচে নামাইয়া তন্দ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন। ক্রমশঃ সূর্যোদয় হইল। আমরা আফ্রিকার উত্তর-উপকূল ধরিয়া উড়িতেছি। শুধুই মরুভূমি দেখা যাইতেছে। ক্যাপ্টেন বলিয়া পাঠাইলেন যে, ভূমধ্যসাগরে ঝড় উঠায় তিনি সেদিকে যান নাই।

স্থানীয় সময় আটটায় ত্রিপোলীর ক্যাসেল বেনিটো বিমান-

ঘাটিতে নামিলাম। এই বিমানঘাটিটি যুদ্ধকালে কয়েকবার হস্তান্তরিত হইয়াছে। মেসিন গানের সহস্র ক্ষত এই ঘাটিটিতে বিদ্যমান। ঢেউ-টিনের ঘরগুলি ছিদ্রময়। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে এই ঘাটি। দূরে পর্বতশ্রেণী দেখা যায়। লোকালয় কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে আমাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা হইল।

দেড় ঘণ্টা বিশ্রামের পর স্থানীয় সময় সাড়ে নয়টায় পুনরায় উড়িতে সুরু করিলাম। প্রথমেই ভূমধ্যসাগর পাড়ি সুরু হইল। উপরে দিগন্তপ্রসারী নীলাকাশ, নীচে সুবিস্তীর্ণ নীলাম্বুরাশি। মাঝে মাঝে মেঘগুলি সমুদ্রের উপর ভাসিতেছে। উপর হইতে সূর্য তাহাদের উপর আলোকপাত করিতেছেন। আকাশ, সমুদ্র ও মেঘের খেলা দেখিতে দেখিতে সহসা ফ্রান্সের উপকূল-ভাগ দৃষ্টিগোচর হইল।

উপর হইতে ফরাসী দেশের দৃশ্য পরম রমণীয়। সর্বত্রই শস্যমণ্ডিত ক্ষেত্র। দক্ষিণাংশ পর্বতময়; কিন্তু তথাপি শস্য-শ্যামল। বন্ধুরগাত্র ফরাসীভূমিকে কুটিলগতি স্রোতস্বিনীগণ কোথাও মুক্তাহারের ন্যায়, কোথাও বা রৌপ্য-মেখলার ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। মাঝে মাঝে সুন্দর শহর। বাড়ীগুলির ছাদ প্রায়ই লাল। নগর হইতে নগরান্তর পর্যন্ত রাস্তা বা রেল-লাইন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। নদীর উপর পুলগুলি পর্যন্ত বেশ দেখা যাইতেছে। চলন্ত মোটর গাড়ী বা রেলগাড়ী-গুলিকে উপর হইতে চলনশীল বিন্দু বা রেখার ন্যায় দেখাইতেছে।

একটি সুরম্য উদ্যানের মত সমস্ত ফ্রান্সকে পশ্চাতে ফেলিয়া লা-হাভ্ র্ বন্দরের নিকট দিয়া সমুদ্রে পড়িলাম। বামে আটলান্টিক। দক্ষিণে ইংলিশ চ্যানেল। পিছনে সমুদ্র-বিধৌত গৃহমালা-শোভিত সুশ্যামল ফ্রান্সের উপকূল। সহসা সমুদ্রমধ্য হইতে যেন এক সুন্দর দেশ উত্থিত হইল। ইংলণ্ড দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র যাত্রিমহলে আনন্দের চঞ্চলতা লক্ষিত হইল। ইংলণ্ডের উপকূলে সমুদ্রতীর পর্যন্ত গৃহরাজি পরিশোভিত। ডাইনে দূরে সাদা খড়ির পাহাড়শ্রেণী দেখা যাইতেছে। অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্যের কিরণ তাহার উপর পড়িয়া পরম রমণীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে। দেখিয়া আমার অ-কবি মনেও বোধ হইতেছে এ যেন জার্মানী, তথা ইউরোপ তথা—সমগ্র পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া জয়-দৃপ্ত ইংলণ্ডের পুঞ্জীভূত অট্টহাসি। ঘন-সবুজ বৃক্ষশ্রেণী, সুকর্ষিত ক্ষেত্রমালা এবং ঘন-বিন্যস্ত প্রাসাদাবলী অতিক্রম করিয়া বিমান লণ্ডনের হিথ্ রো বিমানঘাটিতে অবতরণ করিল। তখন স্থানীয় সময় বৈকাল প্রায় চারিটা।

পুলিস, শুল্ক ও স্বাস্থ্য বিভাগের ঘাটি অতিক্রম করিতে প্রায় আধঘণ্টা সময় গেল। কোম্পানী বাসে আমাদিগকে তাহাদের শহরের আপিস পর্যন্ত পৌছাইয়া দিল। আপিসটি বাকিংহাম প্যালেস রোডে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনের কাছে। সেই-খানেই খবর পাইলাম যে কেন্‌সিংটন হাই ষ্ট্রীটের এক হোটেলে আমার জন্য স্থান করা হইয়াছে। ট্যাক্সি-যোগে সেখানে

পৌঁছিলাম। সেদিন মহাষ্টমী। বঙ্গদেশে আমার গৃহে তখন হয়তো দুর্গামাতার সন্ধ্যারতি সমাপনান্তে ভোগের আয়োজন হইতেছে।

এই যাত্রায় ছয় লম্ফে মোট ৬৪০২ মাইল রাস্তা বিমান-যোগে অতিক্রম করিয়াছি। দূরত্বের তালিকা এইরূপ :—

কলিকাতা—দিল্লী	৮২১
দিল্লী—করাচী	৬৭৪
করাচী—বস্‌রা	১২৯৩
বস্‌রা—কায়রো	১০২০
কায়রো—ত্রিপোলী	১০৯৪
ত্রিপোলী—লণ্ডন	১৫০০
	৬৪০২

প্রত্যেক লম্ফের পর ঘড়ির কাঁটা পিছাইয়া দিতে হইয়াছে। এই রাস্তা অতিক্রম করিতে মোট সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাভ হইয়াছে। লণ্ডন কলিকাতার পশ্চিমে। অতএব সূর্য এখানে কলিকাতার সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পরে দেখা যায়। সেইজন্য লণ্ডন সময় কলিকাতা সময়ের (ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পিছনে।

বৈকাল চারিটায় লণ্ডনে পৌঁছিলাম। তখন কলিকাতায় রাত্রি সাড়ে নয়টা। যদি কোন বিমান ঘণ্টায় ৬০০ মাইল বেগে সোজা পশ্চিমে চলে তবে উহা সর্বত্র একই স্থানীয় সময়

পাইবে। যদি কোন প্লেন সূর্যোদয়ে লণ্ডন ত্যাগ করিয়া ঘণ্টায় ৬০০ মাইল বেগে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত যায় তবে ঐ বিমানারোহিগণ সর্বত্রই সূর্যোদয় দেখিতে পাইবেন। এ অবস্থায় যদিও আহারাদির ব্যবস্থা ঘড়ি দেখিয়াই কবিতে হয় তথাপি প্রায়ই সময়-বিভ্রাট ঘটে। করাচী হইতে বস্‌রার পথে খুব দ্রুত দ্রাঘিমা পরিবর্তন হয়। কারণ বস্‌রা সিধা পশ্চিমে। এই লক্ষে আমরা প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাভ করিয়াছিলাম। ফলে যখন ভারতীয় সময় একটায় আমরা বস্‌রায় পৌছাই তথন স্থানীয় সময় দশটা। প্লেনের মধ্যে যখন আমাদিগকে মধ্যাহ্ন-ভোজন দেওয়া হইল তখন স্থানীয় সময় বারটা—ভারতীয় সময় তখন তিনটারও বেশি। অতএব আমাদেব দুই বার আহারের মধ্যবর্তী ব্যবধান অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। এইরূপ অনেক সময় এই ব্যবধান কমিয়া যায়। কখন কখন দিনে দুই বারই বা মধ্যাহ্ন-ভোজন জুটিয়া যায়। ঐদিন আমরা প্রায় ১৮ ঘণ্টা দিবালোক পাইয়াছিলাম।

এই যাত্রায় আমাদের আহারাদি কখনও নীচে কখনও বা প্লেনে হইয়াছিল। প্লেনে খাবার কোন অসুবিধা হয় না।

যে প্লেনে আমরা গিয়াছিলাম, উহা ইয়র্ক-শ্রেণীর প্লেন। চারিটি ইঞ্জিন, খুব দ্রুতগামী—গর্জন একটু বেশি। বারটি আসনে আমরা বার জন যাত্রী ছিলাম; তন্মধ্যে নয় জন শ্বেতাঙ্গ, তিন জন ভারতীয়। বাঙালী আমি একা। দ্বিতীয়—পূর্ণিয়া জেলাবাসী এক জমিদারপুত্র। যুবকটি বিদ্যাশিক্ষার্থ

কেম্‌ব্রিজ যাইতেছেন। খুব অমায়িক এবং সদালাপী। করাচী এবং কায়রোতে নগরদর্শন সময়ে এই যুবকটি আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন। তৃতীয়—এক জন ভারতীয় মিলিটারী অফিসার।

প্লেন-ভ্রমণ খুব আরামদায়ক বলিয়াই মনে হইল। প্লেন খুব স্থিরভাবে চলে। নড়িতেছে এরূপ মনেই হয় না। প্লেনের মধ্যে চলাফেরা করার কোনই অসুবিধা হয় নাই। রেল বা জাহাজে যাহা অসুবিধা হয়, প্লেনে তাহাও নাই। বরং নীচের সতত-পরিবর্তনশীল রমণীয় দৃশ্যাবলী সর্বদাই চিত্তের আনন্দ উৎপাদন করে। আর দ্রুতগামিত্বের তো কথাই নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইংলণ্ডে ছয় সপ্তাহ

যে হোটেলে গিয়া উঠিলাম তাহা কেন্‌সিংটন উদ্যানের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে কেন্‌সিংটন হাই ষ্ট্রীট ও কেন্‌সিংটন কোর্টের সংযোগস্থলে অবস্থিত। আমার গৃহ-সংলগ্ন ঝুল-বারান্দা হইতে উদ্যানটি দেখা যায়।

কেনসিংটন উদ্যানটি হাইড পার্কেরই প্রসারিত অংশ এবং উহার পশ্চিমে অবস্থিত। পার্ক ও উদ্যানে মিলিয়া দৈর্ঘ্যে

দেড় মাইলের উপব। ইহাদের মাঝে মাঝে বনস্পতি-বিরচিত মনোরম কুঞ্জ ও ছোটবড় হ্রদ। হ্রদের মধ্যে রাজহংসশ্রেণী খেলিয়া বেড়াইতেছে। দিন ভাল থাকিলে বৈকালে হ্রদগুলিব পাড়ে যথেষ্ট জনসমাগম হয। বালক-বালিকাগণ ছোটবড নৌকা পালসংযোগে হ্রদেব মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। যখন পাল-সমেত নৌকাগুলি বাযুভরে হ্রদের এক পার হইতে অপর পার পর্যন্ত চলিয়া বেডায় তখন দেখিতে বেশ লাগে। নৌকা-গুলির দৈর্ঘ আধ হাত হইতে দুই হাত আডাই হাত পর্যন্ত হইবে।

যুদ্ধকালীন রেশনপ্রথা তখন পুবাদমে চলিতেছে। বেশন কার্ড ব্যতীত পাঁচ দিন পর্যন্ত হোটেলে থাকা যায। সেজন্য প্রায় হোটেলেই পাঁচ দিনেব বেশি কাহাকেও রাখিতে চাহে না। সপ্তাহান্তে বেশন কার্ড সংগ্রহ করিযা আমি অন্য হোটেলে গিয়াছিলাম। সেটি উদ্যানের উত্তব-পশ্চিম প্রান্তে বেইস-ওযাটার অঞ্চলে অবস্থিত। এই হোটেলেই আমার লণ্ডনবাস সমাপ্ত হইয়াছিল এবং লণ্ডনে অবস্থানকালে এই উদ্যানটিই আমাব ভ্রমণের প্রধান স্থান ছিল।

১৭ই আশ্বিন শুক্রবাব ইণ্ডিযা-হাউসে গিয়া তত্রত্য কর্মচারি-বৃন্দেব সহিত পবিচিত হইলাম। ইহাদের সহাযতায আমার সমস্ত কাজ অনায়াসে সম্পন্ন হইযাছিল।

ইণ্ডিয়া হাউসে আমার মূল কর্মস্থল স্থাপন করিলাম। এখানে বহু ভারতীয়েব সঙ্গে আলাপ হইল। কেহ ইণ্ডিয়া-

হাউসের কর্মচারী, কেহ ছাত্র, কেহ আমারই মত রাজকার্যে আগত, কেহ ব্যবসায়ী এবং কেহ লণ্ডনের স্থায়ী বাসিন্দা। কেহ ছাত্রাবস্থায় এখানে আসিয়া ইংরেজ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া এখানেই রহিয়া গিয়াছেন। এখানে আমার সোদর-প্রতিম শ্রীমান জগদীশচন্দ্র দাসগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। শ্রীমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী-ছাত্র। বর্তমানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঔষধ-প্রস্তুতের কিমিতি বিষয়ে গবেষণায় নিরত আছেন। ইনি লণ্ডনে আমার নিত্য-সহচর ছিলেন।

যুদ্ধের পর লণ্ডনে ভারতীয়-সমাগম প্রচুর। তাহাদের মধ্যে ছাত্রই বেশি। সরকারী বৃত্তিভোগী ছাত্র দলে দলে এ দেশে আসিতেছে। বিলাতের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই কিছু কিছু ভারতীয় ছাত্র আছে। তন্মধ্যে লণ্ডনেই সর্বাপেক্ষা বেশি। কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডেও কম নয়। লণ্ডনের কোন কোন কলেজের গবেষণা-বিভাগে ইংরেজ ছাত্র অপেক্ষা ভারতীয় ছাত্রই নাকি বেশি। ছাত্রদের জন্য কলেজে স্থান সংগ্রহ ও বাসস্থান সংগ্রহের ভার ইণ্ডিয়া-হাউসের উপর। যুদ্ধোত্তর অনটনের দিনে এ কাজ অবশ্যই দুরূহ। ইণ্ডিয়া হাউসের যত্ন সত্ত্বেও এ বিষয়ে কিছু কিছু বিভ্রাট ঘটিয়াছে। সেজন্য ছাত্র-মহলে একটু অসন্তোষ দেখিলাম। শুনিলাম একটি ছাত্র এক বৎসর যাবৎ এখানে আসিয়াছে; এখনও তাহার জন্য কোন কলেজে স্থান পাওয়া যায় নাই। বরাদ্দমত সরকারী বৃত্তি অবশ্য তাহাকে দেওয়া হইতেছে। আমি থাকিতে থাকিতে

এক দল ছাত্র লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের জন্য কোন বাসস্থান সংগ্রহ না হওয়ায় পূর্ব-ক্রয়ডনে এক তাঁবুতে তাহাদিগকে রাখা হইল। শীতের দেশে তাঁবুতে থাকা অবশ্যই সুখদায়ক নহে এবং পায়খানার ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই সন্তোষজনক ছিল না। একটি ছাত্র এদেশে "টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার" জন্য আসিতেছেন খবর পাইয়া তাহার জন্য এক "টেক্‌নিক্যাল কলেজে" স্থান স্থির করা হইয়াছিল। ছেলেটি আসিয়া প্রথম দিন কলেজে যাইয়া দেখে যে সেখানে সেলাই, কাঠের কাজ প্রভৃতি নানাবিধ হাতের কাজ শেখান হয়। ছেলেটি শিবপুর কলেজের বি-ই এবং সেখানকার একজন কৃতী ছাত্র।

১৮ই আশ্বিন শনিবার পূব-ক্রয়ডনে বিজয়া সম্মিলনীতে যোগদান করি। সেদিন বঙ্গদেশে বিজয়া উৎসব। তদুপলক্ষে পূর্ব-ক্রয়ডনে একটি স্কুলঘরে দ্বিশতাধিক ভারতীয় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সকল ধর্মের এবং সকল প্রদেশের লোকই সেখানে দেখিলাম। জনৈক বাঙালী যুবকের সুমধুর সেতার-বাদ্য, ভারতীয় মহিলাদের হিন্দুস্থানী, বাংলা ও নেপালী সঙ্গীত, বেলুচি যুবকের বেলুচি ভাষার গজল ইত্যাদি শ্রবণ করিলাম। সকলকে চা ও কেক্‌ দেওয়া হইল। বহু ইংরেজ নরনারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা সাধারণ গৃহস্থ-শ্রেণীর এবং সানন্দে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সর্বশেষে শিখাধারী, ধুতি পাঞ্জাবী ও আলোয়ান পরিহিত শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহাশয় ইংরাজী ভাষায় সকলকে ধন্যবাদ

জ্ঞাপন করিলেন। শুনিলাম ভট্টাচার্য মহাশয় কাশী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক। শ্রীমদ্ভাগবত গীতা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ মানসে কাশী হইতে এদেশে আসিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছেন। পরে এক ভারতীয় হোটেলে দুই মিনিটের জন্য ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া-ছিল। তখন আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে এদেশে গীতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিখিবার কিছুই নাই। তিনি শুধু ইহাদের গবেষণা-পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহার সহিত দীর্ঘতর আলোচনার সুযোগ পাই নাই।

আমার লণ্ডনে অবস্থানকালে ভারতীয় হাই কমিশনার মহাশয় একদিন* ইণ্ডিয়া হাউসে একটি "ইঙ্গ ভারতীয়" জলসার আয়োজন করেন। জলসাটি নানাভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং করপোরেশনের আর্টিষ্টগণ এই জলসা পরিচালনা করেন। গায়ক ও বাদকগণ স্ব স্ব ব্যবসায়ে খ্যাতিসম্পন্ন ইংরেজ মহিলা ও পুরুষ। তাহাদের নেতা একজন ভারতীয় (মাদ্রাজী) ওস্তাদ। জলসাটি বি বি সি সমস্ত সাম্রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিল। বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহিলা এই জলসাতে নিমন্ত্রিত হইয়া-ছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীত পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালিয়া ইংরেজদের শ্রবণযোগ্য করাই নাকি এই দলের উদ্দেশ্য। ক্লারিওনেট, বেহালা ও হার্পসিকর্ড এই তিন প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। ভারতীয় ওস্তাদটি মাঝে মাঝে তানপুরাও ধরিয়াছিলেন।

* ২রা কার্তিক, ১৯শে অক্টোবর।

কয়েকটি ভারতীয় সুর পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালিয়া বাদিত হইল। সর্বপ্রথম ক্লারিওনেটে রবীন্দ্রনাথের একটি ভাটিয়ালি সুরের গান বাজান হইল। তারপর অন্যান্য গান ও সুব বাজান হইল। আশা করি সকলেই খুব উপভোগ করিয়াছিলেন। আমি সঙ্গীতে বড়ই অরসিক, সর্বপ্রথমেব ভাটিয়ালি গানটি এবং উপসংহারেব নানাবিধ মিষ্টান্নযুক্ত চা-ই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য হইয়াছিল।

১৯শে আশ্বিন ববিবার। প্রাতরাশের পর বাহির হইয়া পড়িলাম। পরিষ্কার আকাশ। সুন্দর বৌদ্র উঠিয়াছে। তাপ ৫০ ডিগ্রির কাছাকাছি। পশ্চিমগামী একটি বাসে উঠিযা বসিলাম। কেন্‌সিংটন হাই ষ্ট্রীট, হ্যামারস্মিথ ও চিস্‌উইক অতিক্রম করিয়া সেতুবদ্ধ টেম্‌স নদী পার হইয়া কিউ উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। এখান হইতে আঁকিয়া বাঁকিয়া নদী দক্ষিণে চলিয়াছে। নদীর পূর্বপাবে কিউ উদ্যান। মানুষেব জানা সর্বপ্রকার তরুলতা নাকি এ বাগানে আছে। উদ্যানটি সত্যই পরম রমণীয়। ছোট বড় গাছ, নানাবিধ লতা। কেহ পুষ্প-স্তবকে মণ্ডিতগাত্র, কেহ শ্যামল পত্রসম্ভারে ভূষিতদেহ ; কোন গাছ বৌদ্ধ প্যাগোডাব মত, আবার কোন গাছ ছত্রাকার। কোন গাছ পথিকগণকে ছায়াদানের জন্য তৈরি, আবার কেহ লতিকা সমাগমের জন্য সমুৎসুক। উদ্যান-মধ্যস্থলে এক বৃহৎ সরোবরে রাজহংসশ্রেণী ক্রীড়ারত। সুসজ্জিত মনোজ্ঞ উদ্যান-মধ্যে বিচরণ করিয়া তরুলতার লীলা ও শোভা দর্শন করিলাম।

টেম্‌স নদীতীরে পদচারণা করিয়া নদীগামী নানাবিধ নৌকা দেখিতে লাগিলাম। নদীতীরবর্তী রাস্তাটি অনেকটা আমাদের গ্রাম্য রাস্তার মত অপ্রশস্ত; ভাল বাঁধানো নয়, মাঝে মাঝে কর্দমযুক্ত, দু'পাশের গাছ হইতে ঝরা-পাতায় সমাকীর্ণ। নদীর ওপারে শূন্য প্রান্তর; মাঝে মাঝে শস্যমণ্ডিত। নিকটবর্তী একটি হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া দক্ষিণে রিচ্‌মণ্ডের দিকে চলিলাম। এ অঞ্চলে বড়লোকের বাস। প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাজপথ। সুগঠিত, সুসজ্জিত সৌধশ্রেণী। রাস্তায় লোকের ভিড় নাই। রিচমণ্ড পার্ক ও উইম্‌বেলডন্‌ প্রান্তর দেখিয়া সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরিলাম। বোমার ক্ষতি কোথাও দেখিলাম না।

কিউ উদ্যানে বটগাছ বা বটগাছের মত বড় গাছ দেখি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দেশের জমিদার পরিবারকে বটবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বটবৃক্ষ যেমন সর্বদা নানা পক্ষীর আশ্রয়স্থল ও তাহাদের কোলাহল-মুখরিত, জমিদার বাটীও সেইরূপ আত্মীয় অনাত্মীয় বহু পরিবারের আশ্রয়স্থল এবং তাহাদের কোলাহলে সতত মুখরিত। ইংলণ্ডে বটবৃক্ষও নাই, জমিদার বাড়ীও নাই। পিতা-পুত্রও এখানে বেশী দিন একত্র বাস করে না। বর্তমান গৃহ-স্বল্পতার দিনে পিতা ও পুত্রকে অনেক সময় বাধ্য হইয়া এক বাড়ীতে থাকিতে হইতেছে। কাগজে দেখিলাম তাহাতে শাশুড়ী ও বৌ-এর মধ্যে নাকি বড়ই সঙ্ঘর্ষ বাধিতেছে। সঙ্ঘর্ষের প্রধান কারণ রান্নাঘর। সাধারণতঃ

ইঁহারা হোটেলেই খান। কারণ মেয়েরাও বাইরে কাজ করেন। কেবল রবিবারে নিজ বাড়ীতে রান্না করেন। রবিবারে যখন শাশুড়ী ও বৌ একই রান্নাঘরে স্ব স্ব পৃথক রান্নার উদ্যোগ করেন তখন খটাখটি বাধিতেছে। কাগজে দেখিলাম একজন পাদ্রী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যতদিন এই গৃহ-স্বল্পতা থাকে ততদিন শ্বাশুড়ীদের শিক্ষার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

এর পরই রেশন কার্ড সংগ্রহে মনোযোগ দিতে হইল। খাদ্য রেশন কার্ডের জন্য কেন্‌সিংটন এলাকার অফিসে গেলাম। পনর কুড়ি জন লোক কাজ করিতেছে। অধিকাংশই স্ত্রীলোক। রেশন কার্ড প্রার্থীদের ভিড মন্দ নয়। কেহ আমার মত বিদেশী, কেহ নবাগত ইংরেজ। কেহ শিশু বা অসুস্থের জন্য দুগ্ধ রেশন প্রার্থী। কেহ ঠিকানা বদলাইতে আসিয়াছেন। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য আলাদা কাউণ্টার আছে। প্রবেশমাত্র এক ব্যক্তি আমার আগমনের উদ্দেশ্য শুনিয়া আমাকে উপযুক্ত কাউণ্টারে লইয়া গেল। তত্রত্য কর্মচারিণী আমাকে প্রশ্ন করিয়া একটি ফরম নিজেই লিখিয়া আমাকে সই করিতে বলিলেন। সই করিবার পর আমাকে মিনিট পনের অপেক্ষ-মাণ প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া থাকিতে হইল। তারপর অন্য এক কর্মচারিণী আমাকে ডাকিয়া আমার কার্ড আমাকে প্রদান করিলেন। কার্ড দিবার সময় অতি ভদ্রভাবে কার্ডের ব্যবহার-বিধি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। বঙ্গদেশীয়

রেশন অফিসের অভিজ্ঞতা-পুষ্ট আমার মন ইহাদের ক্ষিপ্রতা, পটুতা এবং ভদ্রতায় বিস্মিত হইয়াছিল।

ইহার পর বস্ত্র-কুপনের জন্য বোর্ড-অব-ট্রেডে যাই। প্রবেশমাত্র এক ব্যক্তি আমার প্রয়োজন জানিয়া লইয়া আমাকে উপযুক্ত কক্ষে প্রেরণ করিল। সেখানে গিয়া একটা ফরমে কি কি বস্ত্র দরকার তাহা লিখিতে হইল। আমি শুনিয়াছিলাম যে এদেশে বস্ত্রের বিশেষ অভাব এবং কুপন প্রদান বিষয়ে ইহাদের বিশেষ কড়াকড়ি। কাজেই আমি খুব সংক্ষেপেই আমার প্রয়োজন লিখিলাম। তত্রত্য কর্মচারিণী আমার লিখিত ফর্দ দেখিয়া বলিলেন যে আপনি এদেশে নবাগত, কাজেই এদেশের শীতের তীব্রতা জানেন না। আপনার নিশ্চয়ই এটা দরকার, ওটা দরকার ইত্যাদি। তিনি আরও তিন চার প্রকারের বস্ত্র ফরমে নিজেই লিখিয়া আমাকে সবগুলি কিনিবার মত কুপন দিয়া দিলেন।

টেমস্ নদী লণ্ডনের মধ্যস্থল দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত। নদীর উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই শহর বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। নদী পশ্চিম হইতে পূর্বমুখে চলিয়াছে। চলিতে চলিতে কোথাও বাঁকিয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়াছে। এইরূপ একটি উত্তর-দক্ষিণ বাঁকের পশ্চিম তীরে পার্লামেণ্ট ভবন অবস্থিত। পার্লামেণ্ট ভবনের পাশে ওয়েষ্টমিনিষ্টার সেতু। এরূপ শহরের মধ্যে টেম্স নদীর উপর বহু সেতু বিদ্যমান। টেম্স নদী বেশী প্রশস্ত নয়। ওয়েষ্টমিনিষ্টার সেতুর নিকট

কলিকাতার গঙ্গার অর্দ্ধেক হইবে। প্রশস্ততা পশ্চিম দিকে ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে। পূর্বদিকে বাড়িয়াছে।

পশ্চিমে পার্লামেণ্ট ভবন হইতে পূর্বে টাওয়ার অব লণ্ডন পর্যন্ত টেম্‌স নদীর উভয় তীরে, বিশেষতঃ উত্তর পাড়ে, লণ্ডনের বাণিজ্যবহুল অংশ। পার্লামেণ্ট ভবন ও টাওয়ার অব লণ্ডন উভয়ই নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। দুই শিলিং দিলে টেম্‌স নদীতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার সেতু হইতে টাওয়ার অব লণ্ডন পর্যন্ত মোটরবোটে ঘুরিয়া আসা যায়। যাতায়াতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগে।

পার্লামেণ্ট ভবন হইতে উত্তরমুখে গিয়াছে হোয়াইট হল ষ্ট্রীট এবং পশ্চিম-দক্ষিণে গিয়াছে ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট। এই উভয় রাস্তায়, বিশেষতঃ হোয়াইট হল ষ্ট্রীটে, বহু সরকারী আপিস। এই উভয় রাস্তার সংযোগস্থলের নিকটবর্তী গ্রেটজর্জ ষ্ট্রীট। এই রাস্তায় ট্রেজারী। তাহারই অনতিদূরে ইণ্ডিয়া অফিস। হোয়াইট হল ষ্ট্রীটের গোড়া হইতে বাহির হইয়া গ্রেটজর্জ ষ্ট্রীট। সিধা পশ্চিমে সেণ্টজেমস্‌ পার্ক পর্যন্ত গিয়াছে। রাস্তাটির দৈর্ঘ খুব কম। পার্কের পরেই রাজপ্রাসাদ এবং রাজপ্রাসাদের অপর পারে গ্রীণ পার্ক। গ্রীণ পার্কের পরেই পিকাডেলী—লণ্ডনের অভিজাত ভূয়িষ্ঠ অঞ্চল। ঐ স্থানে হাইড্‌ পার্কের পূর্ব-দক্ষিণ কোণ। পিকাডেলী ষ্ট্রীট হাইড পার্কের দক্ষিণ দিয়া পশ্চিমাভিমুখে গিয়া কেন্‌সিংটন রোডে মিলিত হইয়াছে। কেন্‌সিংটন রোডও প্রথমে হাইড পার্ক এবং পরে কেন্‌সিংটন

গার্ডেনের দক্ষিণ দিক দিয়া গিয়া কেন্‌সিংটন হাই ষ্ট্রীটে মিলিয়াছে।

হোয়াইট হল ষ্ট্রীট পার্লামেণ্ট ভবন হইতে নদীর বাঁক ধরিয়া উত্তর মুখে আসিয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বহু সরকারী আপিস। ডাউনিং ষ্ট্রীট হোয়াইট হল ষ্ট্রীট হইতে বাহির-হওয়া একটি ছোট রাস্তা। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর সরকারী আবাসস্থল ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে। হোয়াইট হল ষ্ট্রীট আসিয়া চেয়ারিং ক্রশ রেল ও টিউব ষ্টেশনে পড়িয়াছে। নদী এখানে পূর্ববাহিনী হইয়াছে।

চেয়ারিং ক্রশ লণ্ডনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। শহর চেয়ারিং ক্রশ হইতে প্রত্যেক দিকেই সাত-আট মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। এখান হইতে পশ্চিম দিকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত যে বড় রাস্তা গিয়াছে তাহার নাম মল। কোনও বিশেষ উপলক্ষে রাজারাণী যখন শোভাযাত্রা করিয়া পার্লামেণ্ট ভবনে আসেন, তখন মল ও হোয়াইট হল ষ্ট্রীট দিয়াই আসেন।

চেয়ারিং ক্রশ হইতে নদীর উত্তর পাড় ধরিয়া ষ্ট্র্যাণ্ড রোড পূর্বাভিমুখে গিয়াছে। অল্ডউইচ রাস্তাটি একটি ছোট বৃত্ত-চাপের মত; ষ্ট্র্যাণ্ড হইতে বাহির হইয়া ষ্ট্র্যাণ্ডেই পুনর্মিলিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়া হাউস অল্ডউইচের উপর অবস্থিত। অল্ডউইচ হইতে কিংস্‌ওয়ে নামক একটি রাস্তা উত্তরে অনতি-দূরে হাই হবর্ণ পর্যন্ত গিয়াছে। কেন্‌সিংটন উদ্যান ও হাইড পার্কের উত্তর দিয়া বেইস্‌ওয়াটার রোড নামক যে রাস্তা

পূর্বাভিমুখে আসিয়াছে তাহারই পার্কের পরবর্তী অংশের নাম অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট এবং তৎপরবর্ত্তী অংশের নাম হাই হবর্ণ। এই অঞ্চলে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিকস্ অবস্থিত। হাইকোর্ট এবং ব্যারিষ্টারগণের আড্ডাও অল্ডউইচের নিকটে।

ষ্ট্র্যাণ্ড পূর্বদিকে গিয়া ফ্লীট ষ্ট্রীট নাম ধারণ করিয়াছে। এখানে খবরের কাগজওয়ালাদের আড্ডা। এই পূর্বাভিমুখী রাস্তার পরবর্তী অংশের নাম ক্যানন ষ্ট্রীট। ইহারই উত্তরে লিভারপুল ষ্ট্রীট। তাহারই দক্ষিণে থ্রেডনিডল্ ষ্ট্রীটে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড ও ষ্টক এক্সচেঞ্জ। অদূরে সেণ্টপল গির্জা। ইহারই কিছু পূর্বে টাওয়ার অব লণ্ডন। তাহার পূর্বদিকে লণ্ডনের ডক এলাকা।

পূর্বেই বলা হইয়াছে চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশন নদীর উত্তর পাড়ে। নদীর দক্ষিণ পাড়ে ওয়াটারলু ষ্টেশন; চেয়ারিং ক্রশ হইতে ওয়াটারলু পর্য্যন্ত রেল লাইন নদীর উপরিস্থ সেতু দিয়া গিয়াছে আর টিউব লাইন নদীর নীচের সুড়ঙ্গ দিয়া গিয়াছে।

চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনের পাশেই ট্রাফালগার স্কোয়ার। এখানে নেলসনের খুব বড় মূর্তি আছে। পাশে খোদাই করা আছে—"ইংলণ্ড আশা করেন তাঁহার প্রত্যেক সন্তান স্বীয় কর্তব্য পালন করিবে।" কাছে ভারতবিদ্রোহ দমনকারী সেনানী হ্যাভেলকের একটি মূর্তি আছে। অনতিদূরে এক আকাশচুম্বী চূড়ার উপর দণ্ডায়মান নেলসন। ট্রাফালগার

স্কোয়ারে বহু পারাবত আসিয়া বসে এবং জনতার হাত হইতে খাদ্য ঠোকরাইয়া খায়। ইহারই পাশে জাতীয় আর্ট গ্যালারী। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণের প্রতিভায় সর্বদা ভাস্বর, সজীব ও আনন্দময়।

লণ্ডন পৃথিবীর বৃহত্তম শহর। সত্তর-আশী লক্ষ লোকের বাস। লোকের যাতায়াতের প্রধান উপায় টিউব বা সুড়ঙ্গপথ এবং মোটর বাস। শহরের মধ্যে অনেক রেল ষ্টেশনও আছে। শহর হইতে শহরতলীতে যাইতে হইলে অনেকস্থলে রেলপথই প্রশস্ত। মাটির নীচ দিয়া সুড়ঙ্গ-পথ লণ্ডনের সর্বত্র গিয়াছে। সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন্‌ সর্বদা যাতায়াত করিতেছে। মাটির নীচে এক একটি ষ্টেশন খুব বড় এবং সুসজ্জিত। কোন কোন লাইন মাটির খুব নীচে দিয়া গিয়াছে। বেশী নীচের ছোট ষ্টেশনে লিফ্‌ট এবং বড় ষ্টেশনে চলনশীল সিঁড়ি আছে। ষ্টেশনে এবং গাড়ীর মধ্যে সুন্দর পথপ্রদর্শক ইঙ্গিত এবং ম্যাপ আছে। নবাগতের পক্ষে এ সব দেখিয়া যাতায়াতের কোন অসুবিধা হয় না। সকাল ৮টার পর হইতেই মধ্য-লণ্ডনের সুড়ঙ্গগুলি অনবরত জনস্রোত উদ্গীরণ করিতে থাকে।

টাওয়ার অব্‌ লণ্ডন বিজয়ী উইলিয়ম রাজপ্রাসাদরূপে নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পরবর্তী নৃপতিগণ ইহাকে বাড়াইয়াছেন। ইহা কখনও রাজপ্রাসাদ, কখনও দুর্গ এবং কখনও বা কারাগার রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্তমানে ইহাকে একটি মিউজিয়ামরূপে রক্ষা করা হইতেছে। ইংলণ্ডের

ইতিহাস এই বাড়ীটির সঙ্গে বিশেষরূপে জড়িত। রাজা প্রথম জেম্‌স পর্যন্ত এই বাড়ীতে বাস করিয়াছেন।

বড় বাড়ীটির মধ্যে অনেকগুলি প্রাসাদ আছে। প্রত্যেক-টিকে এক একটি টাওয়ার বলা হয়। রাজদরবারের কত ষড়যন্ত্র, কত নিষ্ঠুরতা এক সময়ে এই প্রাসাদগুলিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রাসাদে ঢুকিয়াই টাওয়ার হিল। এখানে স্যার সাইমন বার্লির ফাঁসী হইয়াছে। সপ্তম হেন্‌রীর মন্ত্রী ডাড্‌লি এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের শিরশ্ছেদ হইয়াছে। বেল টাওয়ারে রষ্টারের বিশপ ফিসার, রাজকুমারী এলিজাবেথ, মন্‌মাউথের ডিউক জেম্‌স প্রভৃতি বহু ব্যক্তি কারাবাস করিয়াছেন। হোয়াইট টাওয়ারে দ্বিতীয় রিচার্ড সিংহাসন ত্যাগ-পত্র স্বাক্ষর করেন। পঞ্চম হেন্‌রী এজিনকোর্টের যুদ্ধবন্দী অলিন্সের ডিউককে এখানেই কারাগারে নিক্ষেপ করেন। টাওয়ার গ্রীনে যে সমস্ত ব্যক্তির ফাঁসী হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অষ্টম হেন্‌রীর দ্বিতীয় রাণী এনিবোলিন এবং পঞ্চম রাণী ক্যাথারিন হাওয়ার্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্লাডি টাওয়ারে পঞ্চম এডোয়ার্ড ও তাহার ভ্রাতা ইয়র্কের ডিউকের হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়। স্যার ওয়াল্‌টার র‍্যালের দীর্ঘ কারাবাসের কতক সময় এখানে যাপিত হয়।

এই টাওয়ারের মধ্যে একটি বর্ম ও প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রের প্রদর্শনী আছে। অষ্টম হেন্‌রী এই সংগ্রহের কাজ সুরু

করেন। বিজয়ী উইলিয়ম্ হেষ্টিংসে এবং প্রথম রিচার্ড প্যালেষ্টাইনে যে বর্ম ও অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা এখানে আছে। অষ্টম হেনরীর চারিটি বর্ম আছে। তন্মধ্যে একটি সম্রাট্ ম্যাক্সিমিলিয়ানের উপহার। প্রথম চার্লস, দ্বিতীয় জেম্‌স্ প্রভৃতি অনেক রাজার বর্ম এখানে আছে। বর্ম এবং অস্ত্রের বহু শতাব্দীর ইতিহাস এই প্রদর্শনীতে একত্র প্রত্যক্ষ করা যায়।

সেদিন শনিবার। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ওয়েষ্টমিনিষ্টার সেতুর দিকে চলিয়াছি। রাস্তায় দ্রুতগামী জনস্রোত। চেয়ারিং ক্রশের নিকট একটি ইংরেজ যুবকের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া গেল। আমরা উভয়েই বলিয়া উঠিলাম, "দুঃখিত"। ইংরেজ যুবকটি আমার দিকে তাকাইয়া বলিল, "আপনি কি ভারতবাসী ?" আমি বলিলাম, "হাঁ"। যুবকটি—"আপনি কি কলিকাতায় থাকেন ?" আমি "হাঁ।" যুবকটি বলিল, "আপনার কি বিশেষ কোনও কাজ আছে ? আপনি কোন দিকে যাইবেন ?" আমি—"আমি ওয়েষ্টমিনিষ্টার সেতুর দিকে যাচ্ছি।"

যুবকটি—"চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাই।"

যাইতে যাইতে যুবকটি বলিল, "আমি মিস্ত্রী। (মিস্ত্রী কথাটি বাংলা ভাষায়ই উচ্চারণ করিল) আমার বাড়ী স্কটলণ্ড। যুদ্ধোপলক্ষ্যে আমি প্রায় এক বৎসর কলিকাতায় ছিলাম। হ্যারিংটন ষ্ট্রীটে থাকিতাম। অমুক দোকানে আমি প্রায়ই

যাইতাম। তাহাদের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। কলিকাতা শহর একটু গরম; কিন্তু আমার খুব ভাল লাগিত। সুবিধা হইলে আমি আবার কলিকাতা যাইব।"

আমার প্রশ্নের উত্তরে যুবকটি বলিল, "আমি আমার ব্যবসায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য লণ্ডনে আসিয়াছি। এখনও কিছু ঠিক করিতে পারি নাই।"

কলিকাতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যুবকটির খুব আগ্রহ দেখিতে পাইলাম। এর মধ্যে ওয়েষ্টমিনিষ্টার সেতু আসিয়া গেল। আমি মোটরবোটে ভ্রমণার্থ চলিয়া গেলাম। যুবকটি আমাকে সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানাইয়া আমার দিকে অনেকদূর পর্যন্ত তাকাইতে তাকাইতে সেতু পার হইয়া চলিয়া গেল।

৭ই কার্তিক, ২৪শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার হাউস অব্ কমন্স সভার বিতর্ক দেখিতে গেলাম। সদর দরজা পার হইয়া একটি দরদালান দিয়া কেন্দ্রস্থলে বড় ঘরে অপেক্ষা করিতে হইল। দরদালানে এবং কেন্দ্রস্থ ঘরের দেওয়ালে বড় বড ছবি টাঙানো আছে। ইংলণ্ড ও পার্লামেন্টের ইতিহাসের বিশিষ্ট ঘটনা লইয়া এই ছবিগুলি অঙ্কিত। একটা ছবিতে ভারতবর্ষের উল্লেখ দেখিলাম। ছবিটি হইতেছে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের দরবারে স্যার টমাস রো। অনেক ইতিহাসের বইয়ের পৃষ্ঠায় এই ছবিটি দেখা যায়। ছবিটির নীচে এইরূপ লিখিত আছে—"স্যার টমাস রো আজমীর দরবারে ভদ্রতা ও দৃঢ়তা দ্বারা

ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রভাবের ভিত্তি পত্তন করিতেছেন।” দৃঢ়তা কথাটা কানে বাজিল।

যথাসময়ে গদা, পার্শ্বচর ও অনুচরবৃন্দ পরিবৃত হইয়া স্পীকার আমাদের সামনে দিয়া বিতর্ক-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে আমরা ঢুকিলাম। হাউস অব কমন্সের কক্ষটি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখ রাত্রে জার্মান বোমাবর্ষণে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। কক্ষটিকে নূতন করিয়া নির্মাণ করা হইতেছে। এক্ষণে কমন্সের সভ্যগণ হাউস অব লর্ডসে বসিতেছেন। কক্ষটি ছয় শতাধিক সভ্যের বসিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত নয়। কক্ষের চারিদিকে গ্যালারী। একপ্রান্তে স্পীকারের আসন। তাহার দক্ষিণে সরকারী দল, বামে সরকার বিরোধী দল। মধ্যস্থলে অনেকটা ফাঁকা জায়গা কার্পেটে ঢাকা। গ্যালারী ও কার্পেটের মধ্যে খানিকটা খোলা মেঝে আছে। সভ্যগণ বক্তৃতা করিবার সময় কার্পেট স্পর্শ করিতে পারেন না—ঐ খালি জায়গায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদের বক্তৃতা করিতে হয়। পূর্বে সভ্যগণ নাকি বক্তৃতা করিতে করিতে সহসা উত্তেজনাবশে অসি নিষ্কোষিত করিয়া অপর পক্ষকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতেন। সেইজন্য নিয়ম করা হয় যে, কোন সভ্য কার্পেটের উপর উঠিতে পারিবেন না এবং কার্পেটের মাপও এমনি ভাবে ঠিক করা হইত যে দুইদিক হইতে দুইজনে তরবারী বাড়াইয়া দিলে যেন কেহ কাহাকেও আঘাত করিতে না পারেন। আত্মরক্ষার্থ স্পীকার গদা ব্যবহার

করিতেন। বর্তমানে উহা সুবর্ণমণ্ডিত রূপার গদায় পরিণত হইয়া স্পীকারের মর্যাদার প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দর্শকগণের আসন উচ্চে, চারিদিকে ঘোরানো মঞ্চের উপরে। আমার আসন ছিল স্পীকারের মাথার উপর। ঠিক বিপরীত দিকে রাজপরিবারের জন্য নির্দিষ্ট আসন। স্পীকারের দক্ষিণে উপবিষ্ট মন্ত্রিগণ। বামে চার্চিল প্রমুখ বিরোধী দলের নেতাগণ। প্রধান মন্ত্রী এট্‌লি ঐ দিন অনুপস্থিত ছিলেন। প্রথমে প্রশ্নোত্তর চলিল। পরে যুদ্ধমন্ত্রী পদাতিক বাহিনীর পুনর্গঠন সম্বন্ধে এবং কৃষি-মন্ত্রী ফল আমদানী এবং বন-নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার মধ্যে এবং পবে সভ্যগণ মন্ত্রীদিগকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ কবিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দিলেন। অনেক সময় মনে হইতেছিল যেন বক্তাব জেরা চলিতেছে। প্রশ্নোত্তর কালে এবং পদাতিক বাহিনীর পুনর্গঠন সম্বন্ধে চার্চিল ঘনঘন প্রশ্ন করিতে-ছিলেন। প্রশ্নোত্তব ছলে পরস্পরকে আঘাত করায় চার্চিলেব বিশেষ নিপুণতা লক্ষ্য করিলাম। বিদেশ হইতে বেশী ফল আমদানী সম্ভব কিনা এ বিষয়েও সভ্যগণের বেশ আগ্রহ লক্ষিত হইল। বন-নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ হইতেই কক্ষ খালি হইতে লাগিল। প্রথমে তিন শতাধিক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। ক্রমশঃ কমিয়া ১৫।২০ জনে পরিণত হইল ; পরে দেখিলাম ইহাদের প্রত্যেকেরই বক্তৃতা করিবার বাসনা রহিয়াছে। আমি উঠিয়া চলিয়া আসিলাম।

কার্যোপলক্ষে আমাকে ইণ্ডিয়া আপিসে যাইতে হইত। ইণ্ডিয়া আপিসে কতকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। ভারতীয় রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তনকাল সমুপস্থিত। তথাপি এখানে কোনও কর্মব্যস্ততা নাই। জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমাকে বলিলেন, "এবার তো সমস্ত সিদ্ধান্তই ভারতবর্ষে গৃহীত হইবে, আমরা সই করিব মাত্র।" ইহার কিছুদিন পরেই* ইংরেজ সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহারা ভারত ত্যাগ করিবেন।

স্যার থিওডোর গ্রেগরি তখন সবেমাত্র ভারত-সরকারের অর্থ নৈতিক উপদেষ্টার পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্‌সে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি তিনটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তাঁহার শেষটি শুনিতে গিয়াছিলাম† যথেষ্ট ইংরেজ শ্রোতা। ভারতীয় শ্রোতাও মন্দ নয়। জনৈক সিংহল দেশীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে এখানে আমার আলাপ হইয়াছিল। গ্রেগরী মহাশয় বলিলেন যে, ভারতবর্ষ গণ-তন্ত্রের পথে চলিবে, না টোটেলিটেরিয়ানিজমের পথে চলিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কারণ রাজতন্ত্র ভারতবাসীর ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশেষ রূপে জড়িত এবং বর্তমান ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়—এমন কি সুভাষ বোস পর্যন্ত—দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য একনায়কত্বমূলক রাজশক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার

* ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী।
† ৫ই কার্তিক বা ২২শে অক্টোবর।

করেন। রাশিয়ার কম্যুনিজম এবং জার্মানীর ফ্যাসিজম উভয়ই যে একনায়কত্বমূলক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা ভারতীয়গণ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার জন্য গ্রেগরী মহাশয় ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মতে সমস্ত জমিতে সরকারী মালিকানা স্থাপন করিলে কোন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইবে না; কারণ কেবলমাত্র মালিক পরিবর্তনে জমির উৎপাদন-শক্তি বাড়িবে না। কৃষি, শিল্প এবং সামাজিক কল্যাণমূলক বিভাগগুলির সুসমঞ্জস উন্নতি দ্বারাই ভারতের দুঃখ দূর হইতে পারে। কোনটিকে অবহেলা করিলে চলিবে না। এই সম্পর্কে তিনি লবণকর, মদ-গাঁজা-আফিমের উপর আবগারী কর এবং মৃত্যু-করের প্রশংসা করিলেন।

২৬শে কার্তিক* রাত্রে লণ্ডনের ছাত্র-মজলিসের উদ্যোগে প্রফেসর লেভি একটি উপাদেয় বক্তৃতা দান করেন। তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতার কয়েকটি কথা আমার বেশ মনে পড়ে। তিনি বলিলেন যে ভারতীয় ছাত্রগণ পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করে, কোন্ বিষয়টি দেশের উন্নতির সহায়ক হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া। ইংরেজ ছাত্রগণ পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করে কোন্ বিষয়টি তাহার নিজের জীবিকার্জনের সহায়ক হইবে ইহা চিন্তা করিয়া। বহু ভারতীয় ছাত্র যখন তাঁহাকে বলিয়াছেন যে তিনি এ বিষয়টি পড়িতে চাহেন না, কারণ ইহা তাঁহার

---

* ১২ই নবেম্বর।

দেশের বিশেষ কাজে লাগিবে না, তখন তিনি আনন্দিত হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁহার একজন কৃতী ভারতীয় ছাত্র কৃষি বিষয়ে গবেষণা করিতেছিলেন। এক দিন তাঁহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার ভাবার্থ এইরূপ ঃ

প্রফেসর—তুমি দেশে গিয়া কি করিবে ?

ছাত্র—হয়তো কোন কৃষি-কলেজে শিক্ষকতা করিব।

প্রঃ—তাহা হইলে খুবই ভাল হইবে। তোমার গবেষণা-লব্ধ নূতন পদ্ধতি দ্বারা ভারতীয় কৃষির প্রভূত উন্নতি করিতে পারিবে।

ছাত্র—আপনি বোধ হয় জানেন না যে, ভারতীয় কৃষি-কলেজগুলি কৃষির উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

প্রঃ—(বিস্মিত ভাবে)—তবে ?

ছাত্র—আমাদের মত দু-চার জন শিক্ষিত ও চক্ষুষ্মান লোককে চাকরি দিয়া সন্তুষ্ট রাখাই ঐ কলেজগুলির উদ্দেশ্য।

ধমহিসাবে সরকারী চাকরি বণ্টন সম্বন্ধে প্রফেসর লেভি বলিলেন—এই প্রথা দেশের দারিদ্র্য-প্রসূত। ইংলণ্ডে বেকার সমস্যা নাই। কাজেই এখানে চাকরি লইয়া কাড়াকাড়ি নাই। আয়ার্লণ্ডে বেকার-সমস্যা সঙ্গীন। কাজেই কোন্ ধর্মসম্প্রদায় কত চাকরি পাইল ইহা লইয়া কামড়াকামড়ি লাগিয়াই আছে।

সেদিন ভারতপ্রবাসী জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর পত্নী পিকাডেলি সার্কাসে এক হোটেলে আমাকে মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়িত করেন। ভারতবর্ষের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে কিছু আলোচনা হইল। ইংরেজ রাজত্বা-বসানে ভারতবর্ষে কিরূপ শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক রূপই বা কিরূপ হইবে ইহা বর্তমানে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে অনেকেরই চিন্তার বিষয়। কলিকাতার হত্যাকাণ্ড এবং তৎপরবর্তী নোয়াখালী এবং বিহারের ঘটনাবলীর কথা উঠিলে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা অবশ্যই ধর্মগত সমস্যা নয়; ইহা মূলতঃ রাজনৈতিক সমস্যা। আমাদের নিজেদেরই এ সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এবং এ সমস্যার সমাধান একদিন হইবেই। যখন সমস্যার সমাধান হইবে, তখন দুই সম্প্রদায় আবার শান্তিতে এবং সপ্রেমে পাশাপাশি বাস করিবে। তবে কোন্ পথে সমস্যা মিটিবে—হিংসার পথে না প্রেমের পথে—ইহাই ভাবনার কথা। হিন্দু-মুসলমান বহুকাল ধরিয়া পাশা-পাশি বাস করিয়াছে। ধর্মোপাসনা ব্যতীত সমস্ত কার্যই তাহারা একযোগে করিয়া আসিয়াছে। মাঝে মাঝে মারা-মারিও করিয়াছে। উত্তেজনা কমিয়া গেলে আবার মিলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এবারের গোল কি সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত না রাজনৈতিক অভিসন্ধি প্রণোদিত? ধর্মগত পার্থক্যকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়রূপে অবশ্য পূর্বেও ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্বে গোলযোগ কখনও এত ব্যাপক ও স্থায়ী হয় নাই।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর গৃহকর্ত্রী আমাকে ওয়েষ্টমিনিষ্টার

এবিতে লইয়া গেলেন। পার্লামেণ্ট ভবনের পাশেই ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবি। প্রকাণ্ড গীর্জা। গথিক স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। বড় বড় স্তম্ভের উপর সু-উচ্চ খিলানগুলি তালপত্রের মত চারিদিকে প্রসারিত। মধ্যবর্তী লম্বা হলের উভয় পার্শ্বে বারান্দা—স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। হলের শেষে উপাসনা-মঞ্চ। মৃত ইংলণ্ডাধিপতিগণকে এই ঘরে সমাহিত করা হয়। দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণকেও মৃত্যুর পর এই এবিতে সমাহিত করিয়া সম্মানিত করা হয়। তাঁহাদের স্মৃতি-স্তম্ভ ও শিলামূর্তিতে এবি ভর্তি। গ্লাডষ্টোন, ডিজরেলি, পিট প্রভৃতি রাজনৈতিক এবং নিউটন, ডারউইন, হার্শেল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক-গণের মূর্তি এই বাড়ীতে আছে। ১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধে যে সমস্ত মৃত সৈনিকের খোঁজ পাওয়া যায় নাই বা যাহাদের মৃতদেহ সনাক্ত হয় নাই, তাহাদের স্মরণার্থ একটি "অজানা সৈনিকের সমাধি" এই গীর্জার মধ্যস্থলে আছে। দুইটি প্রস্তরফলক ভারতবর্ষের সঙ্গে জড়িত। একটি মেজর লরেন্সের এবং অপরটি সেনানী কূটের স্মরণার্থ। দ্বিতীয় ফলকটিতে লিখিত আছে যে ইনি ভারতবর্ষে ফরাসীগণকে এবং হায়দর আলিকে পরাজিত করেন।

উপাসনা-মঞ্চের উপরে পিছনের দিকে একটি প্রস্তর-নির্মিত পর্দা আছে। পর্দাটীর উপরে অনেক কারুকার্য আছে। ইহার অনেকটাই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কারুকার্য খুব উচ্চাঙ্গের মনে হইল না। ইংলণ্ডে পাথর-খোদাই কাজের আর কোনও নমুনা

আমি দেখি নাই। যে সিংহাসনে বসিয়া ইংলণ্ডের রাজাদের রাজ্যাভিষেক হয় তাহা এই পাথরের পর্দ্দার পিছনে রক্ষিত আছে। খুব সাধারণ চেয়ার। পায়ার নীচে চারিটি ছোট ছোট সিংহ এবং মধ্যস্থলে একখণ্ড পাথর আছে। এই পাথরটিকে স্কোনের পাথর বলে। প্রথম এডওয়ার্ড পাথরটি স্কটল্যাণ্ড হইতে আনিয়া এই সিংহাসন তৈরি করেন। তদবধি এই সিংহাসনেই সমস্ত রাজার রাজ্যাভিষেক হইয়াছে।

সমগ্র গীর্জাটিতে একটি রহস্যময় নীরবতা বিরাজ করিতেছে। প্রবেশ করিলেই অন্তর সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া যায়।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম দেখিয়া আমি হতাশ বোধ করিয়াছিলাম। কলিকাতার মিউজিয়মের তুলনায় ছোট। ইংলণ্ড ছোট দেশ এবং প্রাচীন দেশও নয়। পাথরের কাজ এদেশে প্রচলিত ছিল না। কাজেই এদেশের পুরাকীর্তি ভারতবর্ষের তুলনায় নগণ্য। কিছুদিন পূর্বে মিণ্ডেল হল নামক স্থানে একজন কৃষক জমি চাষ করিবার সময় কয়েকটি রৌপ্য-পাত্র প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিতগণ সেগুলিকে রোমান আমলের বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই রৌপ্য-পাত্রগুলি 'মিণ্ডেল হল ট্রেজার' নামে পরিচিত হইয়া বর্তমানে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মিউজিয়মের মধ্যে চীন, ভারতবর্ষ, জাভা এবং আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের এক একটি বিভাগ আছে। সেগুলি ছোট, কিন্তু দেখিতে ভাল। ভারতীয় বিভাগে কয়েকটি সুন্দর বুদ্ধমূর্তি আছে।

লণ্ডনে প্রাচীন কীর্তি প্রধানতঃ তিনটি—লণ্ডন টাওয়ার, পার্লামেণ্ট ভবন এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবি। আর সবই আধুনিক।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের সময় লণ্ডনে মুর্শিদাবাদ অপেক্ষা কম লোকের বাস ছিল। সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত দুই শত বৎসরও হয় নাই। ইহার মধ্যে লণ্ডন পৃথিবীর বৃহত্তম শহরে পরিণত হইয়াছে। ইংলণ্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তিতে পরিণত হইয়া পর পর দুইটি মহাযুদ্ধের ফলে সেই গৌরব হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিভলিউশ্যন বা শিল্প-বিপ্লবের ফলে যন্ত্রশক্তিতে ইংলণ্ড অগ্রণী হইয়াছিল; যন্ত্রশক্তির সহায়তাপুষ্ট ইংরেজ-মজুরের উৎপাদনীশক্তি সবাইকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল; নির্ভীক, নিরলস ইংরেজ বণিক পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিপত্তন করিয়াছিল। লণ্ডন হইয়াছিল সমস্ত পৃথিবীর বাণিজ্য-কেন্দ্র; সমস্ত পৃথিবীকে মূলধন যোগান দিত লণ্ডন এবং সমস্ত পৃথিবীর বাণিজ্যের মাল বহন করিত লণ্ডনের জাহাজ। লণ্ডনের সে গৌরব আজ আর নাই। যুদ্ধোত্তর লণ্ডনের রূপ, সমস্যা ও সমাধান-প্রয়াস বিশেষরূপে প্রণিধানের বিষয়।

লণ্ডনের ডক এলাকায় বোমাবর্ষণের ফলে সংঘটিত বিস্তর ক্ষতি আজও দেখিতেছি। মধ্য-লণ্ডনের অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট এলাকায়ও কিছু কিছু বিধ্বস্ত গৃহ দেখিতেছি। পার্লামেণ্ট ভবনের কমন্স গৃহ এখনও পুনর্নির্মিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত

লণ্ডনের বাহ্যিক রূপের বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখি না। কিন্তু ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ভিত্তি একদম ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পূর্বে পৃথিবী ব্যাপিয়া ইংলণ্ডের মূলধন খাটিত ; তাহার স্থদ ছিল ইংলণ্ডবাসীর একটা বড় আয়ের উপায়। আজ সে মূলধন নাই, উপরন্তু সে নানা জাতির নিকট দায়িক। অন্যত্র হইতে কোন স্থদ আর ইংলণ্ডে আসে না ; তাহার নিজের আয়ের এক অংশ ঋণশোধের জন্য বাহিরে পাঠাইতে হইতেছে। পূর্বে সে যত জিনিষ বাহিরে পাঠাইত, বাহির হইতে আনিত তার অনেক বেশি। কারণ স্থদ প্রভৃতি বাবদ সে অনেক মাল পাইত। এখন সেই মূল্যের মাল বাহির হইতে আনিতে হইলে তাহাকে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি মাল বাহিরে চালান দিতে হইবে। তারপর দেনাশোধ ত আছেই। কাজেই পূর্বের চাল বজায় রাখা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে। পূর্বের চাল বজায় রাখিবার একমাত্র উপায় দেশের উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং তৎসহ বহির্বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন। প্রচুর জিনিষ উৎপাদন করিয়া বিদেশে বিক্রয় করিতে না পারিলে তাহার পূর্বেকার অবস্থা ত ফিরিয়া আসিবেই না, পরন্তু বিদেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যবস্তু আমদানী করাই তাহার পক্ষে কষ্টকর হইবে। ইংলণ্ড এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত এবং এদিকে তাহার চেষ্টার অবধি নাই।

প্রথমতঃ, ইংলণ্ড নিজেকে সর্বতোভাবে সংযমের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। খাদ্য এবং বস্ত্রের রেশন পূরাদমে চলিয়াছে।

প্রত্যেকের পরিমিত খাদ্য বরাদ্দ আছে। রুটি, মাখন, মাছ, মাংস, ডিম, তরকারী, চিনি সবই নিয়মিত বরাদ্দপ্রথার অন্তর্গত। প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন এবং নৈশভোজন সাধারণের এই ত্রিবিধ আহার। প্রতি বারে দু-এক টুকরা রুটি পাওয়া দায়। মাখন নামমাত্র। ডিম সপ্তাহে দুটো। মাংসের মধ্যে মেষ-মাংসই বেশি। মুর্গী দুর্লভ। তরকারীর মধ্যে আলু প্রচুর। অন্য তরকারী খুব কম। ফুলকপি দুর্লভ। বাঁধাকপি জন্মাইতে সময় বেশি লাগে ; তার বদলে খুব ছোট বাঁধাকপি জাতীয় ব্রাসেল্‌স স্প্রাউট দেওয়া হয়। এগুলি খুব তাড়াতাড়ি জন্মায়। মধ্যাহ্ন ও নৈশভোজনে তিনটি পদ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ একটি ডাল বা ঝোল ; দ্বিতীয় পদে এক টুকরা মাছ বা এক টুকরা মাংস, সঙ্গে কিছু তরকারী-সিদ্ধ এবং তৃতীয় পদে এক টুকরা কেক, পুডিং বা অন্য জাতীয় মিষ্টান্ন। পরে আধ কাপ কফি বা এক কাপ চা দেওয়া হয়। ইহাই প্রত্যেকের প্রাত্যহিক খাদ্য। আইনতঃ কোন হোটেলে ৫ শিলিঙের বেশি দাম লইতে পারে না। বড় বড় হোটেলে অবশ্য ঘরভাড়া, বাসনভাড়া প্রভৃতি বাবদ আরও কিছু আদায় করিয়া লয়। খাদ্য একঘেয়ে এবং অপ্রচুর। চকোলেট কিনিতেও কূপন লাগে। সবাইকে এই আহারে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সকালে বিকালে গৃহিণীদের রেশনের দোকানে লাইন দিতে হয়।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় আপিসবহুল অঞ্চলে হোটেলের

সাম্‌নে লম্বা লাইন দেখা যায়। কখনও কখনও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া তবে খাদ্য মেলে। ফল অপ্রাপ্য। শিশু বা রোগীর জন্য বেশি দুধ লাগিলে তাহার জন্য আলাদা কূপন সংগ্রহ করিতে হয়। বস্ত্রের কূপনও প্রচুর নয়। মোজা, জুতা, টুপী, টাই, সার্ট, কোট, স্যুট, বর্ষাতি, প্রত্যেক জিনিষটি কিনিতে কূপন চাই। সব সময় সকল জিনিষ পাওয়া যায় না। বড় বড় দোকান এক এক সময়ে মালশূন্য হইয়া যায়। স্যুটের অর্ডার দিলে তিন মাসের কমে উহা পাওয়া যায় না। তৈরী জিনিষই বেশীর ভাগ কিনিতে হয়। সাধারণ লোকের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির দাম অবশ্য খুবই কম। ৫ পাউণ্ড হইতে ১০ পাউণ্ডের মধ্যে স্যুট এবং ৫ পাউণ্ডে ওভারকোট পাওয়া যায়। গৃহের অভাব অত্যন্ত বেশি। হোটেলে স্থান নাই। যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া বিবাহিত ব্যক্তিগণ বাসোপযোগী গৃহ পাইতেছে না। সরকার গৃহনির্মাণ এবং বণ্টনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। সাধারণতঃ সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানের মারফতে গৃহ নির্মাণ করাইয়া বিলি করিতেছেন। রক্ষণশীল দল এই প্রথার পক্ষপাতী নন। তাঁহারা মনে করেন ধনীদিগকে গৃহনির্মাণের স্বাধীনতা দিলে বেশি গৃহ নির্মিত হইত। সরকার এ মত মানেন না। ইহা লইয়া তুমুল বিতর্ক চলিতেছে। মোটের উপর অন্ন, বস্ত্র এবং আশ্রয়স্থল সবই এখন সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং কোনটাই প্রচুর নয়।

অন্নবস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যও অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য।

আমদানী রপ্তানী এবং মুদ্রাবিনিময়ের উপর সরকারের কড়া শাসন। বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা শিল্পের জন্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ভিন্ন অন্য দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে দেওয়া হয় না। স্বদেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদির মধ্যেও বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যতীত স্বদেশে বেচিবার অনুমতি মিলে না। আমার লণ্ডনে অবস্থানকালে এক বিরাট প্রদর্শনী হইয়াছিল। প্রত্যহ বিশহাজার লোক প্রবেশমূল্য দিয়া এই প্রদর্শনী দেখিত। শিল্পজাত সর্ববিধ দ্রব্য এবং গৃহস্থের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য ইহাতে দেখান হইয়াছিল। সবই ইংলণ্ডে প্রস্তুত। প্রদর্শনীটির নাম দেওয়া হইয়াছিল "ইংলণ্ড ইহা তৈরি করিতে পারে" প্রদর্শনী। কিন্তু ইহার কোন জিনিষই ইংলণ্ডে বিক্রয়ের জন্য নহে; সবই বিদেশে চালান দিবার জন্য। সাধারণ লোকে ইহার নাম দিয়াছিল "ইংলণ্ড ইহা পাইতে পারে না" প্রদর্শনী। অনেক বিলাতী জিনিষ আমরা কলিকাতায় পাই, কিন্তু তাহা বিলাতে অপ্রাপ্য। ভাল ফাউণ্টেন পেন, নাইলন প্রভৃতি জিনিষ বিলাতে শুধু দুষ্প্রাপ্য নয় অপ্রাপ্য। সাবান ও তোয়ালেও সহজে পাওয়া যায় না।

সরকারের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হইতেছে সর্বতোভাবে দেশের উৎপাদনবৃদ্ধি। এ বিষয়ে মজুরদের নিকট প্রধান মন্ত্রী এটলীর ঘন ঘন আবেদন আমরা প্রায়ই শুনি। পূর্বোক্ত প্রদর্শনীটি এই উৎপাদনবৃদ্ধির প্রেরণা দিবার জন্যই করা হইয়াছিল। বিলাতী মালের অন্যান্য বিষয়ে সুনাম থাকিলেও ডিজাইনের

বিশেষ সুনাম নাই। তাই এঁরা এবার ডিজাইনের দিকে বিশেষ নজর দিয়াছেন। যাবতীয় জিনিষের কত রকমারি ডিজাইন হইতে পারে তাহাই এই প্রদর্শনীর প্রদর্শনীয় বিষয় ছিল। আমার ইংলণ্ডে অবস্থানকালে অপর একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল। সেটি প্লাষ্টিক্‌স প্রদর্শনী। কত রকমের প্লাষ্টিক্‌স হইতে পারে, প্লাষ্টিক্‌সের কত রকম ব্যবহার্য্য জিনিষ হইতে পারে এবং সেই সকল জিনিষের গুণ কি ইহা দেখানই ছিল এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। আজকাল প্লাষ্টিক্‌স দিয়া না হইতেছে এমন জিনিষ কম। কাপড় পর্যন্ত প্লাষ্টিক্‌স দিয়া তৈরী হইতেছে।

শিল্পবিপ্লবের ফলে যন্ত্রকৌশল এবং সংগঠন শক্তিতে ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিল। বিশাল সাম্রাজ্য তাহাকে কাঁচামাল যোগান দিত এবং তাহার বিপুল শিল্পজাত দ্রব্য সস্তার খরিদ করিত। এশিয়া তখন অবনত। শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমেরিকা শিশুমাত্র। ইউরোপের উঠন্ত এবং পড়ন্ত জাতিগণের মধ্যে শক্তিসাম্য রক্ষা করিত ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতি। তখন উৎপাদন যন্ত্রশক্তির সাহায্যে দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল; কাজেই আভ্যন্তরীণ অশান্তির সম্ভাবনা ছিল কম। কারণ, সকলের ভাগেই যথেষ্ট জুটিত এবং সকলেরই আয় বাড়িয়া চলিয়াছিল। ইংলণ্ড ছিল তখন জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু জনবল, প্রাকৃতিক সম্পদ, যন্ত্রকৌশল ও সংগঠনশক্তি—সবদিকেই আজ ইংলণ্ডের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে। রাশিয়া

এবং আমেরিকা দ্রুত বাড়্তির পথে চলিয়াছে। জনবল এবং প্রাকৃতিক সম্পদে উভয় দেশই আজ ইংলণ্ডের অগ্রগামী। যন্ত্রকৌশল এবং সংগঠন শক্তিতে আমেরিকা সবাইকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে। রাশিয়া তাহার বলিষ্ঠ সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে। ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক প্রথাব মূলে কিন্তু ভাঙ্গন ধরিয়াছে। আমেরিকা বহু পূর্বেই ইংলণ্ডের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়াছে। ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া এখন সাম্রাজ্যের দৃঢ়তম অংশ। কিন্তু তাহাদের নিজেদেরই সাহায্য-প্রয়োজন খুব বেশী। ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যবশে দুর্বল। ইউরোপের শক্তিসাম্যের দিনও ফুরাইয়া গিয়াছে। কাজেই আজ ইংলণ্ড নিজের উপর আস্থা হাবাইয়া ফেলিয়াছে, জগতে একচ্ছত্র প্রভুত্ব বজায় রাখা সম্বন্ধে তাহার মনে সংশয় জাগিয়াছে। নব নব যন্ত্র-কৌশলের উদ্ভাবনী শক্তিতে পিছাইয়া পড়ায় ইংলণ্ডের উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িতেছে না। ফলে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। দীর্ঘকালীন কঠোরতার ফলে এই দ্বন্দ্ব বাড়িতেছে এবং কর্মের উৎসাহও কমিয়া যাইতেছে। যদি বেশি কাজের ফলে বেশি ভোগ্যবস্তু না পাওয়া যায় তবে কাজে স্বতঃই উৎসাহ থাকে না। ধর্মঘটের মীমাংসা করা এ অবস্থায় কঠিন হইয়া পড়ে। শিল্পপতিগণ এ অবস্থায় উৎসাহহীন হইয়া পড়িতে পারেন। ইংলণ্ড আজ সর্বপ্রকারেই বেতনভুক্‌গণের গণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। বেতনভুকের প্রধান স্বার্থ তাহার বেতনের পরিমাণে

এবং কর্মের অবস্থায়; উৎপাদন-ব্যবস্থায় তার প্রত্যক্ষ স্বার্থ নাই। অথচ উৎপাদন না বাড়িলে তার ভাগ বাড়ানও কষ্টকর। শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ঘন ঘন মজুরদের প্রতি আবেদন জানাইয়া এবং কোন কোন শিল্প সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনিয়া এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তথাপি আজ ইংলণ্ডের সর্বত্র এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ইচ্ছা বা প্রয়োজনানুরূপ উৎপাদন বাড়িতেছে না। যদিও কঠোর ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র লাঘব করা হইতেছে না তথাপি ইংলণ্ড তাহার পূর্বের চাল ফিরাইয়া আনিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। তাই তাহার স্বেচ্ছাকৃত কঠোরতা এবং অভিনব উৎপাদন প্রচেষ্টা বিস্ময়কর হইলেও করুণারই উদ্রেক করে।

আজ ইংলণ্ডকে নূতন আদর্শে ঘর গুছাইতে হইবে। পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তাহার সময়। ভারতবর্ষ ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ যদি আজ দারিদ্র্য ও ভেদ-প্রবর্ধক-শাসন-মুক্ত হইয়া স্বাধীন ও স্বাবলম্বীভাবে ক্রমবর্ধমান শক্তি ও সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া বন্ধুভাবে ইংলণ্ডের পাশে দাঁড়াইতে পারে তবেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ ইংলণ্ডের অনুকূল হইতে পারে। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে রহিল বা বাহিরে গেল সে কথা এখানে অবান্তর। সাম্রাজ্য-ভুক্ত আয়ার্লণ্ড অপেক্ষা সাম্রাজ্যবহিঃস্থ আমেরিকাই গত যুদ্ধে ইংলণ্ডের অধিকতর মিত্রতা করিয়াছে। সকল বিষয়েই ইংলণ্ডের বর্তমানে চাই সাহস, দূরদৃষ্টি এবং সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা।

ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের নূতন নীতি এই দূরদৃষ্টি ও সাহসেরই ফল। ইহা আকস্মিক উদারতাও নয় বা তাহার দুর্বলতার পরিচায়কও নয়। তবে এইরূপ দূরদৃষ্টি ও সাহস ইংলণ্ডের বিশেষত্ব। শেষ পর্যন্ত নিজ শাসনাধীন দেশকে নিঃশেষে শোষণ করিবার চেষ্টা না করিয়া কালের ইঙ্গিত মানিয়া লইয়া অধীন দেশকে এবং স্বদেশকে পুনরুজ্জীবিত হইবার এইরূপ সুযোগ দিবার মত দূরদৃষ্টি, সাহস ও উদারতা অন্য কোন সাম্রাজ্যবাদী জাতির আছে কিনা সন্দেহ।

এ যুগসন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষেরও আজ সাহস, উৎসাহ ও দূরদৃষ্টি প্রয়োজন। এই অপূর্ব সুযোগের সদ্ব্যবহার তাহাকে করিতেই হইবে। কালের ইঙ্গিত আজ তাহার অনুকূল। এ ইঙ্গিতে সাড়া না দিলে সে আত্মহত্যার পাপ করিবে। যে আজ অন্তঃকলহে ইন্ধন যোগাইয়া বাধা সৃষ্টি করিবে সে দেশের শত্রু।

লণ্ডনে অবস্থান সময়ে রবিবারগুলি প্রায়ই বাহিরে কাটাই-তাম। এইরূপে চারিটি রবিবার কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, ব্রিষ্টল ও ব্রাইটনে কাটাই। এগুলি লণ্ডনের অনতিদূরবর্তী সুন্দর ছোট ছোট শহর। লণ্ডনের অগাধ জনসমুদ্র হইতে এখানে আসিয়া যেন থৈ পাওয়া যায়।

কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড কলেজ-প্রধান শহর। শহর দুইটি লণ্ডন হইতে যথাক্রমে প্রায় ৬০ ও ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। রাস্তায় ঘাটে ছাত্রই বেশি নজরে পড়ে। কলেজগুলি বাস্তবিকই

দর্শনীয়। সেগুলির ভিতরে হৈ চৈ কম—সত্য সত্যই বিদ্যাচর্চার উপযুক্ত নিকেতন। ছাত্রদের নৌকাবিহারে খুব আগ্রহ। শীর্ণকায়া ক্যাম্ নদী কেম্ব্রিজের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। নদীটি প্রশস্ততায় কালীঘাটের গঙ্গার অর্ধেক। লম্বা লম্বা নৌকায় চড়িয়া ইহাতেই ছাত্রগণ বাইচ্ খেলে। নদীপথে ৪।৫ মাইল অতিক্রম করিলে 'গ্র্যাণ্ট চেষ্টার' নামক স্থানে 'বেড্লায়ন' হোটেল ও বায়রন্স্ লজে পৌঁছানো যায়। লর্ড বায়রন্ নাকি এই বাড়ীতে থাকিতেন এবং এই হোটেলের পানীয় পছন্দ করিতেন। বাড়ীটির বর্তমান অধিবাসিনী এক তরুণীর সহিত আলাপ করিলাম। তিনি এ বিষয়ে খুব সচেতন বলিয়া বোধ হইল না। লর্ড বায়রন্ এ বাড়ীতে থাকিতেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঈষৎ হাসিয়া সংক্ষেপে উত্তর কবিলেন,' লোকে বলে।' অদূরে কবি রুপার্ট ব্রুকের বাড়ী। আশে পাশে জনবসতি খুব বেশি নয়। রাস্তার দু'পাশে কিছু কিছু পাতলা জঙ্গল। অক্সফোর্ডের এক পাশে টেম্স্ নদী, অপর পাশে চেরওয়েল নদী। চেরওয়েল ক্যাম হইতেও ছোট। টেম্স্ নদীর এখানকার দৃশ্য নয়নানন্দকর। নাতিপ্রশস্ত স্বচ্ছ-সলিলা এবং সলীলগমনা নদীটির তীরসংলগ্ন বড় বড় বোটে ক্লাব ঘর-সমূহ। নদীতে বহু বাইচের নৌকা। নদীর পাড় দিয়া ভ্রমণ খুব লোভনীয়। শহরের মধ্যে বিচরণকালে শেলী হাউস, অর্ভিং হাউস প্রভৃতি মনের ঔৎসুক্য বাড়ায়। এখানকার বিখ্যাত বড্লিয়ন লাইব্রেরী অষ্টম হেন্রীর আমলে নির্মিত হয়।

বর্তমানে আমেরিকার রক্‌ফেলার ফাউণ্ডেশনের অর্থসাহায্যে লাইব্রেরী-গৃহের আয়তন বাড়ান হইতেছে। পুস্তক প্রকাশের বর্তমান হার অপরিবর্তিত থাকিলে আগামী পাঁচ শত বৎসরে যত পুস্তক প্রকাশিত হইবে তাহা রাখিবার পক্ষে এই বর্ধিত অংশ পর্যাপ্ত। আমার লণ্ডনে অবস্থান কালে রাজা স্বয়ং এই বর্ধিত অংশের উদ্বোধন করেন। তখন ছাত্রগণ সেক্সপীয়রের একটি নাটক অভিনয় করে।

এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় দুইটি স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে তাহাদের গোঁড়ামি আজও সম্পূর্ণ ছাড়িতে পারে নাই। পূর্বে স্ত্রীলোকের বিদ্যার অধিকার ছিল না। এখন স্ত্রীলোকদিগকে পড়িতে দেওয়া হয় এবং পরীক্ষা দিতেও দেওয়া হয়। কিন্তু পাশ করিলে তাহাদিগকে অনেক বিষয়ে উপাধি দেওয়া হয় না; একটি ডিপ্লোমা দিয়াই বিদায় করা হয়। বিদ্যার অধিকার স্বীকৃত হইলেও ডিগ্রির অধিকার আজও স্বীকৃত হয় নাই।

ব্রিষ্টল লণ্ডন হইতে ১১৬ মাইল। যাইতে তিন ঘণ্টা লাগে। অনেক বোমাবিধ্বস্ত বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এখানে দেখিলাম। ভারতবাসীর নিকট ব্রিষ্টল তীর্থস্বরূপ। এখানে রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দির বিদ্যমান।

এভন নদীর তীরে ছোট ছোট পাহাড়ময় ব্রিষ্টল শহরটি দেখিতে মনোরম। পাহাড়ের গায়ে ও উপরে গৃহরাজি। শহরের বাহিরে একটি ঝুলানো সেতু প্রকৃতির লীলা-নিকেতনের শোভা বর্ধন করিতেছে। দুইটি শ্যামল পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গকে

সংযোগ করিয়াছে এই সেতু। নীচে পর্বতদ্বয়ের মধ্য দিয়া এভন নদী প্রবাহিত। তাহার পাড় দিয়া রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। পোলের উপর হইতে রেলগাড়ীকে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে দেখিয়া বক্রগতি অজগরের কথা মনে পড়ে।

রামমোহনের সমাধিস্থানটি শহরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মনোরম অংশে অবস্থিত। একটি অর্ধবৃত্তাকার পাহাড়। শিখর হইতে পাদদেশ পর্যন্ত ঢালু পর্বতগাত্রে সমাধি-মন্দিরেব শ্রেণী। পাহাড়টি খাড়া নয়। ধীরে ধীরে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। শিখরে অনেকটা সমতল ভূমি। ঢালু অংশ সমাধিতে সমাধিতে ভর্তি হইয়া গিয়াছে। এখন শিখরস্থ সমতল অংশ ব্যবহৃত হইতেছে। রামমোহনের সমাধি পাহাড়ের পাদদেশে—ফটক দিয়া ঢুকিযা ডাইনে। মন্দিরের ছবিটি ভারতীয়গণের নিকট পরিচিত। প্রবেশমাত্র সুপরিচিত ছবির বাস্তব মূর্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। রামমোহনের মৃত্যু হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। তৎ পূর্ববর্তী কোন সমাধি দেখিলাম না। সে দিন রবিবার, ১০ই কার্তিক, ২৭শে অক্টোবর। অপরাহ্ণ-সূর্য পশ্চিমে হেলিয়া অর্ধবৃত্তাকার পর্বতগাত্রস্থ সমাধিমন্দির-শ্রেণীর চূড়ায় স্বর্ণকিরণ ঢালিতেছিল। কত নরনারী তাহাদের প্রিয়জনের সমাধিপার্শ্বে বসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। কেহ সমাধিমন্দিরের গাত্র সম্মার্জিত করিয়া পুষ্পস্তবকে সাজাইতেছে। পাহাড়ের পাদদেশে লোকসমাগম নাই। সে সমাধিগুলি শতাধিক বর্ষের। শিখরে লোকসমাগম সর্বাপেক্ষা বেশি। সেখানকার

সমাধিগুলি আধুনিক। অপরাহ্ণ-সূর্যের ক্রমবিলীয়মান কিরণ-লেখায়, প্রাকৃতিক শোভার অপূর্ব পরিবেশে, পর্বতগাত্রস্থ সহস্রাধিক সমাধিশ্রেণীর মধ্যে শত শত নরনারীর নীরব আকুতি যখন জীবন ও মরণের মধ্যে সেতু নির্মাণ করিতেছিল, তখন এক অভিনব অনুভূতিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বেদনা-কাতর চিত্তেই সে দিন লণ্ডনে ফিরিয়াছিলাম।

ব্রিষ্টলে দুইটি ভদ্রলোকের আচরণ বেশ মনে পড়ে। সে-দিন পূর্বাহ্নে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। রাস্তায় লোক খুব কম। জনৈক পথচারীর কাছে রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ঝুলন্ত সেতুর দিকে চলিয়াছি। খানিক দূর গিয়া রাস্তা জিজ্ঞাসা করিবার লোক আর পাইতেছি না। এমন সময়ে একটি পথিক সেই পথে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমি যুদ্ধের সময় অনেক দেশে গিয়াছি। কলিকাতায়ও ছিলাম। বিদেশে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া অজানা পথ চলার অসুবিধা আমার ভালই জানা আছে। আমার সঙ্গে আসুন।" আমার আপত্তি সত্ত্বেও ভদ্রলোক অনেক দূর পর্যন্ত আমাকে রাস্তা দেখাইয়া দিলেন। শেষে একটি পায়ে-চলা পথের উপর দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এই পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেতু পর্যন্ত উঠিয়াছে। আপনি এই পথ ছাড়িবেন না। তাহা হইলে যথাস্থানে পৌঁছাইতে পারিবেন। সেতু কাছেই।" পাহাড়টির নাম ক্লিফটন। আঁকা বাঁকা পাহাড়ের রাস্তায় খানিকদূর উঠিয়া আবার সাহায্যের প্রয়োজন

বোধ করিলাম। সহসা একটি যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাস্তা জিজ্ঞাসা করিতেই যুবকটি আমাকে প্রশ্ন করিল,—“আপনি ভারতীয় ?”

আমি—“হ্যাঁ”

যুবক—আমি যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে ছিলাম। কিছুদিন করাচীতে কাটাইয়াছি।

আমি—করাচী তাহার সুন্দরতম অংশের নাম আপনাদের শহর হইতেই ধার করিয়াছে দেখিতেছি।

যুবক—হ্যাঁ, করাচীতে ক্লিফটনের সমুদ্রসৈকত সত্যিই মনোরম।

যুবকটি আমাকে সেতুর খুব নিকট পর্যন্ত আগাইয়া দিল। তারপর আর কাহারো সাহায্য বিনাই সেতু পর্যন্ত গিয়াছিলাম।

লণ্ডনে পৌঁছিয়া একমাস বেশ ভাল আবহাওয়া পাইয়াছিলাম। গোটা অক্টোবর মাসটাই খুব রৌদ্র ছিল। কুয়াশা, মেঘ বা বৃষ্টি মোটেই ছিল না। তাপ সাধারণতঃ ৪৫° হইতে ৫৫° ডিগ্রী পর্যন্ত উঠা-নামা করিত। নভেম্বরের প্রথমে রৌদ্র কমিয়া আসিল। কুয়াশা, মেঘ ও বৃষ্টি দেখা দিল। তাপ কমিয়া ৪০° ডিগ্রীতে নামিল ; কখনও বা আবও নীচে যাইতেছিল। দিন ছোট হইয়া আসিল। আমার কাজও তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমেরিকা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। কবে বিমানে স্থান জুটিবে সেই সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছি। খারাপ আবহাওয়া এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে মন খুব

প্রফুল্ল নাই। এই অবস্থায় এক রবিবারে ব্রাইটন দর্শনে বহির্গত হইলাম। ব্রাইটন লণ্ডন হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণে। রেলে যাইতে এক ঘণ্টা লাগে।

ব্রাইটন নগর আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। সম্রাট চতুর্থ জর্জ সমুদ্রবাসের জন্য এখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করান। প্রাসাদটি ১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের হাসপাতালরূপে ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি এই শহরের লোকেরা যে সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ পাতিয়ালার মহারাজা প্রাসাদটির দক্ষিণে একটি সুন্দর খিলানযুক্ত ফটক তৈরি করাইয়া দেন। সেটি আজিও স্থানটির শোভা বর্ধন করিতেছে। ব্রাইটনের নাগরিকগণও ভারতীয় সৈন্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। স্তম্ভটি সুদৃশ্য। শহর হইতে দূরে।

এখানে সমুদ্রের তীরে বালি নাই। তীর অপ্রশস্ত। ছোট বড় নানারূপ নুড়িতে ভর্তি। প্রশস্ত বাঁধানো রাস্তা তীর ধরিয়া বরাবর চলিয়া গিয়াছে। বেড়াইবার বেশ সুবিধা। দুইটি বড় বড় ঘাট বা 'পায়ার' আছে; বেশ সুন্দর। কাঠের মঞ্চ তীর হইতে সমুদ্রের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়াছে। তার উপরে বড় বড় কাঠের ঘর ও অঙ্গন। খোলা আঙ্গিনায় বেড়াইতে খুব ভাল লাগে। বসিবার জন্য চেয়ার পাতা আছে। বসিলে তিন পেনি ভাড়া দিতে হয়। একটি ঘরে খাইবার সু-বন্দোবস্ত আছে। বড় হলঘরে সমুদ্র দেখিতে দেখিতে

আহার চলে। অন্যান্য ঘরে আমোদ-প্রমোদের নানারূপ বন্দোবস্ত। সর্বদাই উৎসব চলিতেছে। বেশ লোকের ভিড়। সমুদ্র দেখিতে অনেকটা মাদ্রাজের সমুদ্রের মত। পুরীর সমুদ্রের মত ঢেউ নাই। তীরের কাছে হংসশ্রেণী সাঁতার কাটিতেছে। বেড়াইবার জন্য ছোট ছোট নৌকাও ভাড়া পাওয়া যায়।

সেইদিন সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বৈকালে বেশ রৌদ্র উঠিল। 'পায়ারে'র উপর দাঁড়াইয়া দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র দেখিতেছি। অপরাহ্ণ সূর্য আকাশের গায়ে হেলিয়া পড়িয়াছে। কবি কল্পনা যেন চোখের সামনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—

"ঝলিতেছে জল তরল অনল
গলিয়া পড়িছে অম্বর-তল
দিক্‌বধূ যেন ছল ছল আঁখি
অশ্রুজলে।"

দিগন্তের পরপারে এই উর্মিমুখর মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া শীঘ্রই আমাকে 'আমেরিকায় যাইতে হইবে। কেবলই মনে হইতেছে—

কি আছে হোথায়—চলেছি কিসের
অন্বেষণে ?

কিন্তু "সংশয়ময় ঘননীল নীর" নিরুত্তর।

তপন নীরবে দূরে পশ্চিমে গগনকোণে ডুবিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের "নিরুদ্দেশ যাত্রা" কবিতাটি মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে ষ্টেশনাভিমুখে ফিরিলাম।

৩রা নভেম্বর* রবিবার ব্রাইটন যাই। ১৪ই নভেম্বর লণ্ডন হইতে আমেরিকা যাত্রা করিব। এই কয়দিনে আবহাওয়ার অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইল। শীত বাড়িল। রৌদ্র অবলুপ্ত হইল। কুয়াশা ও মেঘে সর্বদাই আকাশ আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়ে।

লোকজন দ্রুত কাজ সারিয়া গৃহে ফিরিয়া আগুন পোহায়। পার্ক জনশূন্য। আপিসের পর রাস্তাও প্রায় জনশূন্য। সাত আট তারিখের মধ্যে আমার কাজ শেষ হইয়া গেল। তখন এই আবহাওয়ায় মনের প্রফুল্লতা রাখা কষ্টকর হইল। ১০ই নভেম্বর রবিবার কিউ উদ্যানে গেলাম। কিন্তু সে সুরম্য উদ্যান আজ রিক্ত। গাছে পাতা নাই, ফুল নাই। বৃষ্টিপ্লাবিত হাওয়ায় ঘাসে ঢাকা মাঠগুলিরও আর সে শোভা নাই। লণ্ডনের অবিশ্রাম জনস্রোতের মধ্যেও আর সজীবতা নাই বলিয়া মনে হয়। যেন যন্ত্র-চালিতের মত সবাই আপিসে যায়, আবার আপিসের কার্য অন্তে দ্রুত গৃহে ফেরে। মাঝে মাঝে মনে হইত চিড়িয়াখানায় গিয়া জীবজন্তুর গতিবিধি ও সজীবতা দেখিয়া আসি। এই সময় প্রায়ই ন্যাশন্যাল আর্ট গ্যালারীতে যাইতাম। এই গৃহটি সজীবতা ও আনন্দের নিত্য-লীলাভূমি; শীত ঋতুর জড়তা আনয়নকারী প্রভাবের অতীত। প্রবেশমাত্র মনের সমস্ত গ্লানি দূর হইয়া যায়। সমগ্র মানব-জাতির সুখ ও দুঃখ, প্রেম ও ঘৃণা, দম্ভ ও বিনয়,

* ১৭ই কার্তিক।

বীরত্ব ও ভীরুতা, আকুতি ও প্রত্যাখ্যান, দয়া ও হিংসা প্রভৃতি যাবতীয় ভাব ও রস শিল্পিগণের প্রতিভায় যেন পরিপূর্ণ মহিমায় এই ঘরে বিরাজমান।

তৃতীয় অধ্যায়

আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম

সেদিন ২৮শে কার্তিক,* বৃহস্পতিবার। সারা দিন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। দুদিনে পথিক মাত্রই গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনে ত্বরান্বিত। ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী দিবালোক নির্বাণ হইবার অনতিকাল পরেই আমি হোটেল হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিমান কোম্পানীর সহরের আপিসে উপনীত হইলাম।

কোম্পানীর বাস যাত্রিদল লইয়া ৭টা ৩৫ মিনিটে আপিস ত্যাগ করিল। 'প্রায় সাড়ে আটটায় আমরা পুল বিমান-ঘাটিতে পৌঁছাই। পুলিশ ও শুল্ক-ঘাটি অতিক্রম করিয়া, চা পানে পরিতৃপ্ত হইয়া রাত্রি দশটায় বিমানে উঠি। সাড়ে দশটায় বিমান উড়িতে আরম্ভ করে। কৃষ্ণা ষষ্ঠীর মেঘে ঢাকা "দ্বিগুণ রাত"। সাড়ে ছ' হাজার ফুট উঁচু দিয়া ঘণ্টায় ২৭৪ মাইল বেগে উড়িয়া রাত্রি বারটায় আইরিশ স্বাধীন রাষ্ট্রের শ্যানন বিমান-ঘাটিতে অবতরণ করি। শ্যানন আটলাণ্টিক

* ১৪ই নভেম্বর।

মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। এখান হইতে বিমান মহাসাগর অতিক্রম সুরু করিবে। এখানে যাত্রীদের প্রচুর খাইবার ব্যবস্থা ছিল। ডিম, মাখন, চিনি ও ঘিয়ে ভাজা মেষমাংসের প্রাচুর্য দর্শনে অনটন-ক্লিষ্ট ইংরেজ নরনারীগণ আনন্দ চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলেন।

রাত্রি প্রায় আড়াইটায় বিমান উড়িতে সুরু করিল। বিমানটি স্পিড্‌বার্ড শ্রেণীর। ইয়র্ক শ্রেণীর বিমান অপেক্ষা অনেক বড়; কিন্তু গর্জন কম। চারিটি ইঞ্জিন। চল্লিশটি আসনে কুড়িজন যাত্রী। প্রত্যেককে পাশাপাশি দুইটি করিয়া আসন দেওয়া হইয়াছে। আসনগুলি বেশ প্রশস্ত। দুইটি আসনের মধ্যবর্তী হাতলটি উঠাইয়া লওয়া যায়। প্রত্যেক আসনের পিঠ ইচ্ছামত উঠান বা নামান যায়। যাত্রিগণ কখনও ইচ্ছামত আসনের পিঠ নামাইয়া আরাম করিতেছেন, কখনও বা আসনদ্বয়ের মধ্যবর্তী হাতলটি তুলিয়া লইয়া দুইটি আসনের উপর একটু লম্বা হইতেছেন। একটি ষ্টুয়ার্ড ও একটি ষ্টুয়ার্ডেস যাত্রিগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আহার সম্বন্ধে সর্বদা তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া উড়িতেছি। আট হাজার ফুট উচ্চে ঘণ্টায় প্রায় দুই শত মাইল বেগে বিমান সগর্জনে ছুটিয়াছে। একঘেয়ে গর্জন ও সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। যাত্রিগণ সকলেই নিদ্রাচ্ছন্ন। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন আমার ঘড়িতে সাতটা।

উপরে স্বচ্ছ উদার নীলাকাশে কৃষ্ণা ষষ্ঠীর চাঁদ উজ্জ্বল লাবণ্য বিকীরণ করিতেছে। কালপুরুষ ও অন্য দু' একটি তারা পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। নীচে পুঞ্জীভূত মেঘ ও কুয়াশা মহাসাগরকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এত পরিষ্কার আকাশ পূর্বে কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বিমানে যে মহাসাগর অতিক্রম করা কতিপয় বৎসর পূর্বে দুঃসাহসিক যুবকের স্বপ্নমাত্র ছিল, আজ তাহা তন্দ্রা-চুম্বিতনেত্রে ঐ প্রসন্ন আকাশেরই মত প্রফুল্লচিত্তে অতিক্রম করিতেছি।

সাড়ে আটটা বাজিতে পূর্বদিগন্তে ঈষৎ রক্তিমাভা দেখা দিল। চাঁদ ও তারাগুলি ধীরে ধীরে নিস্প্রভ হইতে লাগিল। নীচে মেঘমালার মধ্য দিয়া নীলাম্বুরাশি দৃষ্টিগোচর হইল। সাড়ে ন'টা বাজিবার আগেই পূর্বের লাল আভা কাটিয়া গেল। পূর্বদিগন্তে আকাশের খানিকটা অংশ পরিষ্কার হইল। তাহার কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে নানা বর্ণের কৃষ্ণাভ মেঘ দেখা দিল। ক্রমশঃ ঐ কৃষ্ণাভ মেঘে লাল রঙ্ ফুটিয়া উঠিল। বিচিত্র রঙের খেলা সুরু হইল। তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা দেবকন্যাগণ যেন সুবর্ণ-মণ্ডিত হইয়া সূর্যদেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গলানো স্বর্ণাঞ্চল বিছাইতেছেন। কি রঙের খেলা আর কি সাজের আড়ম্বর! চোখ ফেরানো যায় না। ঠিক দশটায় নীলাম্বুরাশি ভেদ করিয়া সূর্য ঈষৎ আত্ম-প্রকাশ করিলেন। সূর্যের সবটা দৃষ্টিগোচর হইতে পাঁচ মিনিট সময় লাগিল। তখনও সূর্য ঈষৎ লম্বা আকারের। সম্পূর্ণ গোলাকার হইতে আরও দু-তিন মিনিট

লাগিল। তখন বাল-সূর্যোদ্ভাসিত আটলান্টিক মহাসাগর ও আকাশের সুনীল রূপ সম্পূর্ণ সুপ্রকট। চারিদিকে প্রসন্নতা বিরাজ করিতেছে। আকাশ, মহাসাগর ও সমস্ত প্রকৃতি শান্ত। দুই শত মাইল বেগে চলন্ত বিমানও যেন স্থির। লোকালয়ের বহুদূরে আকাশ-ঘেরা মহাসাগরের মধ্যে আট হাজার ফুট ঊর্ধ্বে প্রকৃতির অন্তঃপুরে বসিয়া আছি। রাত্রে চন্দ্রকিরণবিধৌত নীলাকাশ যখন হাস্যচ্ছটা বিস্তার করিতেছিল, তখন মেঘলোকের ঊর্ধ্বে বসিয়া ভাবাবেশে সেই রূপরাশি উপভোগ করিতেছিলাম। প্রাতঃকালে সমুদ্রস্নাতা ধরিত্রী যখন বালসূর্যের সিন্দূর-বিন্দু নীলাকাশ-সীমন্তে ধারণ করিয়া নবরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন মেঘলোকের ঊর্ধ্বে থাকিয়াও—
"সম্ভ্রম ভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে!"

লণ্ডন-সময় দশটায় ঠিক সূর্যোদয়কালে বিমানে প্রাতরাশ পরিবেশিত হইল। মহাসাগরের উপর দিয়া চলিয়াছি। নীচে মসৃণ নীলাম্বুরাশি। উপরে ও চারিদিকে নীলাকাশ। মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের সজ্জা। সহসা স্থলভাগ দৃষ্টিগোচর হইল। ধূসর বন্ধুর প্রান্তর। মহাসমুদ্র যেন পৃথিবীর সমস্ত গ্লানি ধোয়াইয়া দিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে আদর করিতেছেন। লণ্ডন-সময় একটা পনর মিনিটে আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী গেণ্ডার বিমান-ঘাটিতে অবতরণ করিলাম।

গেণ্ডার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে অবস্থিত। সমুদ্র-তীরবর্তী অনুর্বর ভূমি। ইতস্ততঃ ছোট ছোট পাহাড়। সবুজের রেখা দেখা

যায় না। বহুক্ষণ জলের উপব দিয়া উড়িবার পব পৃথিবীর পর্বতসঙ্কুল ধূসর রূপ বেশ লাগিতেছে। গেণ্ডারে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া লণ্ডন-সময় আড়াইটায় পুনরায় উড়িলাম। নীচে শুধু সাদা মেঘের রাশি বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে বিছানো একটি বিরাট ফরাসের মত পড়িয়া আছে। উপর হইতে তাহার 'পর প্রখব রৌদ্র পতিত হওয়ায় মেঘমালা আরও শুভ্র দেখাইতেছে। উপরে পরিষ্কার নীলাকাশ। আট হাজার ফুট উচ্চে ঘণ্টায় দুইশত পঁয়ষট্টি মাইল বেগে উড়িতেছি। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড অতিক্রম করিযা একটি সমুদ্রের খাড়ির উপর আসিলাম। খাড়ি পার হইয়া নোভাস্কাটিয়ার উপকূল দিয়া উড়িতেছি। দূবে সমুদ্র দেখা যাইতেছে। উপকূলভাগ জলা, স্যাঁতসেঁতে, অনুর্বব ও লোকবসতিশূন্য। আর একটি সমুদ্রের খাড়ি পার হইয়া আমেরিকার যুক্তবাষ্ট্রে পড়িলাম। লণ্ডন-সময় প্রায় সাড়ে পাঁচটায় নিউইয়র্কের লাগার্ডিয়া বিমান-ঘাটিতে অবতরণ কবিলাম।

শুল্ক, পুলিস্ ও স্বাস্থ্য বিভাগের ঘাটি অতিক্রম করিতে প্রায় আধঘণ্টা গেল। আমার জন্য ওয়াশিংটনের টিকিট লইয়া এক জন আমেরিকান ভদ্রলোক বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাহিবে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা হইল। আমার ঘড়িতে তখন বৈকাল সোয়া ছয়টা। তখন স্থানীয় সময় সওয়া একটা। ঘড়ি পাঁচ ঘণ্টা পিছাইয়া দিলাম। পার্শ্ববর্তী একটি ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—আপনি দেখিতেছি ফাঁকি দিয়া পাঁচ ঘণ্টা সময় লাভ করিয়া লইলেন।

আমি (সহাস্যে)—আবার আগামী মাসেই অস্ট্রেলিয়া যাইবার সময় সুদসহ এই লাভ শোধ করিতে হইবে।

ভদ্রলোকটি (সহাস্যে)—এত শীঘ্র! এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

যে ভদ্রলোকটি আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, এখন মাত্র দেড়টা। আপনার ওয়াশিংটনের বিমান চারটায় ছাড়িবে। এখন মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপনান্তে খানিকটা বেড়াইয়া লইতে পারেন। এই বলিয়া ওয়াশিংটনের টিকিট আমাকে দিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, এখানে এখন মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় বটে, কিন্তু আমার মধ্যাহ্ন-ভোজন গেণ্ডারে হইয়া গিয়াছে, আমি ক্ষুধার্ত নই। মালের ব্যবস্থা করিয়া খানিকটা ঘুরিতেই চাই। ভদ্রলোক আমার লগেজ লণ্ডনের বিমান হইতে খালাস করিয়া ওয়াশিংটনের বিমান-কর্মচারীদের হেফাজতে দিলেন। তারপর আমাকে চা ও "হট্-ডগ্" খাওয়াইয়া আপ্যায়িত করিলেন। "হট-ডগ" ছোট এক টুকরা গরম বরাহ-মাংস সহ ছোট এক টুকরা রুটী। রাস্তায় বা মাঠে যাইয়া আমরা যেমন চানাচুর বা আলুভাজা খাই, আমেরিকানরা সেইরূপ "হট-ডগ্" খায়। কয়েকদিন পরে কাগজে দেখিয়াছিলাম যে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান খেলা দেখিতে গিয়া খেলার মাঠে সবার সঙ্গে "হট্-ডগ্" খাইলেন।

"হট-ডগ্" খাইয়া ভদ্রলোকটির সহিত ইতস্ততঃ ঘুরিলাম। নির্মল আকাশ। চমৎকার রৌদ্র। এমন সুন্দর দিন ভারতবর্ষ

ছাড়িবার পর দেখি নাই। লাগার্ডিয়া বিমান-ঘাটি পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান-ঘাটি। এক অংশ বিদেশে যাতায়াতের বিমানের জন্য এবং অপর অংশ আভ্যন্তরীণ বিমানের জন্য নির্দিষ্ট। অনবরতই যাত্রী লইয়া বিমান উড়িতেছে বা নামিতেছে। আমেরিকা বৃহৎ দেশ। আয়তনে ভারতবর্ষের দেড়গুণ। ধনে ও ব্যবসায়ে আমেরিকাবাসীরা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই এখানে বিমানের যাতায়াত খুব বেশী। নিউইয়র্ক সহরের কেন্দ্রস্থল বিমান-ঘাটি হইতে বার বা তের মাইল হইবে। বিমান-ঘাটির চারিদিকে ঘুরিয়া ভদ্রলোকটির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ওয়াশিংটনের বিমানে চড়িলাম। বিমানটি বিরাট কনষ্টিলেশ্যন্ শ্রেণীর। এই শ্রেণীর বিমানই নাকি এখন সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। বিমানটিতে চাবটি ইঞ্জিন। পঞ্চাশটি আসনে পঞ্চাশজন যাত্রী। একজন তত্ত্বাবধায়িকা যাত্রীদের সর্বদা তত্ত্বাবধান কবিতেছেন ও আহারাদি পরিবেশন করিতে-ছেন। নিউইয়র্ক হইতে ওয়াশিংটন দুই শত মাইলের কিছু বেশি। যাইতে এক ঘণ্টা লাগিল। চারিটায় রওনা হইয়া ঠিক পাঁচটায় ওয়াশিংটন পৌছিলাম।

লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক পর্যন্ত তিন লম্ফে ৩২৭৩ মাইল পথ উড়িয়াছি। লণ্ডন হইতে শ্যানন ৩৭২ মাইল, শ্যানন হইতে গেণ্ডার ১৯৭৫ মাইল এবং গেণ্ডার হইতে নিউইয়র্ক ৯২৬ মাইল। শ্যানন ও গেণ্ডার আটলান্টিক মহাসাগরের উভয় তীরে অবস্থিত। শ্যানন হইতে মহাসাগর অতিক্রম সুরু হয় এবং

মহাসাগর পার হইয়াই গেণ্ডার। নৈশভোজনের পর লণ্ডন ত্যাগ করিয়া পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় বিমান নিউইয়র্কে উপনীত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়াশিংটন

পটোম্যাক্ নদীতীরে উত্তুঙ্গ-ওয়াশিংটন-স্মৃতি-স্তম্ভ-চিহ্নিত সুসজ্জিত ওয়াশিংটন শহর। আকাশ হইতে শহরের মনোরম শোভা দেখিতে দেখিতে বিমান-ঘাঁটিতে অবতরণ করিলাম। তখন বৈকাল পাঁচটা। অনুসন্ধান-টেবিলে খোঁজ লইয়া জানিলাম যে, ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় দূতাবাসের জনৈক আমেরিকান কর্মচারী আমার জন্য ঘাঁটিতে অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম। মাল খালাস করিতে গিয়া দেখি মাল আসে নাই। ঘাঁটির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট এ বিষয় বলিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোন-যোগে নিউইয়র্ক এবং অন্যান্য স্থানে কথা বলিয়া দশ মিনিটের মধ্যে মালের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন। সবিনয়ে বলিলেন, 'আপনার মাল ভুলক্রমে নিউইয়র্ক হইতে বষ্টন চলিয়া গিয়াছে। আমরা পরবর্তী বিমানে বষ্টন হইতে মাল আনাইয়া রাত্রি দশটার মধ্যে আপনার হোটেলে পৌঁছাইয়া দিব।

আপনার খুবই অস্থুবিধা হইবে। আমাদের বহু যত্নসত্ত্বেও ক্বচিৎ এরূপ ভুল ঘটিয়া যায়। আশা করি আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া মার্জনা করিবেন।' আমার মালের মধ্যে ছিল তুইটি থলি। একটি ছোট ও একটি বড়। ক্ষুর, দাঁতের মাজন প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য বস্তুগুলি একটি ক্ষুদ্র হাত-ব্যাগেব মধ্যে ছিল। সেটিকে বড় থলির মধ্যে বাখিয়াছিলাম। কাজেই এত লম্বা ভ্রমণের পব দন্তধাবন, বস্ত্রপবিবর্তন প্রভৃতি কিছুই করিতে পারিব না মনে করিয়া বডই অস্বস্তি বোধ করিলাম। যদিও ইহাবা বলিল, রাত্রি দশটা অর্থাৎ মাত্র সাডে চারি ঘণ্টার মধ্যে ইহারা আমার মাল পাঁচ শত মাইল দূববর্তী বষ্টন হইতে আনাইয়া নিজেরাই হোটেলে পৌছাইযা দিবে তথাপি ভারতবর্ষীয় অভিজ্ঞতা-পুষ্ট আমার মন এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছিল না। অনন্যোপায় হইযা ক্ষুণ্ণ মনে দূতাবাসের বন্ধুটির সঙ্গে তাঁহাবই গাডীতে হোটেলেব দিকে চলিলাম। এখানে ভারতীয়ের সাক্ষাৎ বিবল হইবে এ চিন্তাও মনে উদিত হইল। দূতাবাসেব বন্ধুটিব সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে শহবেব মধ্য দিযা চলিযাছি। তখন দিবালোক নির্বাপিতপ্রায়। রাস্তাব প্রশস্ততা, মসৃণতা ও পরিচ্ছন্নতা চোখের তৃপ্তি উৎপাদন করিল। লিঙ্কন-স্মৃতি-মন্দিরে আলোকোদ্ভাসিত লিঙ্কনের মুখখানি ছবির মত চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। এক সুরম্য উদ্যান-মধ্যবর্তী রাস্তা অতিক্রম করিয়া এক বিরাট হোটেলে উঠিলাম। ভিতরে

ঢুকিয়াই দেখি অভ্যর্থনা-কক্ষে শ্রীযুত রাধাকুমুদ ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় আমার সম্মুখে। ইঁহাদের অপ্রত্যাশিত দর্শনে মনের গ্লানি অনেকটা দূর হইল। সাড়ে দশটা বাজিতে ঘরে বসিয়া হোটেলের আপিস হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাইলাম যে বিমান-ঘাঁটি হইতে আমার জন্য দুইটা থলি আসিয়াছে। দুই মিনিটের মধ্যে স্বগৃহে আমার বষ্টন-ফেরত থলিদ্বয়-দর্শনে প্রিয়-মিলনের আনন্দ অনুভব করিলাম।

পরদিন শনিবার,* ৩০শে কার্তিক। আমেরিকার সমস্ত সরকারী আপিস ও ব্যাঙ্ক বন্ধ। কিন্তু ভারতীয় দূতাবাস খোলা। সকালে দূতাবাসে গিয়া শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের খোঁজ লইতেছি, এমন সময় তিনি তদীয় সহকর্মী ছাত্র শ্রীযুত পীতাম্বর পন্থের সহিত দূতাবাসে আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম তাঁহারা সহরের কেন্দ্রস্থলে "মেফ্লাওয়ার" নামক একটি হোটেলে আছেন। দূতাবাসের কর্ম সমাপনান্তে তাঁহাদের সহিত নিকটবর্তী একটি "কেফিটেরিয়া"য় মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিয়া তাঁহাদের হোটেলে গেলাম। মহলানবিশ মহাশয় তিন-চারি দিনের মধ্যেই ওয়াশিংটন ত্যাগ করিবেন এবং শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরিবেন। এ কয়েক দিন তাঁহার সঙ্গে ওয়াশিংটনস্থ সরকারী কর্মচারিসমাজে পরিচিত হইবার চেষ্টা করিলাম।

* ১৬ই নভেম্বর।

শ্রীযুত মহলানবিশ-গৃহিণী তখন ওয়াশিংটনে। সেদিন তিনি ডাক্তার ডেমিং এর গৃহে আতিথ্যস্বীকার করিয়া বাস করিতেছিলেন। ঐ দিন রাত্রে এতদুপলক্ষে ডেমিং এক ভোজের ব্যবস্থা করিলেন। আমিও সেই ভোজে নিমন্ত্রিত হইলাম। ডেমিং "বাজেট-ব্যুরোর" সংখ্যাবিজ্ঞান বিভাগে একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ। ঐ দিন ভোজে স্ত্রী-পুরুষে প্রায় কুড়ি জন অতিথি ছিলেন। পুরুষগণ সকলেই প্রতিষ্ঠাবান সরকারী কর্মচারী। কেহ আণবিক গবেষণায়, কেহ গণিতে, কেহ সংখ্যাবিজ্ঞানে, কেহ অর্থনীতিতে, কেহ বা বাণিজ্যবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। সকলেরই মন সজীব ও সতেজ ; সকলেই বলিষ্ঠ আশাবাদী। ইঁহাদের ও ইহাদের পত্নীগণের সঙ্গে পরিচিত হইয়া ও আলাপ করিয়া পরম আপ্যায়িত বোধ করিলাম।

সেদিন অতিথিগণের মধ্যে নানা বিষয়ে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। গত নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি চৌদ্দ বৎসরের পর—কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট ডিমোক্রেটিক পার্টিরই রহিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় শাসন-ব্যবস্থার কিরূপ পরিবর্তন ঘটে—সে বিষয়ে সকলেরই বিশেষ উৎকণ্ঠা। এদেশে প্রেসিডেণ্ট চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। কিন্তু কংগ্রেস নির্বাচিত হয় দুই বৎসরের জন্য। কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্টের দলগত সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিলে শাসনকার্যে বিভ্রাট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বিলাতী প্রথায় হাউস অব্ কমন্সে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তাহারই নেতা প্রধানমন্ত্রী-

রূপে শাসন-তরণীর কর্ণধার হন। কাজেই তিনি যেভাবে শাসন-তরণী চালাইতে চাহেন, কমন্সগণ তাহা অনুমোদন করেন। আর যদি কখনও মন্ত্রিগণ কমন্সগণের অনুমোদন লাভে অসমর্থ হন তাহা হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করেন। যাঁহারা কমন্সগণের অনুমোদন লাভ করিতে পারিবেন তাহারা তখন মন্ত্রী হন। কাজেই বিলাতে মন্ত্রিগণ ও কমন্সগণের মধ্যে কখনও দলগত বা নীতিগত অসামঞ্জস্য বা বিরোধ উপস্থিত হয় না। কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস স্বতন্ত্রভাবে দেশবাসীর ভোটে নির্বাচিত হন। ফলে প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সমদলীয় নাও হইতে পারেন। কিন্তু দল দুইটি এখানে এরূপ শক্তিশালী যে যখন প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের যুগপৎ নির্বাচন হইয়াছে তখন কদাপি তাঁহাদের দলগত বৈষম্য হয় নাই। কিন্তু যখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের কার্যকালের মধ্যভাগে নির্বাচিত হইয়াছে, তখন কখন কখন দলগত বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে, এবং যখনই এইরূপ হইয়াছে তখনই প্রেসিডেন্টের শাসন-তরণী চালনায় বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট উইলসন ও প্রেসিডেন্ট হুভারের শেষের দুই বৎসর এইরূপ ঘটিয়াছিল। প্রেসিডেন্ট উইলসন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লীগ অব্ নেশ্যন্‌স্ সংগঠন করিয়া আসিলে কংগ্রেস তাহার মেম্বর হইতে অস্বীকার করে, ইহা সুবিদিত ঘটনা। এবার সেরূপ বিভ্রাট হইবে কিনা এবং হইলে কি পরিমাণে হইবে ইহা বর্তমানে সকলের আলোচ্য বিষয়।

পূর্বে দেখা গিয়াছে এরূপ অবস্থায় পরবর্তী নির্বাচনে প্রেসি-ডেণ্টের দল আর প্রেসিডেন্ট পদটি রাখিতে পারেন নাই। এবারে পরবর্তী নির্বাচনে রিপাব্‌লিকান দল প্রেসিডেন্ট পদটিও অধিকার করিবে কিনা ইহা দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। ইহা হইতে তর্কস্থলে আরও দুইটি প্রশ্ন স্বতঃই উপস্থিত হয়। প্রেসি-ডেণ্টের কার্যকালের মধ্যবর্তী কংগ্রেস নির্বাচন উঠাইয়া দেওয়া উচিত কিনা? প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের স্বতন্ত্র নির্বাচনই ভাল, না বিলাতী প্রথামত আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতেই প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রিসভা নির্বাচন ভাল? দ্বিতীয় প্রশ্নটি অবশ্য খুব কমই আলোচিত হয়। কারণ এদেশের লোক স্বতন্ত্র নির্বাচনে এত অভ্যস্ত যে বিলাতী প্রথামত অ-স্বতন্ত্র নির্বাচনের কথা সহসা ভাবিতে পারে না।

আমেরিকার তথা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে আলোচনা উঠিল। ঊর্ধ্বগতি বাণিজ্য-চক্র আর কত দিন ঊর্ধ্বমুখী থাকিবে? কত দিনে ইহার অধোগতি সুরু হইবে? আমেরিকার রিপাব্‌লিকান দলের নীতি এই চক্রগতি রোধ করিতে পারিবে কিনা? এই সব বিষয়ে আলোচনা চলিল। তখন মূল্যশাসন সবে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। উঠাইয়া লইবার অব্যবহিত পরে মূল্য খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু যে সব দ্রব্য মূল্যশাসনের ফলে বাজার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল সে সব দ্রব্য আবার দেখা দিল; উৎপাদন বাড়িয়া গেল; ফলে দাম আবার কমিয়া গেল।

রিপাব্লিকান দল বৃহৎ বাণিজ্য-স্বার্থের প্রতিনিধি। তাহারা মূল্যশাসন বা প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের "নিউডিল" বা 'নতুন কারবার' পছন্দ করেন না। তাঁহারা অবাধ উৎপাদনের পক্ষপাতী। মূল্যশাসন উঠাইয়া লওয়াতে মূল্য হ্রাস পাওয়ায় জনসাধারণ ইহা পছন্দ করিতেছে। তবে এ মূল্য-হ্রাস কি বাণিজ্য-চক্রের নিম্ন আবর্ত্তন সূচনা করিতেছে? অনেকে মনে করেন যে জিনিষপত্রের এত চড়া দাম থাকিতে পারে না। কারণ এত দামে যথেষ্ট ক্রেতা জুটিবে না। কাজেই মূল্য-হ্রাস অনিবার্য। তবে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হইলে মূল্য-হ্রাসও দ্রুত হইবে। ফলে বহু ব্যবসা গুটাইতে হইবে। তাহার ফল সুদূরপ্রসারী হইতে পারে। কিন্তু ১৯২৯ সালে যেরূপ প্রত্যেকেই দায়িক ছিল, এবার সেরূপ নাই। কেহ কাহারও কাছে বিশেষ ধারে না। কিস্তিবন্দীতে কারবারও বিশেষ নাই। দেশের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যেও অধিকতর সহযোগিতা ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান। কাজেই একজনের বিফলতা বা বিপদ অন্য লোকের উপর সংক্রমিত হইবার সুযোগ কম। শৃঙ্খলার সহিত মূল্য স্তরে স্তরে নামাইয়া আনিবার সুযোগ ও সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর এই মূল্যাবতরণের সঙ্গে সঙ্গে যদি যথেষ্ট পরিমাণে যন্ত্রশক্তির উন্নতির দ্বারা উৎপাদন-ব্যয় কমাইতে পারা যায় তবে তো মূল্য-হ্রাস সত্ত্বেও ব্যবসায়ে বিফলতার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা আমেরিকার বাহিরের লোক কিন্তু ভীত হইয়া পড়িতেছি। এখন পৃথিবীর বাণিজ্যের উপর

আমেরিকার বিশেষ প্রভাব। আমেরিকার বাণিজ্যচক্র যখন নিম্নমুখে আবর্তিত হইবে, তাহার বেগ ধনী আমেরিকা সামলাইতে পারিলেও আমরা পারিব না। ইংলণ্ডের মুদ্রানীতি ও বাণিজ্যনীতিতে এই ভয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

ইংলণ্ডের কথা উঠিতেই দেখিলাম যে ইহাদের প্রায় সকলেরই মতে ইংলণ্ডের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় তাহার আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব। যন্ত্রশক্তিতে পিছাইয়া পড়িলে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ে না। তখন সকলের ভাগই কমিয়া যায়। ভাগ লইয়া টানাটানি আরম্ভ হয়। সমস্ত সমস্যার সমাধানই দুরূহ হইয়া পড়ে। বহু বিষয়ে আলোচনা চলিল। সমস্ত বিতর্কে সোৎসাহে যোগদান করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম।

আমেরিকান অতিথিগণকে ভারতীয় খাদ্যে পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে ঐ দিন শ্রীযুক্তা মহলানবিশ-গৃহিণী স্বয়ং রান্না করিয়াছিলেন। পোলাও, ডাল, কপির ডালনা, মাংস, চাটনী ও ছানার পায়স আমেরিকান ভদ্রলোকগণ পরম পরিতোষের সহিত আহার করিলেন। বহুদিন পরে সুপক্ক স্বদেশী খাদ্য পাইয়া প্রচুর আহার করিয়া ফেলিলাম। আহারান্তে ডেমিং ও তাহার বালিকা-কন্যা গান গাহিয়া অতিথিগণকে আপ্যায়িত করিলেন। পিয়ানো বাজাইলেন অতিথিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ যুবকটি। ইনি গণিতে পারদর্শী। যুদ্ধের সময় যুদ্ধ-জাহাজের নব-নব ডিজাইন সৃষ্টির জন্য বহু দুরূহ অঙ্ক দ্রুত

কষিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। রাত্রি প্রায় বারটায় হোটেলে ফিরিলাম।

পরদিন রবিবার। দিনটা ভাল না। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমি যে হোটেলে ছিলাম তাহার নাম শোরহ্যাম্ হোটেল। তখন ঐ হোটেলে দশ-বার জন ভারতীয় ছিলেন। তাহার মধ্যে প্রায় সকলেই ফুড ও এগ্রিকালচারাল্ অরগানাইজেশানে ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর সভ্য। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অংশীভূত এই প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীর খাদ্য-সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট। সমস্ত জাতির প্রতিনিধিগণ ওয়াশিংটনে মিলিত হইয়াছেন। প্রায়ই ইহাদের সভা হইতেছে। ভারতীয় দলের নেতা সু-প্রসিদ্ধ আইনজীবী ও কংগ্রেস-নেতা ডাক্তার কাটজু। ইহাদের সেক্রেটারী আজিজ আমেদ। অন্যান্য মেম্বর—রামমূর্তি (মাদ্রাজের চীফ্ সেক্রেটারী), গোরওয়ালা (বম্বের ফাইনান্স সেক্রেটারী), ভকিল, রাও (যথাক্রমে বোম্বাই ও দিল্লীর ইকনমিক্সের অধ্যাপক), রাধাকমল মুখার্জি ও রাধাকুমুদ মুখার্জি। ভাবিয়াছিলাম ছুটির দিনটা ইহাদের কাহারও সঙ্গে ঘুরিব। কিন্তু এরূপ দুর্দিনে তাহা সম্ভব হইল না। সকালটা হোটেলেই কাটাইলাম।

বিরাট সুসজ্জিত হোটেল। কোথাও কোন বিষয়ে ত্রুটি নাই। সর্বত্রই প্রাচুর্য, শোভা ও সুবন্দোবস্ত। শয়নকক্ষ ও স্নানাগার পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত। নীচে প্রশস্ত ও সুসজ্জিত লাউঞ্জটি প্রফুল্ল নরনারী সমাগমে সর্বদা আনন্দময়। পিছনে

নাতিবৃহৎ উদ্যান। তাহাতে পায়চারি করার ও বসিবার বন্দোবস্ত আছে। সমস্ত হোটেলটিকে ইচ্ছানুরূপ উত্তপ্ত রাখিবার জন্য কেন্দ্রীয় উত্তাপ-ব্যবস্থা আছে। বাইরে যত শীতই হউক না কেন ভিতরে সর্বদা ৭০° হইতে ৭৫° ডিগ্রি তাপ রাখা হয়। ফলে নিদারুণ শীতেও হোটেলের মধ্যে সামান্য একটা কম্বল গায়ে দিয়া ঘুমান যায়। খাবার ঘর তিনটি। প্রত্যেকটির মূল্য-তালিকা পৃথক। খাদ্য যেরূপ রকমারি সেইরূপ প্রচুর। কোন জিনিষেরই অভাব বা অপ্রতুলতা নাই। ফল ও দুগ্ধের স্বাদুতা ও প্রাচুর্য অতুলনীয়। প্রাতরাশে ইহারা প্রথমেই ফল খায়। আট আউন্স এক গ্লাস সুস্বাদু ও স্বচ্ছ আনারসের রস পান করিলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। এরূপ কমলা, পেঁপে, বাতাবি লেবু, সববতী লেবু ও অন্যান্য ফলের রসও প্রচুর। কেহ কেহ নির্গলিত রস পান না করিয়া ফল চিবাইয়া খান। বাতাবিটাই ইহাদের বেশী প্রিয় দেখিতেছি। কেহ সুমিষ্ট কদলী চাক্ চাক্ করিয়া কাটিয়া ঘন দুধ ও চিনি সহযোগে খাইতেছেন। মধ্যাহ্ন ভোজনে বা নৈশ ভোজনেও অনেকে ফল খান। সে সময় দেখিতেছি খরমুজটাই বেশী চলিতেছে। ডিম, মাছ, মাংস, তরকারি সবই যথেচ্ছ খাওয়ার কোন বাধা নাই। আমার সুপরিচিত মাছের মধ্যে এদেশে শুধু চিংড়ি মাছই দেখিতেছি। গলদা চিংড়ি ইহারা অনেকটা মালাইকারীর মতই রান্না করে। তবে মাথাটা কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। ছোট চিংড়ি সিদ্ধ না করিয়া বরফের মধ্যে ভিনিগার-

সংযোগে ফেলিয়া দেয়। খাইতে মন্দ লাগে না। স্যামন্ মাছের সালাদও ভাল খাইয়াছি। আইসক্রীম খুব সুস্বাদু। কাঁচা ছানাও দেখিতেছি এদের বেশ প্রিয়। এক প্লেট কাঁচা ছানা, আনারস, আপেল, কমলা, চেরী প্রভৃতি নানাবিধ সুমিষ্ট ফল সহযোগে খাইতে বেশ লাগে। প্রাতরাশে ফলের পর চাউল বা গমের একটি খাদ্য চলে। এ পদেও বহু রকমারি। কেহ মুড়ি, কেহ কর্ণফ্লেক, কেহ বা পরিজ ইত্যাদি দুধ ও চিনি সংযোগে খাইতেছে। বড় বড় হোটেলে যখন এক ঠোঙ্গা মুড়ি দিয়াছে তখন প্রথম আশ্চর্যই হইয়াছি। ভুট্টার খইও এদেশে খুব প্রিয়। শিকাগোর রাস্তার দুই ধারে খই ভাজিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এখানে খুব বেশি। একটি গলদা চিংড়ি তিন ডলার বা দশ টাকা। এক প্লেট হরিণের মাংস চার ডলার বা তের টাকা সওয়া পাঁচ আনা। ফল বরং সস্তা। এক গ্লাস আনারস বা আপেলের রস কুড়ি-পঁচিশ সেণ্ট বা দশ বার আনা। ঐরূপ এক গ্লাস ফলের রস আমাদের দেশে ঐ দামে এখন পাওয়া যায় না। পঁচিশ সেণ্টে চারটি বড় বড় সুস্বাদু কলা এবং দশ বার সেণ্টে একটি আপেল কিনিয়াছি। আপেলগুলি খুব বড় এবং সুমিষ্ট, মুখে দিলে গলিয়া যায়। কেলিফোর্ণিয়ার খেজুরও খুব সুস্বাদু এবং দামও খুব বেশী নয়। ওয়াশিংটনে দৈনিক ছয় ডলার বা কুড়ি টাকা ঘর-ভাড়া দিয়াছি। শিকাগোতে ঘর-ভাড়া ছিল আরো বেশি। খাবার

খরচ দৈনিক প্রায় আট ডলার বা প্রায় সাতাইশ টাকা পড়িয়াছে। লণ্ডনের প্রায় তিন গুণ খরচ আমেরিকায়। ওয়াশিংটন হইতে শিকাগো বা নিউ ইয়র্কে খরচ আরও বেশি।

এদেশে হোটেল ভিন্ন আরও দুই প্রকারের ভোজনালয় আছে। কেফিটেরিয়া ও ড্রাগ্ ষ্টোব বা ঔষধ ভাণ্ডার। কেফিটেরিয়ার গৃহ প্রান্তে লম্বা মঞ্চের উপর সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সাজান থাকে। প্রথমে থাকে বারকোশ, কাঁটা চামচ প্রভৃতি ও কাগজের সাভিয়েৎ বা কাপড়-ঢাক্নি। ঢুকিয়া একটি বারকোশ ও প্রয়োজন মত কাঁটা চামচ ও সাভিয়েৎ লইয়া মঞ্চের পাশ ধরিযা অগ্রসর হইলাম। যাইতে যাইতে আমাব ইচ্ছামত খাদ্য বাছিয়া বারকোষে রাখিলাম। মঞ্চেব শেষে একটি লোক বাক্স লইয়া বসিয়া আছে। সে বারকোষ দেখিয়া মূল্য বলিয়া দিল। তাহাকে মূল্য দিয়া বারকোষ লইয়া সামনে চলিয়া আসিলাম। সেখানে টেবিল চেয়ার পাতা রহিয়াছে। ইচ্ছামত সেখানে বসিয়া খাইযা চলিয়া গেলাম। এখানে বেশ দ্রুত খাওয়া শেষ করা যায় এবং দামও হোটেল অপেক্ষা কম। নিউ ইয়র্কে কেফিটেরিয়ার এক প্রকার যান্ত্রিক সংস্করণ আছে। নাম "অটোমেটন" বা "স্বয়ংক্রিয়"। সেখানে অধিকাংশ খাদ্যই যন্ত্রেব মধ্যে থাকে। সামনে নাম ও দাম লেখা আছে। কোনটা পাঁচ সেণ্ট, কোনটা দশ সেণ্ট, কোনটা পঁচিশ সেণ্ট। যন্ত্রটির সামনে গিয়া নির্দিষ্ট ছিদ্রে দামটি ফেলিয়া দিলেই এক প্লেট খাবার আপনা হইতেই বাহির

হইয়া আসে। চা বা কফির যন্ত্রের সামনে বাটি সাজান থাকে। দাম ফেলিয়া দিলেই যন্ত্রের সম্মুখের মুখ দিয়া চা বা কফি পড়িতে সুরু করে। বাটি পাতিয়া ধরিয়া নিতে হয়। বাটি ভরিলেই আবার মুখ বন্ধ হইয়া যায়।

ড্রাগ ষ্টোরগুলিতে খাদ্য আরও সস্তা, সেখানে একটি মঞ্চের উপর বসিয়া লম্বা টেবিলে খাইতে হয়। অল্প দামে মোটামুটি খাইবার পক্ষে এগুলি বেশ।

হোটেলে বক্‌শিশ দিবার প্রথা আছে। খাদ্যমূল্যের অতন্তঃ দশমাংশ বক্‌শিশ দেওয়া রীতিসম্মত। কেফিটেরিয়া বা ড্রাগ ষ্টোরে এ প্রথা নাই।

সারাদিন হোটেলে থাকিয়া বৈকালে শ্রীযুত রামমূর্তি ও ভকিল মহাশয়ের সঙ্গে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী দেখিতে গেলাম। সুবিশাল সুরম্য প্রাসাদে সুসজ্জিত ছবির মালা। প্রাসাদটি আর্ট গ্যালারীরই উপযুক্ত। গঠনভঙ্গীতে দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য যুগপৎ অভিব্যক্ত। দোতলার মধ্যস্থলে কৃষ্ণমর্মরের বিরাট স্তম্ভমালা পরিবেষ্টিত জলের ফোয়ারা। দুদিকে ঘরের পর ঘর ছবিতে সাজান। য়ুরোপীয় শিল্পিগণের ছবিই বেশি। যে সব জগদ্বিখ্যাত ছবি লণ্ডনে দেখিয়াছি তাহাদের অনেকগুলি এখানেও দেখিলাম। কোন্‌টি আসল কোন্‌টি নকল জানি না। আমেরিকান শিল্পিগণের অঙ্কিত জর্জ ওয়াশিংটন ও তাঁহার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনেক ছবি দেখিলাম।

পরদিন ১৮ই নভেম্বর সোমবার। ব্যুরো অব্‌ দি সেন্সাসে

গেলাম। আপিসটি মেরিল্যাণ্ড রাষ্ট্রের অন্তর্গত স্যুট্‌ল্যাণ্ড নামক স্থানে, ওয়াশিংটন হইতে দশ-বার মাইল দূরে। যাইবার রাস্তা যেমন সুনির্মিত তেমনি সুশোভন। পথে নগর-প্রান্তে বস্তি অঞ্চল দেখিলাম। বস্তির বাড়ীগুলি সুন্দর পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জিত। আমাদের দেশের অবস্থাপন্ন লোকদের ফ্লাট অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে হইল না। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়া রাস্তা চলিয়াছে। লোকের ভিড় বেশি নাই।

সেন্সাস আপিসে সেদিন শ্রীযুত মহলানবিশ মহাশয়ের বক্তৃতা হইতেছিল। আপিসের ডিরেক্টর হইতে প্রায় সমস্ত কর্মচারী আগ্রহ সহকারে বক্তৃতা শুনিলেন। পরে তাঁহারা নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন এবং মহলানবিশ মহাশয় তাহার জবাব দিলেন। আপিস-সংলগ্ন একটি কেফিটেরিয়া আছে। ঐখানে আপিসের প্রধানগণের সহিত মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিলাম। প্রধানগণ হইতে কেরাণী ও বেহারাগণ পর্যন্ত সকলেই একই লাইনে দাঁড়াইয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া একই ঘরে পাশাপাশি বসিয়া খায়। তাহাতে কোন মর্যাদা অমর্যাদার প্রশ্নই উঠে না। এ যেন খুব সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। বৈকালে মহলানবিশ মহাশয়ের সঙ্গে থাকিয়া এদের সমস্ত কার্য দেখিলাম। এরা আপিসের কাজে বহু প্রকারের যন্ত্র ব্যবহার করে। একটি প্রকাণ্ড লম্বা ঘরে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত শত শত যন্ত্র দেখিয়া মহলানবিশ মহাশয়ও আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

পর দিন মহলানবিশ মহাশয়ের সঙ্গে ব্যুরো অব

এগ্রিকালচারে গেলাম। সেখানেও তিনি বক্তৃতা করিলেন এবং বক্তৃতান্তে সকলের প্রশ্নের জবাব দিলেন। বৈকালে "আর-কাইভ হলে" শ্রীযুত মহলানবিশের সংখ্যাতত্ব-বিষয়ক একটি বক্তৃতা হইল। এটি তাঁহার ঐ বিষয়ের তৃতীয় বক্তৃতা। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিতে ঘরটি পূর্ণ।

মহলানবিশ মহাশয় "নমুনা জরীপ" বিষয়ে গবেষণা করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। বহু বস্তুর পরিমাণ বা গুণ নির্ণয় করিতে হইলে সমস্ত জিনিষ পরীক্ষা না করিয়া বিশেষ রূপে নির্বাচিত কয়েকটি নমুনার পরীক্ষা দ্বারাই কাজ চলিতে পারে। দেশে এবার কত জমিতে পাট বোনা হইয়াছে ইহা নিণয়ের জন্য সমস্ত পাটের জমি না মাপিয়া কয়েকটি জমি নমুনাস্বরূপ দেখিলেই চলিবে। সম্পূর্ণ জরীপ ব্যয়সাধ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে অসাধ্য। নমুনা জরীপ সুলভ ও সুকর। অধ্যাপক-মহাশয়ের মতে নমুনা জরীপ অপেক্ষা সম্পূর্ণ জরীপ অধিকতর ভ্রমাত্মকও বটে; কারণ সম্পূর্ণ জরীপে বহুসংখ্যক এবং বহু রকমের লোকের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিতে হয়, অথচ তাহাদের রিপোর্টের সত্যতা নির্ণয়ের কোন বৈজ্ঞানিক উপায় নাই। নমুনা জরীপে অল্প লোকের প্রয়োজন, সুতরাং তাহাদের পটুতা ও সাধুতা সাধারণতঃ উচ্চতর হয় এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহাদের রিপোর্টের সত্যতা নির্ণয়ও সম্ভব। নমুনা জরীপের দ্বারা সরকারের বহু কার্য সুগম হইতেছে। আমেরিকায় ইহার ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশি; নমুনা জরীপে

ইহারা বৎসরে কোটি কোটি ডলার খরচ করিতেছে। যদিও ইহারা সম্পূর্ণ জরীপের দ্বারা দশ বৎসর অন্তর সেন্সাস বা লোকগণনা করে, তথাপি প্রতি বৎসর নমুনা জরীপের দ্বারা নূতন করিয়া লোকসংখ্যা নির্ণয় করে। ফসলের পরিমাণ নির্ণয়েও ইহারা নমুনা জরীপের বহুল ব্যবহার করে। স্বতঃই ইহারা নমুনা জরীপের অন্যতম প্রবর্তক মহলানবিশ মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে বিশেষ উৎসুক। অধ্যাপকবরের প্রতিষ্ঠা এবং ইহাদের জানিবার ও আরও ভাল করিয়া কাজ করিবাব আগ্রহ দেখিয়া বিশেষ আনন্দবোধ করিলাম। ঐ সময় মহলানবিশ মহাশয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের "ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল কমিশনের" নমুনা জরীপ সাব্‌কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯শে নবেম্বর মঙ্গলবারের পব তিনি ওয়াশিংটন ত্যাগ কবেন।

২০শে নবেম্বর বুধবাব বাজেট ব্যুরোতে গিয়া তত্রত্য কর্মচারিগণের সহিত পরিচিত হইলাম। এখানে সি, আর, রোজেন নামক বাজেট ব্যুরোর জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমাব কাজের সর্ববিষয়ে সহায়তা করেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং সাহায্যপরায়ণতার জন্য আমার আমেবিকার কাজ সুসম্পন্ন হয়। বাজেট ব্যুরোতেই আমি আমাব মূল কর্মস্থল স্থাপন করিলাম।

দক্ষিণ আমেরিকা ও চীনেব কয়েকজন সরকারী কর্মচারী আমেরিকার বাজেট নির্মাণ প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য তখন বাজেট ব্যুরোতে কাজ করিতেছিলেন। এই শিক্ষা সমাপ্ত

করিতে তাঁহাদের দুই বৎসর লাগিবে। কেহ বৎসরাধিক এখানে আছেন। তাঁহারা সকলেই সরসচিত্ত যুবক। উরুগয়ার আর, জে, বারু, পরাগয়ার ফ্লোরেন্টিন, কিউবার রোডল্‌ফো ভিয়েগাস্‌, পানামার এদুয়ার্দো ম্যাক্‌কালা, মেক্সিকোর এদুয়ার্দো বোটাস্‌ এবং চীনের লিয়েন ইহো—ইহারা সকলেই সদালাপী। দক্ষিণ-আমেরিকার ভদ্রলোকগণের মাতৃভাষা স্প্যানিশ অথবা পর্তুগীজ। সকলেই ইংরেজি জানেন, তবে কথা খুব স্পষ্ট বা দ্রুত নয়। চীনা যুবকটি সর্বদা কর্মগতচিত্ত। ট্রেজারীর কর্মচারিগণ পরে এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে এই চীনা যুবকটি তাঁহাদের একাউন্টের নিময়গুলি তাহাদের অপেক্ষাও ভাল আয়ত্ত করিয়াছেন। এক দিন ইঁহাদের সহিত একটি কিউবান ভোজনালয়ে সমাংস পোলাও-সংযোগে মধ্যাহ্নভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। ভিয়েগাসের সঙ্গে আরও দু-একদিন মধ্যাহ্নভোজন করিয়াছি। দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলির রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও শিল্পাদি বিষয়ে অসহায়তার কথা ইহারা দুঃখের সহিত বিবৃত করিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রতি ইহাদের সহজ সমবেদনা আছে এবং ভারতবর্ষের কথা শুনিতে ইহাদের খুব আগ্রহ। আমার ওয়াশিংটন অবস্থান কালে নিউইয়র্কে সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের সভায় দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দলনের বিরুদ্ধে ভারত-সরকারের অভিযোগ আলোচনার্থ উপস্থিত হয়। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এই অভিযোগ সভায় উত্থাপিত করেন।

জেনারেল স্মাটস্ স্বয়ং এই অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য উপস্থিত হন। ইংরেজ সরকার ও মার্কিন সবকার দক্ষিণ-আফ্রিকার পক্ষে ভোট দেন। তৎসত্ত্বেও দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে ভারতবর্ষের জয়লাভে বিশ্ব বিস্মিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-আমেরিকাব সমস্ত রাষ্ট্র তখন ভারত-সরকারের অনুকূলে ভোট দেন। খবরের কাগজওয়ালারা লিখিল, বর্তমানে জাতিপুঞ্জের সভায় অশ্বেত জাতিগণের একটি জোট হইযাছে বলিয়া মনে হয়।

পরে শিকাগোতে ব্রেজিলের একটি সরকাবী কর্মচারীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। ইনিও যুবক এবং এ দেশের বাজেট তৈরির কাজ শিখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষ, চীন এবং ব্রেজিলেব ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। ভবিষ্যতের পৃথিবী ইহাদেরই।

এদেশের দৈনিক খবরের কাগজ দেখিয়া আশ্চয হইয়াছি। সব শহরেই খবরের কাগজ আছে। বড় শহবে একাধিক কাগজ প্রকাশিত হয়। নিউইয়র্ক টাইম্‌সই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাব পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দিষ্ট নহে। যেদিন যেরূপ ছাপাইবাব উপযুক্ত খবর থাকে সেই অনুসারে পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়ে বা কমে। আমি ৪৮ পৃষ্ঠার কম কখনও দেখি নাই। বহুদিনই ৬৪ পৃষ্ঠা দেখিয়াছি। রবিবারে ২৫০ পৃষ্ঠা দেখিয়াছি। একখানা ২৫০ পৃষ্ঠার খবরের কাগজ আমাদের বিস্ময়কব ত বটেই, নাড়াচাড়া করাও কষ্টকর। আমাদের দেশের ষ্টেটস্‌ম্যান বা

আনন্দবাজার পত্রিকা সাধারণতঃ আট-দশ পৃষ্ঠা মাত্র থাকে। বিলাতের কাগজেও তাহার বেশি থাকে না। লণ্ডন টাইম্‌স্‌ ব্যতীত অন্যান্য কাগজের আয়তন তো আরও কম। আমেরিকার খবরের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় খবর থাকে, লণ্ডন টাইমসে প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন থাকে। এ বিষয়ে আমাদের দেশের কাগজগুলি পূর্বে বিলিতি প্রথা অনুসরণ করিত, এখন আমেরিকান প্রথা অনুসরণ করে। পৃথিবীর সব দেশের খবরই নিউইয়র্ক টাইম্‌সে থাকে। ভারতবর্ষের খবর যথেষ্ট থাকে। ডিসেম্বরের প্রথম একটি রবিবাসরীয় সংখ্যায় নেহেরু ও জিন্নার বড় বড় ছবি দিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। প্রবন্ধকারের মতে জিন্না নিপুণ উকিলের ন্যায় স্ব-মতে অটল, আর নেহেরু সর্বদাই পরমতের সহিত নিজমতের সামঞ্জস্য বিধানে প্রস্তুত, সর্বদা নূতন সত্যে উপনীত হইবার জন্য উৎসুক। প্রবন্ধটিতে নেতৃদ্বয়ের বিপরীত-গুণ-মূলক মহত্ত্ব বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহাদের প্রকাশিত ভারতবর্ষের খবরে কোন ভুল দেখি নাই। সাগ্রহে স্বদেশের খবর পাঠ করিতাম। হিন্দু-মুসলমানে থাকিয়া থাকিয়া দাঙ্গা চলিতেছে। কন্‌ষ্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেম্‌ব্লি আরম্ভ হইল। আমেরিকা-সরকার সরকারীভাবে ইহার কার্যের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করিলেন। নেহেরু, জিন্না ও বলদেব সিং সহ লর্ড ওয়াভেল লণ্ডন যাত্রা করিলেন। সেখানে বিলাতি

মন্ত্রিসভার সহিত তাঁহাদের আলোচনা ব্যর্থ হইল। মন্ত্রি-মিশনের প্রস্তাবের যে অংশের অর্থ লইয়া মতবিরোধ চলিতে-ছিল, বিলাতি মন্ত্রিসভা ৬ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার নিজস্ব ভাষ্য প্রচার করিলেন। পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সে ভাষ্য স্বীকার করিয়া লইলেন। শরৎ বসু ও জয়প্রকাশনারায়ণ ব্রিটিশের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ করিলেন। ভারত-সরকার ও আমেরিকা-সরকার দূতবিনিময়ে স্বীকৃত হইলেন। আসফ আলি ওয়াশিং-টনের ভারতীয় দূত নিযুক্ত হইলেন। নেহেরু বড়লাটের বদলে এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব্ কমার্সের কলিকাতাস্থ বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা করিয়া স্বাধীন ভারতে ইংরেজ ব্যবসাদার-গণকে অভয় দিলেন। তাঁহাদিগকে সাম্রাজ্যবাদী মতবাদ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতে গিয়া বলিলেন যে, এমন যে খ্রীষ্টধর্ম তাহাও সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সম্পর্কে আসিয়া এক সময়ে লোকের আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। মন্ত্রিমিশনের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাব কি সত্যই সাধুতা-প্রসূত, না উহা ইংরেজের পুরাতন কপট-লীলার একটি নূতন প্রকাশ মাত্র, ইহা তখন ভারতবর্ষে খুব আলোচিত হইতেছে। এই সব খবর সাগ্রহে খুঁজিয়া দেখিতাম।

এখানকার বাসে কণ্ডাক্টর নাই, টিকিট নাই, ভাড়ার তারতম্য নাই। এক দিকে যত দূরই যাই না কেন ভাড়া দশ সেণ্ট। ঐ ভাড়ায় একবার বাস বদলানও চলে। প্রবেশ-

দ্বারের পাশে একটি বাক্স আছে। তার উপরে একটি ছোট ছিদ্র। যাত্রিগণ বাসে উঠিয়াই ঐ বাক্সের মধ্যে একটি পাঁচ সেণ্ট মুদ্রা ফেলিয়া দেয়। আমি প্রথম দিন বাসে উঠিয়া নিয়ম না জানায় বাক্সে মুদ্রা না ফেলিয়াই বসিয়া পড়িলাম। কোন কণ্ডাক্টর দেখি না। কেহ ভাড়া চায় না। নামিবার সময় ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাক্সে পয়সা ফেলিয়া নামিলাম। সাধারণ লোকের এই সাধুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম আমাদের দেশে এইরূপ হইলে বাস কোম্পানী তুদিনেই ফেল পড়িত। যাহাদের বাস বদলাইবার দরকার তাহারা ড্রাইভারের নিকট হইতে একখানি টিকিট চাহিয়া লয়। উহা পরবর্তী বাসের ড্রাইভারকে দিয়া দিতে হয়। এই ব্যবস্থায় ইহাদের বাস চালাইবার খরচ কম পড়ে।

যে টাকাটা বাঁচিল তাহা দ্বারা ড্রাইভারকে বেশি মাহিনা দিতে পারে অথবা বাসের ভাড়া হ্রাস করিতে পারে। সামান্য সাধুতার দ্বারা কিরূপে কম শ্রমে কাজ হয়, লোকের আয় বাড়ে ও খরচ কমে ইহা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সেদিন রাত্রে ডাক্তার কাট্‌জুর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হইল। তাঁহার ছেলে এদেশে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। পুত্রের অনুরোধে পিতা তাহার বাল্যকালের একটি সহপাঠিনীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি এখন বিবাহিতা। স্বামী লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কাট্‌জু মহাশয় তাঁহাদের সঙ্গে তু-এক দিন বাস করিয়া

তাঁহাদের যত্নে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন। কাট্‌জু মহাশয় উৎসাহের সহিত ইঁহাদের সুখ্যাতি করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমরা দূর হইতে শুনি আমেরিকানরা শুধু ডলার এবং যন্ত্রের পূজারী এবং ইঁহাদের পারিবারিক জীবন মোটেই সুখের নয়। কিন্তু একথা মিথ্যা। ইহাদের সুমধুর পারিবারিক জীবন এবং আতিথেয়তা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। ইঁহাদের জ্ঞানস্পৃহাও অসাধারণ। ইহাদের লাইব্রেরিতে ভারতীয় আইনের যত বই দেখিয়াছি তত বই ভারতবর্ষের কোন লাইব্রেরিতেও দেখি নাই।"

২৩শে নবেম্বর* শনিবার সকালে শ্রীযুত ভকিল ও মুখুজ্জে মহাশয়ের সঙ্গে ক্যাপিটল ও হোয়াইট হাউসে গেলাম। হোয়াইট হাউস প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবন। সেদিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ওখানে ছিলেন না। দর্শনপ্রার্থীর বেশ ভিড়। নীচের তলায় একটি ঘরে রুজভেল্টের ছেলেমেয়েদের খেলনা দেখিলাম। দোতলায় পূবের হলঘরে পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টগণের বড় বড় ছবি দেয়ালে ঝুলিতেছে। মধ্যস্থলে বড় একটি আলোর ঝাড়। এটি অভ্যর্থনা-গৃহ। ইহার পশ্চিমে পর পর তিনটি সুসজ্জিত খাবার-ঘর। আরও কয়েকটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ দেখিলাম। তিন তলায় দর্শকগণের প্রবেশাধিকার নাই। সেখানে প্রেসিডেন্টের শয়নকক্ষ ও বৈঠকখানা প্রভৃতি। কলিকাতা বা দিল্লীর গবর্ণমেণ্ট হাউসের তুলনায় হোয়াইট

* ৭ই অগ্রহায়ণ।

হাউস অনেক ছোট। আর সারি দিয়া লোক গবর্ণমেন্ট হাউসে ঘুরিয়া আসিবে একথা ভারতবর্ষে অচিন্তনীয়।

ক্যাপিটলের সু-উচ্চ বৃহৎ গম্বুজটি বহু দূর হইতে দেখা যায়। এই গম্বুজের উপরে একটি বাতি জ্বলে। ভিতরে অনেকগুলি ঘর। একটিতে হাউস অব্ রিপ্রেজেণ্টেটিভস্-এর এবং অন্য একটিতে সেনেটের অধিবেশন হয়। ঢুকিতেই গম্বুজের নীচের হলঘরে বহু ছবি টাঙান দেখা যায়। এই ছবিগুলি এ দেশের ইতিহাসের বিশিষ্ট ঘটনাবলী লইয়া অঙ্কিত। ইহাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের শেষে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কর্ণওয়ালিস যেদিন জর্জ্জ ওয়াশিংটনের নিকট আত্মসমর্পণ করেন সেদিন ইহাদের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই আত্মসমর্পণের একটি খুব বড় ছবি এই ঘরে আছে। এই ঘরের পাশে একটি ছোট ঘর। সেখানে পূর্বে সুপ্রীম কোর্ট বসিত। সেনেটের ৯৬ জন সভ্য। ছোটবড় নির্বিশেষে প্রত্যেক রাষ্ট্রের দুই জন প্রতিনিধি লইয়া সেনেট গঠিত। হাউস অব্ রিপ্রেজেণ্টেটিভস্-এ জনসংখ্যা অনুপাতে সভ্য নির্বাচিত হয়। সভ্যসংখ্যা অনেক বেশি, ঘরটিও বড়। এই ঘরে যুদ্ধের সময় চার্চ্চিল সেনেট ও হাউসের সভ্যগণকে একত্রে তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিয়াছিলেন। দোতলার একটি বড় হলঘরে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মর্মরমূর্তি আছে। কোন্ রাষ্ট্রের কাহার মূর্তি থাকিবে তাহা সেই রাষ্ট্রই স্থির করিয়াছে। এই ঘরের গঠনকৌশল এইরূপ যে মধ্যস্থলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইলে

ঘরের যে-কোন স্থান হইতে খুব ছোট শব্দও পরিষ্কার শোনা যায়। মেজেতে একখানি নির্দিষ্ট পাথরে দাঁড়াইলে নাকি মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এই ক্যাপিটল ভবন সমগ্র দেশের ঐক্যের প্রতীক এবং জাতীয় মর্যাদা-বোধের দ্যোতক।

পরদিন রবিবার প্রাতরাশ সমাপন করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পরিষ্কার আকাশ। বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। সোজা ওয়াশিংটন মনুমেণ্টে গেলাম। আধ ঘণ্টা পর পর লিফট দর্শকগণকে লইয়া মনুমেণ্টের শীর্ষে উঠিতেছে আবার আধ ঘণ্টা পরে নামাইয়া আনিতেছে। এই স্তম্ভটি জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জয়ধ্বজার মত আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্তম্ভটির উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্য পরম রমণীয়। পশ্চিমে লিঙ্কন মেমোরিয়াল। দক্ষিণে জেফারসন মেমোরিয়াল। পূর্বে ক্যাপিটল ভবন। উত্তরে হোয়াইট হাউস। সমস্ত শহরটি সরল এবং সমান্তরাল রাজপথশ্রেণীদ্বারা সমভাবে বিভক্ত হইয়া সুবিন্যস্ত উদ্যানের মত শোভমান। পশ্চিমে পটোম্যাক্ নদী উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। পরপারে দূরে পর্বতশ্রেণী। শহরটি সত্যই মনোরম।

লিঙ্কন মেমোরিয়ালে মর্মরগৃহে লিঙ্কনের মর্মরমূর্তি রক্ষিত আছে। চতুষ্কোণ উচ্চ ভবন। সামনে স্থূল স্তম্ভের সারি। উচ্চ সোপানশ্রেণী বাহিয়া গৃহে উঠিতে হয়। গৃহমধ্যে উচ্চ মঞ্চোপরি মর্মরনির্মিত চেয়ারে পূর্ণাবয়ব লিঙ্কন উপবিষ্ট। উপর দিক হইতে মুখের উপর বৈদ্যুতিক আলো আসিয়া পড়িয়াছে।

মূর্তিটি যেন জীবন্ত। পার্শ্ব-লিখিত কথা কয়েকটির অনুবাদ এইরূপঃ "যে জনগণের জন্য এব্রাহাম লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্রকে বাঁচাইয়াছিলেন, তাহাদের মনোমন্দিরের মত এই মন্দিরেও তাঁহার স্মৃতি চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হইল।" চারিদিকের দেওয়ালে লিঙ্কনের গেটিস্‌বার্গ বক্তৃতার অংশ উৎকীর্ণ। জগতে জনগণের স্বার্থে জনগণ কর্তৃক জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সমস্ত বীর আমেরিকার গৃহযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন, এই বক্তৃতায় লিঙ্কন তাঁহাদের প্রতি তাঁহার সহজ ওজস্বিনী ভাষায় অকপটে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। মেমোরিয়াল গৃহের পূর্ব দিকে রাস্তার পরপারে দীর্ঘ সরোবর ও সবুজ বৃক্ষশ্রেণী ওয়াশিংটন মনুমেণ্ট পর্যন্ত বিস্তৃত।

ওয়াশিংটন মনুমেণ্টের পূর্বে বৃক্ষশ্রেণীশোভিত ম্যাল নামক রাস্তা ক্যাপিটল ভবন পর্যন্ত গিয়াছে। মনুমেণ্টের উপরে হোয়াইট হাউস পর্যন্ত খোলা সবুজ মাঠ। মাঠের পরে বিস্তৃত শহর।

ওয়াশিংটন শহর ক্যাপিটল ভবনকে কেন্দ্র করিয়া চারি ভাগে বিভক্ত। উত্তর-পশ্চিম ভাগই জনবহুল। ঐ দিকেই পটোম্যাক্ নদী পর্যন্ত শহর সম্প্রসারিত হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে, উত্তর-পূর্বে বা দক্ষিণ-পূর্বে শহর মোটেই বাড়ে নাই। ওসব দিকে বসতি কম। প্রত্যেক অংশে রাস্তাগুলি সরল এবং সমান্তরাল। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা রাস্তাগুলির নাম এক, দুই প্রভৃতি পর পর সংখ্যা দ্বারা যথাক্রমে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা রাস্তাগুলির নাম এ, বি, সি, ডি প্রভৃতি বর্ণানুক্রমে রাখা হইয়াছে। যে-কোন দুইটি রাস্তার মধ্যে দূরত্ব সমান। কাজেই শহরটি কতকগুলি সমায়তন আয়তনক্ষেত্রে বিভক্ত। বড় বড় রাষ্ট্রের নামে কয়েকটি এভিনিউ আছে। এগুলি সিধা কোণাকুণি চলিয়াছে। বাড়ীর নম্বরগুলিও বেশ কায়দা করিয়া সাজান। ভারতীয় দূতাবাসের নম্বব ২১০৭ ম্যাসাচুসেট্‌স্ এভিনিউ। অর্থাৎ যেখানে ম্যাসাচুসেট্‌স্ এভিনিউ ২১ নং ষ্ট্রীটকে ছেদ করিয়াছে সেখান হইতে সপ্তম বাড়ীতে এই দূতাবাস। এইরূপ যেখানে এফ ষ্ট্রীট ১৩ নং ষ্ট্রীটকে ছেদ করিয়াছে সেখান হইতে ত্রয়োদশ বাড়ীব নম্বব ১৩১৩ এফ ষ্ট্রীট। এইখানে ওয়াশিংটনের বৃহত্তম বইয়েব দোকান অবস্থিত; নাম ব্রেণ্টানো। আমেরিকার সমস্ত শহরই এইরূপে সাজান। এখানে পথ ভুল করিবার সম্ভাবনা একপ্রকার নাই বলিলেও চলে। বাড়ীর নম্বর শুনিলেই বুঝা যাইবে সে বাড়ী আমি যেখানে আছি সেখান হইতে কতদূরে; কোন্ দিকে এবং কোন্ পথে সেখানে যাইতে হইবে। এখানকার আপিস ও হোটেলের ঘরগুলির নম্বরও অনুরূপ কায়দায় সাজান। সাত তালার পাঁচ নম্বরের ঘরের নম্বর হইবে ৭০৫, ৮ তালার ১১ নম্বরের ঘরের নম্বর হইবে ৮১১, এইরূপ।

ওয়াশিংটন মনুমেণ্ট হইতে উত্তর দিকে তাকাইলে সুসজ্জিত শহরের সুন্দর রূপটি চোখের উপর ভাসিয়া উঠে।

মনুমেণ্টের ঠিক দক্ষিণে জেফারসন মেমোরিয়াল, এদিকে লোকালয় নাই। মনুমেণ্টের পরেই খানিকটা মাঠ। তারপর প্রশস্ত মসৃণ রাস্তা, তারপর স্রোতোবহা সরোবর। তারপর প্রশস্ত গম্বুজযুক্ত শুভ্র মর্মরগৃহে দণ্ডায়মান পূর্ণাবয়ব জেফারসনের মর্মরমূর্তি, তারপরে আবার ছোট একটি মাঠ, আবার একটি প্রশস্ততর রাস্তা, তার পাশ দিয়া প্রবাহমান পটোম্যাক নদী। একটি খাল নদীর সঙ্গে সরোবরকে সংযুক্ত করিয়াছে। সেই খালের উপর সুদৃশ্য সেতু। দৃশ্যটি পরম রমণীয়। জলরাশির স্বচ্ছতা, মর্মরের নিষ্কলুষ শুভ্রতা এবং দূর্বাদলের শ্যামলিমা জেফাবসনের মহিমময়ী স্মৃতিকে ঘিরিয়া উদার নীলাকাশতলে যে অপূর্ব অদ্ভুত রূপ রচনা করিয়াছে তাহার শোভা, সম্ভ্রম এবং পবিত্র গাম্ভীর্য অতুলনীয়। ওয়াশিংটন মনুমেণ্টের উপর হইতে এই দৃশ্য আমার দেহমনকে যুগপৎ আকর্ষণ করিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত উপর হইতে নামিয়া সিধা মেমোরিয়ালে গেলাম। সরোবরের পাড় দিয়া দীর্ঘ মর্মর সোপানশ্রেণী বাহিয়া প্রশস্ত মর্মরগৃহে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে জেফারসনের মর্মরমূর্তি দাঁড়াইয়া। জেফারসন ছিলেন ভার্জিনিয়ার অধিবাসী, তিনিই আমেরিকার স্বাধীনতা-ঘোষণাপত্রের রচয়িতা। ভার্জিনিয়ায় ইঁহার সমাধির উপর প্রস্তরফলকে লিখিত আছে, "আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা-পত্রের রচয়িতা, ভার্জিনিয়ার ধর্মগত স্বাধীনতা আইনের প্রণেতা এবং ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা টমাস জেফারসনকে এই স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল।"

এই স্মারক লিপি তিনি নিজেই রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাব অসংখ্য কার্যের মধ্যে এই তিনটি কাজের জন্যই তিনি বিশেষরূপে পরিচিত হইতে চাহিয়াছিলেন। জেফারসন আমেরিকার স্বাধীনতার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। আর জর্জ ওয়াশিংটন এবং পরে এব্রাহাম লিঙ্কন সে পরিকল্পনার রূপ দিয়াছিলেন। ওয়াশিংটন নগরী আজ আমেবিকার ঐক্যের উৎস, ক্যাপিটল ভবন ও হোয়াইট হাউস ইহাব গৌরবের প্রতীক এবং জাগ্রত প্রহরীস্বরূপ। ওযাশিংটন মনুমেণ্টের উপর দাঁড়াইয়া এক দিকে জেফারসন-স্মৃতিগৃহ, অপব দিকে লিঙ্কন স্মৃতিভবন এবং অপর তুই দিকে ক্যাপিটল ভবন, হোয়াইট হাউস ও ওয়াশিংটন নগরী দর্শনে মন স্বতঃই ভাবে অভিভূত হয়। উপরোক্ত তিন জন মহাপুরুষই ওয়াশিংটন নগরী, ক্যাপিটল ভবন ও হোয়াইট হাউসের সত্যিকাবেব স্থপতি।

যে স্বাধীনতা-ঘোষণাপত্রের রচয়িতা হিসাবে জেফারসন নিজেও গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ—

"স্বভাব এবং স্বভাবের নিয়ন্তা পরমেশ্বরের পরম বিধানে প্রত্যেক জাতি বিশ্বের শক্তিপুঞ্জের মধ্যে পৃথক এবং সমান আসনের অধিকারী। অন্য জাতির সহিত রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ কোন জাতির পক্ষে যখন সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া তদীয় স্বতন্ত্র এবং সমান আসন গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে তখন

বিশ্বের বিচার বুদ্ধির প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা থাকিলে যে সমস্ত কারণে জাতি স্বতন্ত্র আসন গ্রহণে বাধ্য হইতেছে সেগুলি বিশ্বের দরবারে নিবেদন করা উচিত।

আমরা এই সত্যগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে করি ঃ—

১। ভগবান সকল মনুষ্যকে সমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ;

২। স্রষ্টা তাহাদিগকে কয়েকটি অবিচ্ছেদ্য অধিকার প্রদান করিয়াছেন ;

৩। জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখান্বেষণ এই অধিকারগুলির অন্তর্গত ;

৪। এই অধিকারগুলিকে নিরাপদ করিবার জন্যই মনুষ্য-সমাজে গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা এবং গবর্ণমেণ্টের ন্যায্য শক্তিগুলি শাসিতের স্বীকৃতিব উপরই প্রতিষ্ঠিত।

৫। যখন কোন গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের পরিপন্থী হইয়া উঠে তখনই তাহার পরিবর্তন বা উচ্ছেদ করিয়া পূর্বোক্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার জাতির আছে। নূতন গবর্ণমেণ্টের রূপ ও গঠন এইরূপে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে যাহাতে গবর্ণ-মেণ্টের উপর ন্যস্ত ক্ষমতাগুলি জনসাধারণের সুখ ও নিরাপত্তা বিধানের সর্বাপেক্ষা উপযোগী হয়।

সামান্য এবং ক্ষণিক কারণে দীর্ঘকালের গবর্ণমেণ্টের পরিবর্তন অকর্তব্য ইহাই সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নির্দেশ। এই

জন্য সর্বত্রই দেখা যায় যে যতদিন দুঃখ অসহ্য না হইয়া উঠে ততদিন মনুষ্যগণ দুঃখ সহ্য করিয়াই চলে; তথাপি চিরাভ্যস্ত গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধন পূর্বক দুঃখ-প্রতিকারের চেষ্টা করে না। কিন্তু যখন একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অপহরণ পরম্পরার মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণ স্বৈরতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করিবার পরিকল্পনা পরিস্ফুট হইয়া উঠে তখন উক্ত গবর্ণমেণ্টকে অপসারণ করিয়া ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার নূতন প্রহরীর ব্যবস্থা করা জাতির অধিকার এবং কর্তব্য। এই উপনিবেশগুলি এইরূপেই ধৈর্যের সহিত দুঃখ ভোগ করিয়াছে এবং এইরূপ প্রয়োজনেই আজ তাহারা পূর্বতন গবর্ণমেণ্টগুলির পরিবর্তন সাধনে বাধ্য হইয়াছে। গ্রেট ব্রিটেনের বর্তমান রাজার ইতিহাস এই রাষ্ট্রগুলির উপর প্রজা-পীড়ন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ অত্যাচার ও অধিকার হরণেরই ইতিহাস। পক্ষপাতশূন্য অকপট জগতের দরবারে আমরা প্রমাণস্বরূপ এই ঘটনাগুলি উপস্থাপিত করিতেছি:—

জনহিতে অত্যাবশ্যক আইনে সম্মতিদানে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।

তিনি শাসকগণকে জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলিও তাঁহার সম্মতিলাভ পর্যন্ত চালু না করিতে নির্দেশ দিয়াছেন; অথচ শাসকগণ যখন আইনগুলিকে চালু করিবার জন্য তাঁহার সম্মতি প্রার্থনা করিয়াছে তখন সেগুলির প্রতি কোন মনোযোগ দেন নাই।

প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার জাতির পক্ষে অমূল্য, প্রজাপীড়ক রাজার পক্ষে ভয়াবহ।

এ অধিকার বর্জন না করা পর্যন্ত তিনি বড় বড় জনপদকে রাষ্ট্রমধ্যে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

আইন সভার সদস্যগণকে হয়রান করিয়া তদীয় ব্যবস্থা মানিয়া লইতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে তিনি আইন সভাগুলির অধিবেশন প্রথাবিরুদ্ধ, কষ্টদায়ক এবং সরকারী নথিপত্রাদি যে স্থলে রক্ষিত হয় সেখান হইতে দূরস্থিত স্থানে আহ্বান করিয়াছেন।

জনগণের অধিকারের উপর তদীয় আক্রমণের দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করে বলিয়া তিনি প্রতিনিধি-সভাগুলিকে পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

এইরূপে প্রতিনিধি-সভাগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া বহুদিন পর্যন্ত তিনি পুনর্নির্বাচনে স্বীকৃত হন নাই। ফলে অবিনশ্বর আইন প্রণয়নকারী শক্তি জনসাধারণের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইতিমধ্যে রাষ্ট্র বহিরাক্রমণ বা অন্তর্বিপ্লবে অরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে।

তিনি এই রাষ্ট্রগুলির জনবৃদ্ধি নিবারণ করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি বিদেশীদিগকে স্বীকরণ-বিষয়ক আইন প্রণয়নে বাধা দিয়াছেন, আগন্তুকগণকে উৎসাহ-দান বিষয়ক আইন পাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং নূতন জমি চাষ করিবার বিধিনিষেধগুলি কঠোরতর করিয়াছেন।

বিচারালয়গুলির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাবিষয়ক আইনে সম্মতি না দিয়া তিনি বিচার-ব্যবস্থায় বাধা দিয়াছেন।

কার্যকাল এবং বেতনের পরিমাণ ও প্রাপ্তির জন্য তিনি বিচারকগণকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছেন। জনসাধারণকে অন্তঃসারশূন্য করিবার জন্য তিনি অসংখ্য নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে নূতন কর্মচারী এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন।

আমাদের আইন সভার সম্মতি না লইয়া আমাদের মধ্যে শান্তিকালে স্থায়ী সৈন্যবল রাখিয়াছেন।

তিনি সামরিক শক্তিকে স্বাধীন করিয়া অসামরিক শক্তির ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছেন—

আমাদের স্কন্ধে সুবৃহৎ সশস্ত্র সৈন্যদল চাপাইবার জন্য ;

এই রাষ্ট্রগুলির অধিবাসিগণকে হত্যা করিবার অপরাধ হইতে কপট-বিচারের দ্বারা ঘাতকগণকে বাঁচাইবার জন্য ;

বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত অংশ হইতে আমাদের বাণিজ্যের বিলোপ সাধনের জন্য ;

আমাদের সম্মতি ব্যতীত আমাদের উপর করভার চাপাই-বার জন্য ;

বহুস্থলে জুরীর বিচার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য ;

মিথ্যা অপরাধে বিচারার্থ আমাদিগকে সমুদ্রপারে প্রেরণ করিবার জন্য ;

পার্শ্ববর্তী প্রদেশে ব্রিটিশ আইনের স্বাধীন ব্যবস্থা রহিত করিয়া, স্বৈর শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং সীমানা বাড়াইয়া এই উপনিবেশগুলিতে অনুরূপ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উপযুক্ত আদর্শ এবং উপায় স্থাপনের জন্য ;

আমাদের অধিকার অপহরণের জন্য, আমাদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান আইনগুলি প্রত্যাহারের জন্য, এবং আমাদেব গবর্ণমেণ্টগুলির ক্ষমতা আমূল পরিবর্তনের জন্য ;

আমাদের স্বকীয় আইন সভা বন্ধ করিয়া দিয়া আমাদের উপর সর্ববিষয়ে আইন করিবার ক্ষমতা তাহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য ;

আমাদের আইন বহির্ভূত এবং আমাদের কনষ্টিট্যুশন (শাসনতন্ত্র) বিরোধী শাসনব্যবস্থার অধীনে আমাদিগকে আনিবার জন্য ;

তিনি অন্য লোকের সহিত যোগ দিয়া তাহাদের প্রণীত কপট আইনে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আমরা তাঁহার রক্ষণীয় নয় ইহা ঘোষণা করিয়া এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া তিনি এদেশের শাসনভার পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি আমাদের সমুদ্র লুণ্ঠন করিয়াছেন ; সমুদ্রতীর বিধ্বস্ত করিয়াছেন, নগরা পোড়াইয়া দিয়াছেন এবং জনগণের জীবন নাশ করিয়াছেন।

অরাজোচিত এবং বর্বরযুগেও অনুপমেয় নিষ্ঠুরতা ও

কপটতার সহিত তিনি যে হত্যা, ধ্বংসলীলা এবং অত্যাচার পূর্বেই আরম্ভ করিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য বর্তমানে দলে দলে ব্যবসাদার বিদেশী সৈন্য আমদানী করিতেছেন।

আমাদের সমনাগরিকগণকে সমুদ্র মধ্যে বন্দী করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে, বন্ধু ও ভ্রাতৃগণকে হত্যা করিতে অথবা তাহাদের হস্তে নিহত হইতে বাধ্য করিয়াছেন।

তিনি আমাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধাইয়াছেন এবং নিষ্ঠুর বর্বর নিগ্রোগণ যুদ্ধকালে আবালবৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে সর্বাবস্থার লোকদিগকে নির্বিচারে হত্যা করে ইহা জানিয়াও তাহাদিগকে আমাদের সীমান্তবাসিগণের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়াছেন।

এই সমস্ত অত্যাচারের পদে পদে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া আমরা অতি বিনীতভাবে তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছি। পুনঃ পুনঃ আবেদনের উত্তরে আমরা শুধু বার বার শাস্তিই পাইয়াছি। যে রাজার চরিত্র এতাদৃশ প্রজাপীড়ক কর্মসমূহ দ্বারা কলঙ্কিত তিনি স্বাধীন জাতির শাসক হইবার অযোগ্য।

আমাদের ব্রিটিশ ভ্রাতৃগণের প্রতিও আমরা কম মনোযোগ দিই নাই। তাহাদের আইন সভা আমাদের উপর অন্যায় অধিকার বিস্তার করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছে সে বিষয়ে আমরা তাহাদিগকে মাঝে মাঝে সাবধান করিয়া দিয়াছি। আমরা যে অবস্থায় এদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলাম তাহা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। তাহাদের

সহজ ধর্মবুদ্ধি এবং উদারতার নিকট নালিশ জানাইয়াছি। এই সমস্ত অধিকারহরণ অস্বীকার করিবার জন্য আমাদের ও তাহাদের সমান পূর্বপুরুষগণের নামে তাহাদের নিকট আবেদন করিয়াছি। ইহাতে যে আমাদের সম্পর্ক ও আদান-প্রদান বিচ্ছিন্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী তাহাও তাহাদিগকে জানাইয়াছি। কিন্তু তাহারাও এই ন্যায় এবং রক্তের আহ্বানে বধিরতা অবলম্বন করিয়াছে। এতদবস্থায় আমাদের বিচ্ছেদ ঘটয়িত্রী নিয়তিকে স্বীকার করিতে এবং তাহাদিগকে মানব-জাতির অন্যান্য অংশেরই মত যুদ্ধকালে শত্রু এবং শান্তিকালে মিত্র বলিয়া মনে করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি।

অতএব আমরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি রূপে সাধারণ কংগ্রেসে মিলিত হইয়া জগতের পরম বিচারককে আমাদের উদ্দেশ্যের সততায় সাক্ষী রাখিয়া সমস্ত উপনিবেশ-বাসী জনগণের নামে ও তাহাদেরই প্রদত্ত অধিকার বলে দৃঢ়-ভাবে প্রচার ও ঘোষণা করিতেছি যে,

(১) এই একতাবদ্ধ উপনিবেশগুলি মুক্ত ও স্বাধীন হইল এবং স্বাধিকার বলে তাহাদের তাদৃশ হওয়াই উচিত ;

(২) ব্রিটিশ-রাজের প্রতি সমস্ত আনুগত্য হইতে তাহারা মুক্ত হইল ;

(৩) তাহাদের সহিত গ্রেট ব্রিটেনের সমস্ত রাজনৈতিক বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইল ; এবং

(৪) মুক্ত এবং স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি

স্থাপন, মৈত্রী সম্পাদন, বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্রোচিত সর্ববিধ কার্য করিবাব সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাহারা গ্রহণ করিল।

এই ঘোষণার সমর্থনের জন্য ঈশ্বরের উপর দৃঢ় নির্ভব রাখিয়া আমরা পরস্পরের নিকট আমাদের জীবন, সম্পত্তি এবং পবিত্র আত্মসম্মান আবদ্ধ রাখিতেছি।"

৮ই ডিসেম্বর রবিবার জর্জ ওয়াশিংটনের বাড়ী দেখিতে যাই। বাড়ীটির নাম মাউণ্ট ভার্ণন। ইহা ওয়াশিংটনের নিজের বাড়ী; ভার্জিনিয়া রাষ্ট্রে অবস্থিত। এখানে তিনি সপরিবারে বাস করিতেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মাউণ্ট ভার্ণন মহিলা সমিতি (লেডিজ এসোসিয়েশন) এই বাড়ীটি রক্ষা করিবার ভার নেন। তদবধি তাঁহারাই বাড়ীটির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। ওয়াশিংটন শহর হইতে ইহাব দূরত্ব ১৬ মাইল। বাসে যাতায়াতের ভাড়া ১ ডলার ১৫ সেণ্ট।

সকালে প্রাতরাশের পর বাহির হইয়া পড়িলাম। দূতাবাসের কর্মচারী শ্রীযুত শিবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গী করিলাম। ইনি আমার সমবয়স্ক এবং ওয়াশিংটনে নবাগত। অল্পদিন হইল দিল্লী হইতে বদ্‌লী হইয়া এখানে আসিয়াছেন। ক্ষতিপূরণ বাবদ "বিজয়ী" ভারতবর্ষ বিজিত জাপানের নিকট কি কি সম্পত্তি পাইতে পারে ইনি সে বিষয়ে ভারতের পক্ষে তদ্বির করেন। বড় পোষ্ট আপিসের নিকট হইতে মাউণ্ট ভার্ণনের বাসে উঠিলাম। জেফারসন মেমোরি-

য়ালের অনতিদূরে পটোম্যাক নদীর সুদৃশ্য সেতু অতিক্রম করিলাম। চমৎকার রাস্তা—নদীর ধার দিয়া বরাবর মাউণ্ট ভার্ণন পর্যন্ত গিয়াছে। বামে নদী, দক্ষিণে পাতলা জঙ্গল। জঙ্গলে এল্‌ম গাছই বেশি। দুইটি ছোট ছোট শহর অতিক্রম করিলাম। এগুলি নাকি এদেশের খুব প্রাচীন শহর—অর্থাৎ দেড় শত বৎসরেরও বেশি এদের বয়স। পটোম্যাক নদী বেশ বড়। কলিকাতার গঙ্গার মত, কোথাও তার চেয়েও একটু বড় হইতে পারে। নদীতীরে একটি টিলার উপর মাউণ্ট ভার্ণন অবস্থিত। নদী হইতে বাড়ীর এবং বাড়ী হইতে নদীর দৃশ্য তুল্য চিত্তাকর্ষক। বাড়ীটি দোতলা, বাংলা ঘরের মত মট্‌কাযুক্ত ছাদ। উপরে নীচে দুটা করিয়া ঘর। ওয়াশিংটনের সময় যেরূপ ছিল ঠিক সেই ভাবেই রাখা হইয়াছে। ঢুকিতেই বৈঠকখানা ঘর। ফ্রান্সের ষোড়শ লুই ওয়াশিংটনকে একটা কার্পেট তৈরি করাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। কার্পেটটি বৈঠকখানায় পাতা রহিয়াছে। যে হার্পসি কর্ডে ওয়াশিংটনের পোষ্য নাতনী গান গাহিত তাহা পাশের ঘরে সেই ভাবেই সাজান আছে। এই ঘরগুলির সাম্‌নে বারাণ্ডা। তাহাতে চেয়ার পাতা রহিয়াছে। যেন ওয়াশিংটন ও তদীয় গৃহিণী এখনই আসিয়া বসিবেন। এখান হইতে নদীর দৃশ্য মনোরম। উপরে যে ঘরে ওয়াশিংটন মারা যান সেটা ঠিক সেদিনকার মত সাজান রহিয়াছে। বিছানাটি একটি হাতের কাজ-করা সুন্দর কাঁথা দিয়া ঢাকা। অনতিদূরে

রান্নাঘর। সেখানে হাঁড়ি, কড়া, মুষল, কাহিলচিয়া প্রভৃতি তদানীন্তন বাসনগুলি পড়িয়া আছে। ওয়াশিংটন-গৃহিণীর হাতের স্পর্শ যেন তাহাতে লাগিয়া আছে। বাড়ীর চারিদিকে অনেক জমি ও বাগান। নামিয়া নদীর ঘাট পর্যন্ত যাইবার পথ আছে। সে গ্রাম্য পথ সেদিন যেমন ছিল আজও তেমন আছে। আমেরিকার সুনিপুণ ইঞ্জিনীয়ারগণ পথটিকে আধুনিক পদ্ধতিব করিবার জন্য ইহার গায়ে হস্তক্ষেপ করে নাই, সশ্রদ্ধচিত্তে পাশ কাটাইয়াই চলিয়া গিয়াছে। ওয়াশিংটন হইতে ষ্টীমাব যোগে আসিয়া এই ঘাটে নামা যায। ঘাটের অনতিদূরে ওয়াশিংটনের সমাধি। বাড়ীটির বাহিবে আসিয়া একটি হোটেলে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিয়া ইতস্ততঃ পায়চারি করিতেছি। দেখি একটি ছোট এল্‌ম গাছের তলায় একখণ্ড ফলকে লেখা আছে যে, ম্যাসাচুসেট্‌স্ রাষ্ট্রে যে এল্‌ম গাছের তলায় ওয়াশিংটন বিদ্রোহী বাহিনীর সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া-ছিলেন এটি সেই বৃক্ষেরই প্রপৌত্র।

বৈকালে ফিরিবার পথে আমরা আর্লিংটনে জাতায সমাধি-ক্ষেত্রের নিকট নামিয়া পড়িলাম। বহু সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষের সমাধি এখানে আছে। পাহাড়ের গা বাহিয়া সমাধিশ্রেণী। পাহাড়টি খুব উঁচু নয়। পাহাড়ের উপরে সেনাপতি লি'র বাড়ী। সেনাপতি লি আমেরিকার গৃহযুদ্ধে দক্ষিণের পক্ষে অস্ত্র-ধারণ করিয়া পরাজিত হন। ইহারই আশেপাশে তখন অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল—বাড়ীটি এখন মিউজিয়মরূপে রক্ষিত। এই

পাহাড়ের উপর হইতে পটোম্যাকের উপরে ওয়াশিংটন শহরের দৃশ্য পরম রমণীয় দেখায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও আমি ওখান হইতে হাঁটিয়াই ওয়াশিংটনে ফিরিলাম। পাহাড়ের অনতিদূরে পটোম্যাক সেতু। সেতু পার হইলেই ওয়াশিংটন শহর। আর্লিংটন সমাধিক্ষেত্র শহরের পশ্চিমে, পদব্রজে সাকো পার হইবার সময় আর্লিংটন পাহাড়ের পিছন দিয়া অস্তগামী সূর্যের শোভা আমাদের উভয়ের মনকেই পিছনে টানিতেছিল।

ওয়াশিংটন নগরী মার্কিন জাতির হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ; ইহা সমস্ত দেশের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। যে আটচল্লিশটি রাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত ওয়াশিংটন তাহাদের বহির্ভূত। ইহা সমস্ত রাষ্ট্রের তুল্য গৌরবস্থল। এই শহরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ইহারা সর্বদা সচেষ্ট। সরকারী ইঞ্জিনীয়ারগণ এখানে শুধুই হিতকারী নন, রূপকারও বটেন। সরকারী সৌধাবলীর এত শোভা অন্য কোন দেশে দেখি নাই। সরকারী বাড়ীগুলির চমৎকার ডিজাইন; নির্মাণকার্যে নানাবিধ মর্মরের ব্যবহার নয়নরঞ্জক। ক্যাপিটল আর্ট গ্যালারী, আর্কাইভ-ভবন ও হোয়াইট হাউসের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ট্রেজারী, ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট, সুপ্রীম কোর্ট, কংগ্রেসের লাইব্রেরী, প্যান-আমেরিকান ইউনিয়ন প্রভৃতি বাড়ীগুলি সত্যই রূপগৌরবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রাস্তাগুলি সরল ও সমান্তরাল; প্রশস্ততা ও মসৃণতায় এদের তুলনা নাই। সুদৃশ্য সরকারী সৌধশ্রেণীর

বিন্যাস এবং গঠন সুপরিকল্পিত। এই আকাশচুম্বী প্রাসাদের দেশে পাছে কোন কোন বাড়ী অতিরিক্ত উর্ধ্বে উঠিয়া নগরীর দৃশ্য-সমতার হানি করে সেইজন্য দশ তলার বেশী বাড়ী তৈরি করা এখানে নিষিদ্ধ। নগরীর সৌধ-সমতাই ইহার সুষমা বৃদ্ধি করিয়াছে।

একদিন* এখানকার চিড়িয়াখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। উঁচু নীচু পাহাড়ে জায়গায় চিড়িয়াখানাটি অবস্থিত। ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে বেশ মনোরম। হাতী, সিংহ, জলহস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি জানোয়াব এদেশের সাধারণ লোকের নিকট বিস্ময়কর জীব। আমার কাছে পাখীব ঘরগুলি সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিল। রংবেরঙের রকমারি পাখী; এক একটি ঘরে যেন রামধনু উঠিয়াছে। আমাদেব দেশেব কাক কোকিল ও শকুন সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। অতি যত্নেই যেন এদের উৎসাহ ও জীবনী-শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। নিঃসঙ্গ নিরানন্দ কোকিলটি ধুঁকিতেছে। অদম্য কাকও এখানে নীবব। এক রকমের কাক দেখিলাম; তার ঘাড় এবং বুক সাদা। ঈগল পাখী ও উটপক্ষী অনেকগুলি দেখিলাম। উটপক্ষীর ডিম প্রকাণ্ড; কয়েকটি সাজান রহিয়াছে। কস্তুর নামক খুব বড় একটি মাংসাশী পক্ষী দেখিলাম। একটি কক্ষে দক্ষিণ মেরু-নিবাসী পেঙ্গুইন পক্ষী রহিয়াছে। দুই পায়ের উপর ভর দিয়া মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সামনের দিকে আরও দুইটা

* ৭ই ডিসেম্বর, শনিবার ২১শে অগ্রহায়ণ।

চামড়া পায়েব মত ঝুলিতেছে। জলে সাঁতার কাটিবার সময় এই দুইটি ব্যবহার করিতেছে। শীতের দেশের পাখী বলিয়া ঘরের মধ্যে বিস্তর বরফ রাখা হইয়াছে। মাঝে মাঝে সাঁতার কাটিবার জলকুণ্ড। নূতন জানোয়ারের মধ্যে আলপাকা ও সাদা বন্য মহিষ দেখিলাম। আলপাকা মেষজাতীয়; তবে আকাব একটু বড় এবং গলা লম্বা। বন্য মহিষ অনেক বকমের আছে; তন্মধ্যে একটার সবাঙ্গ দুধের মত সাদা।

আমার ওয়াশিংটনে পৌছিবার কয়েক দিন পরেই দেশ-ব্যাপী কয়লা-খনির মজুর ধর্মঘট আবম্ভ হয়। জন লুইস মজুবদের নেতা। মজুরদেব মধ্যে তাঁহাব অসীম প্রতিপত্তি। পূবের একটি ধর্মঘটেব সময় মালিকদেব হাত হইতে সরকার যুদ্ধকালের জন্য খনিগুলি পবিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। সে সময় সরকারের সঙ্গে মজুরদের মাহিনা এবং অন্যান্য বিষয়ে এক চুক্তি হয়। সে চুক্তির মেয়াদ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত। ১৯৪৬ সালের নবেম্বর মাসেই লুইস গবর্ণমেণ্টকে ১৫ দিনের নোটিশ দিয়া বলেন যে তাঁহারা পুরাতন চুক্তি পনর দিন পরে বাতিল করিয়া দিবেন। ইতিমধ্যে সরকার যদি নূতন চুক্তি না করেন তবে তাহার পর মজুরগণ বিনা চুক্তিতে কাজে যাইবে না। খনিগুলির পরিচালনার ভার তখনও সরকারের হাতে।

এই ধর্মঘটে সমগ্র আমেরিকা ও ইউরোপ চঞ্চল হইয়া উঠিল। শীত আগত। মধ্য ইউরোপে কয়লা নাই। বিলাতে

কয়লার উৎপাদন অপ্রচুর। বিলাত, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ আমেরিকার কয়লার উপর অনেকখানি নির্ভর করিয়া থাকে। কয়লার অভাবে দেশের বহু কারখানার উৎপাদন বন্ধ হইয়া যাইবে। আগতপ্রায় শীতে কয়লার অভাব হইলে ত মানুষই জমিয়া যাইবে।

১৯৪৬ সালে আমেরিকায় যত ধর্মঘট হইয়াছে এদেশে এত ধর্মঘট পূর্বে কখনও হয় নাই। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সময় ইহা স্বাভাবিক হইলেও সুচিন্তিত ও দৃঢ়নীতির আবশ্যকতা সূচনা করে।

খবরের কাগজগুলি তখন এই ধর্মঘটের আলোচনায ভর্তি। প্রেসিডেণ্ট টু্ম্যান কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিবেন তাহা লইয়া আলোচনা চলিতেছে। তিনি কিন্তু তখনও নীরব। যুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি হইতে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত হাজার হাজার মাইল বড় তেলের পাইপ মাটির নীচে বসান হইয়াছিল। সেগুলি তখনং বেচিয়া দিবার কথা চলিতেছে। সরকার এখন সেগুলিকে কোন কোম্পানীর নিকট ভাড়া দিতে রাজী হইবেন কিনা এবং যদি হন তবে কোন কোম্পানী ঐগুলি ভাড়া লইয়া পেট্রোলের দ্বারা গ্যাস উৎপাদন করিয়া পাইপ-সাহায্যে সেই গ্যাস নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত আনিয়া দেশের শীত এবারের মত নিবারণ করিতে পারিবেন কি না ইহা লইয়াও আলোচনা চলিতেছে।

মজুরদের কোন কোন বিষয়ে অসুবিধা থাকিতে পারে,

কিন্তু তাঁহারা উচ্চ হারেই বেতন পান। বিশেষতঃ লুইসের সঙ্গে সরকারের চুক্তি বিদ্যমান। প্রশ্ন এই—সে চুক্তি একতরফা ভাঙ্গিয়া দিয়া কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধির জন্য সহসা সমগ্র জাতির টুঁটি টিপিয়া ধরিবার অধিকার লুইসের আছে কি না? যদি থাকে তবে আমেরিকার গণতন্ত্রের কি হইল? সমগ্র জাতিকে চাপে ফেলিয়া ও ভয় দেখাইয়া ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা ত ফ্যাসিষ্ট পন্থা। ইহা দস্যুতার নামান্তর মাত্র। আমেরিকার জীবন্ত গণতন্ত্র ইহা সহিবে কি? যদি সহ্য না করে তবে ইহার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র-সম্মত কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে?

কয়েকদিন নীরব থাকিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁহার নীতি ঘোষণা করিলেন। তিনি বলিলেন, জাতির সঙ্গে চুক্তি করিয়া তাহা এক তরফা ভাঙ্গিয়া দেওয়া বে-আইনী। কার্যে যোগদান না করিয়া মজুরগণ বে-আইনী কার্য করিতেছে। অতএব তিনি মজুরদিগকে কাজে যোগদান করিতে আহ্বান করিলেন। ফল হইল না। তখন তিনি আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। নালিশ দুইটি—(১) ধর্মঘটটিকে চুক্তি-বিরুদ্ধ অতএব বে-আইনী ঘোষণা করা; (২) লুইস মজুর-দিগকে যাহাতে এই বে-আইনী কার্যে লিপ্ত হইতে নির্দেশ না দেন তজ্জন্য তাহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা। লুইস জবাবে বলিলেন—আমেরিকার একটি আইনে প্রত্যেক মজুরের ধর্মঘটের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। এই আইনের বলে

তাঁহার কাজ বৈধ। সরকার পক্ষের মতে সমগ্র জাতির প্রতিনিধি সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধাবস্থায় এ আইন অপ্রযোজ্য। যে জজের নিকট বিচার চলিল, তিনি পূর্বে আইন সভার সভ্য ছিলেন এবং এই আইন প্রণয়নের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ইহার পূর্বে লুইস একটি বড় ধর্মঘট-সংক্রান্ত মামলায় এই জজের নিকট জিতিয়াছিলেন। কিন্তু এবার রায় তাঁহার বিরুদ্ধে হইল। লুইসের উপর এবং ইউনিয়নের উপর দিন হিসাবে জরিমানা ধার্য হইল। যত দিন ধর্মঘট চলিবে জরিমানার পরিমাণ সেই হারে বাড়িবে। ইউনিয়নের তহবিলে মজুত অর্থের পরিমাণ এবং লুইস্ ইউনিয়নের নিকট যে বেতন পাইত তাহা আমাদের কল্পনাতীত। আমার যত দূর মনে আছে লুইসের বেতন ছিল বার্ষিক ২৫০০০ ডলার বা ৮৩০০০ হাজার টাকার কিঞ্চিদধিক। এই রায়ের উপর সুপ্রীম কোর্টের মতামত জানিবার জন্য সরকার নিজেই সুপ্রীম কোর্টে আপিল দাখিল করিয়া নিবেদন করিলেন যে ব্যাপারটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী, যাহাতে সরকার দ্রুত কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন সেইজন্য তাহারা অবিলম্বে সুপ্রীম কোর্টের মতামত প্রার্থনা করিতেছেন। লুইসের বিরুদ্ধে তখন জনমত বেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। মজুরদের বেতনের হার অসঙ্গত ছিল না। অন্ততঃ পৃথিবীর যে-কোন দেশের মজুরদের নিকট সে হার কল্পনারও অতীত। উপরন্তু সরকারের সঙ্গে তাঁদের চুক্তি বিদ্যমান। সে চুক্তির মেয়াদ মাত্র আর কয়েক মাস

ছিল। সে অবস্থায় একতরফা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে অমান্য করিয়া জাতির উপর জবরদস্তি করা গণতন্ত্র-বিরোধী, অতএব নিন্দিত। সকলেরই প্রায় এই এক সুর। লুইস তখন সহসা এক দিন সকলকে বিস্মিত করিয়া ধর্মঘট প্রত্যাহার করিলেন। বলিলেন—সুপ্রীম কোর্ট যাহাতে ধীরে সুস্থে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার করিতে পারেন সেইজন্য তিনি ধর্মঘট প্রত্যাহার করিলেন।

আমার ওয়াশিংটন পরিত্যাগের কয়েকদিন পূর্বেই ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হইল। জাতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। গণতন্ত্রের বিজয় সূচিত হইল। আমার এদেশে অবস্থান কয়লার অভাবে খণ্ডিত বা অসুবিধাগ্রস্ত হইবে না—মনে করিয়া আমিও শান্তি পাইলাম। কাগজগুলি তখন লিখিল যে ইহাতে সমস্যার সমাধান হইল না। আলোচনা দ্বারা মজুরদের দাবিগুলির মীমাংসা কবিতে হইবে। নচেৎ বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরাইলে অর্থাৎ ৩১শে মার্চের পর পুনরায় সমস্যা দেখা দিবে। লুইসের বিরুদ্ধে জনমত সুস্পষ্টরূপে দেখা দিল। এক ব্যক্তি অন্যায়রূপে যাহাতে জাতির টুঁটি টিপিয়া না ধরিতে পারে তজ্জন্য আইন প্রণয়নের দাবি উঠিল। এ দেশের লোক আলোচনা দ্বারা বিরোধ-মীমাংসার পক্ষপাতী। নিয়োগ-কর্তারা দাবি করিলেন যে, মজুরদের যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আলোচনা চালাইবার অধিকার থাকে তবে তাহাদেরই বা আলোচনা চালাইবাব জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার থাকিবেনা

কেন। উভয় পক্ষের আলোচনার জন্য এবং আলোচনা যাহাতে ফলপ্রসূ হয় তজ্জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই সরকারের কর্তব্য। সরকারের এই কর্তব্য পালন করিবার জন্য যথোচিত্ ব্যবস্থা আছে, না তাহার সংস্কারের প্রয়োজন? এইরূপ নানাবিধ আলোচনা তখন চলিতে লাগিল।

বাজেট ব্যুরোর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহৃদয় ব্যবহারে আমার কার্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্মচারী সযত্নে ও সাদরে আমার কার্যে সাহায্য করিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা আমার সমস্ত দ্বিধা ও প্রশ্নের নিরসন করিতেছেন। ইঁহারাই আমার আমেরিকার গোটা প্রোগ্রাম স্থির করিয়া সর্বস্থানে কর্তৃপক্ষের নিকট আমাকে সকল প্রকারে সাহায্য করিবার জন্য আশ্বাস দিলেন।

বাজেট ব্যুরোর কর্ম সমাপনান্তে ট্রেজারীতে যাই। সেখানে কয়েকদিনের জন্য আমার মূল কর্মস্থল স্থাপিত হইল। আমার বসিবার জন্য যে ঘর নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার পাশেই হোয়াইট হাউস, মধ্যে একটি রাস্তার ব্যবধান। এখানেও ঊর্ধ্বতন কর্মচারিগণের মধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হইলাম। ইহাদের কার্য যেমন সুশৃঙ্খলাপূর্ণ তেমনি গভীর। ইঁহারা কোন বিষয়েরই একেবারে মর্মস্থলে প্রবেশ না করিয়া এবং আদ্যোপান্ত না জানিয়া ছাড়ে না। ইহাদের ট্যাক্স রিসার্চ ব্রাঞ্চ বা কর বিষয়ক গবেষণা শাখার সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়

হইয়াছিল। এক একজন কর্মচারী এক একটি ট্যাক্স বিষয়ে গবেষণায় রত আছেন। পৃথিবীর কোথায় কিরূপ পরিবর্তন হইতেছে সে সম্বন্ধে ইহারা সর্বদা সজাগ। এই কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন। তিনি আয়করে বিশেষজ্ঞ। এদেশের পুস্তক প্রকাশকগণের প্রচেষ্টাও আমাদের কল্পনাতীত। শিকাগোর কমার্স ক্লিয়ারিং হাউস নামক প্রকাশকগণের একটি ট্যাক্স-সার্ভিস আছে। তাঁহারা পৃথিবীর সমস্ত দেশের ট্যাক্স সম্বন্ধে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করিয়া গ্রাহকগণকে নিয়মিতরূপে সরবরাহ করেন। সরকারী অপিসগুলিও ইহাদের গবেষণালব্ধ বিষয় মাঝে মাঝে সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করে। যে আপিসেই গিয়াছি সেখানকার লোকেরাই তাহাদের প্রকাশিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও রিপোর্ট বিনামূল্যে সাগ্রহে আমাকে দিয়াছে। অনেক সময় আমি সবগুলি নিতে পারি নাই—বাছিয়া লইতে হইয়াছে। ইহাদের কার্যপদ্ধতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি; ইহাদের অমায়িক ব্যবহার আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। ইহারা নিজেরা ডাকখরচা দিয়া অনেক পুস্তক নিয়মিতরূপে এখনও আমাকে পাঠাইতেছে।

১০ই ডিসেম্বর সকলের নিকট (২৪শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার) বিদায় গ্রহণ করিয়া হোটেলে ফিরিলাম। পরদিন ওয়াশিংটন ত্যাগ করিব; আর এখানে ফিরিব না।

পঞ্চম অধ্যায়

টেনেসি উপত্যকা

১১ই ডিসেম্বর, বুধবার* প্রত্যূষে ওয়াশিংটন বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছিলাম। পৌনে ন'টায় বিমান উড়িল। বিমানটির দুইটি ইঞ্জিন, ২৪টি আসন। পথে তিনটি ষ্টেশন: লিঞ্চবার্গ, রোয়ানোকে ও জনসন্ সিটি। কুয়াশার জন্য বিমান শেষেরটিতে নামিল না। নীচে শুধু জনবসতি-বিরল সীমাহীন প্রান্তর। ফসল বিশেষ দৃষ্টিগোচর হইল না। ক্রমশঃ লাল মাটির দেশ ও ছোট ছোট দু-একটা পাহাড় দেখা গেল। বেলা ১২টা ৪৯ মিনিটে নক্সভিল ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। চারিদিকে মাঠ ধু ধু করিতেছে। সেখান হইতে নক্সভিল শহর ১২ মাইল। ট্যাক্সিযোগে নগরে পৌঁছিলাম। এখানে টেনেসি উপত্যকা কর্তৃপক্ষের প্রধান আপিস। হোটেলে গিয়া মধ্যাহ্নভোজন সমাপনান্তে টেলিফোনযোগে আমার আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিয়া আপিসে উপনীত হইলাম। সেখানে সাদরে গৃহীত হইলাম।

টেনেসি উপত্যকার ভূমি অনুর্বর। বন্ধুর পর্বত-সঙ্কুল দেশ। মাটি লাল। দো-ফসলী জমি নাই বলিলেই হয়। ভুট্টা প্রধান ফসল। চাষ পশুদ্বারাই হয়। গরুগুলি ক্ষীণ। জনবসতি বিরল। ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল পর্যন্ত বর্ষাকাল।

* ২৫শে অগ্রহায়ণ।

বার্ষিক বারিপাত প্রায় ৬০ ইঞ্চি। ফসলের পক্ষে বারিপাত প্রচুর। মেঘ কালবর্ষী। জলসেচের দরকার নাই।

দুই শতাধিক বর্ষ পূর্বে যখন ইউরোপীয় জাতি এদেশে প্রথম বসতি স্থাপন করে তখন এ দেশের জমি উর্বর ছিল। জমির পর জমি লাঙ্গলের নীচে আসিল। জঙ্গল কাটিয়া সাফ করা হইল। ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া জমির বেহিসাবী ব্যবহার চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ টেনেসি নদীতে বন্যা দেখা দিল। বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাইত। জমির উপরের মাটি বন্যায় ধুইয়া গেল। বন্যার জলে মাটি কাটিয়া খাল হইয়া গেল। অনেক জমি চাষের অনুপযুক্ত হইল। দেশ ব্যাপিয়া অনুর্বরতার সমস্যা দেখা দিল। যে সব জমিতে সোনা ফলিত তাহাদের এখন নিজ দেহের নগ্নতা ঢাকিবার মত ঘাস জন্মাইবারও ক্ষমতা রহিল না। নদী বর্ষাকালে বন্যাপ্লাবিত হইত—গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। নদীপথে যানবাহনের চলাচল বন্ধ হইয়া গেল। দেশ সর্বতোভাবে দারিদ্র্যের সম্মুখীন হইল।

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছে। সরকার আলাবামা রাষ্ট্রের মাস্‌ল শোলস্ নামক স্থানে একটি বারুদের কারখানা স্থাপন করেন। নিকটবর্তী টেনেসি নদীতে একটি বাঁধ নির্মাণ-পূর্বক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিয়া এই কারখানা চালাইবার সিদ্ধান্ত করা হয়। বাঁধ নির্মাণকার্য্য ১৯১৮ সনে আরম্ভ হইয়া ১৯২৪ সনে শেষ হয়। তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে।

কাজেই কারখানা ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন গৃহ অকেজো পড়িয়া রহিল। এগুলিকে বিক্রয় করিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু উচিত মূল্যে খরিদ্দার জুটিল না। তখন সেনেটের নরিস প্রমুখ কতিপয় দূরদর্শী ব্যক্তি একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ইহা পরিচালিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাবিত কর্তৃপক্ষ এই কারখানা ও বাঁধের ভার লইবেন, নদীতে প্রয়োজনমত আরও বাঁধ তৈরী করাইবেন এবং তদ্দারা বন্যাশাসন, নদীর নাব্যতা সম্পাদন ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া টেনেসি উপত্যকার সর্বতোমুখী উন্নতিসাধন করিবেন। এই কর্তৃপক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে স্বতন্ত্রভাবে জনস্বার্থে কাজ করিবেন; লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিবেন না। ১৯৩৩ সনে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের চেষ্টায় 'টেনেসি উপত্যকা কার্যপরিচালনা আইন' পাস হয়। আইনে উক্ত সংসদ প্রতিষ্ঠার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি লিপিবদ্ধ আছে; যথা (১) টেনেসি নদীর নাব্যতাসাধন ও বন্যাশাসন; (২) বন উৎপাদন এবং যে সমস্ত জমি কৃষির অনুপযুক্ত হইতে চলিয়াছে সেগুলির সদ্ব্যবহার; (৩) টেনেসি উপত্যকার কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন; এবং (৪) আলাবামায় মাস্‌ল শোলসের বারুদের কারখানার ভার লইয়া দেশরক্ষা বিষয়ে যথোচিত সাহায্য দান।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পর ১৩ বৎসর অতীত হইয়াছে। টেনেসি উপত্যকায় কর্তৃপক্ষ বাঁধের পর বাঁধ তৈরী করাইয়াছেন।

বর্তমানে নদীতে ২৭টি বড় বাঁধ আছে। ৯টি টেনেসি নদীতে; ১৮টি টেনেসির উপনদীসমূহে। প্রত্যেক বাঁধের পশ্চাতে বৃহৎ সরোবর এবং সম্মুখে নীচে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রসমূহে টারবাইনের বিপুল চক্রের অবিরত আবর্তনে প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। বর্ষার জল যখন প্রবল বেগে পাহাড় হইতে নামে তখন বাঁধে বাধা পাইয়া পিছনের সরোবরে গিয়া পড়ে। বিপুল জলরাশি তখন উদ্দাম মত্ততা পরিত্যাগ করিয়া সরোবরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। সারা বছর ধরিয়া জলপ্রবাহ ধীরে ধীরে বাঁধের নীচে দিয়া অপ্রতিহত গতিতে নামিয়া আসে এবং তত্রত্য পাওয়ার হাউসের বিরাটকায় লৌহচক্রকে সজোরে ঘুরাইয়া দিয়া ফেনায়িত অবস্থায় ফুলিয়া ফুলিয়া সগর্জনে নদী-খাদে চলিয়া যায়। শক্তি-গৃহের বাহিরেও জল নামিবার একটি পথ থাকে। বেশী জল নীচে পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে এই পথটি ব্যবহৃত হয়। এইরূপ পাহাড়ের উপর হইতে নীচে পর্যন্ত নদীর ঘাটিতে ঘাটিতে বাঁধ। সমস্ত বাঁধ একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাধীনে ব্যবহৃত হইতেছে। যত জলই পাহাড় হইতে নামুক না কেন তাহাদিগকে বিভিন্ন সরোবরে আটকাইয়া রাখিয়া প্রয়োজন মত বিলি করা হইতেছে। রেলের সাহায্যে যেমন ইচ্ছামত যথাস্থানে ও যথাকালে মাল পাঠান যায় এই বাঁধগুলির সাহায্যে তেমনি জলরাশিকে ইচ্ছানুরূপ গতিতে যথাস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। টেনেসির বৃহত্তম বাঁধ অপেক্ষাও

বড বাঁধ এই দেশেই আছে। কিন্তু ৪০,০০০ বর্গ মাইল পরিমিত একটি সমগ্র উপত্যকার সমস্ত জলরাশিকে একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অধীনে নানাবিধ জনকল্যাণে যুগপৎ নিযোজিত করিবার উদাহবণ পৃথিবীতে আর নাই।

উপত্যকা-কর্তৃপক্ষেব কার্যাবলীকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায। যথা—

(১) শক্তি উৎপাদন, নদার নাব্যতা সাধন এবং বন্যাশাসন.

(২) বাসাযনিক দ্রব্য উৎপাদন,

(৩) আঞ্চলিক উন্নতি বিধান।

প্রথম শ্রেণীর কার্যাবলী সত্যই বিস্মযকব। ইহার কল্পনা-মহিমা, সম্পাদনচাতুর্য, কল্যাণপ্রসূত্ব এবং ব্যাপকত্ব যুগপৎ চিত্তকে অভিভূত কবে। যে জলবাশি জমির সার ভাসাইযা লইয়া সমুদ্রে ফেলিতেছিল এবং বন্যার সৃষ্টি করিযা দেশকে ধ্বংসের পথে লইযা চলিযাছিল আজ তাহা সম্পূর্ণরূপে জনকল্যাণে নিয়োজিত।

১৯৪৫ সনে উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ বার শত কোটি কিলোওযাট ঘণ্টা পবিমিত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করেন। অর্থাৎ তাহাদের মাসিক উৎপাদনেব পরিমাণ ছিল এক শত কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টায়। পৃথিবীর কোন প্রতিষ্ঠানই একক এত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করে না।

টেনেসি নদী কেণ্টাকি রাষ্ট্রের পাহুকা নামক স্থানে মিসি-সিপি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পাহুকা হইতে নক্সভিল

নদীপথে ৬৫০ মাইল। টেনেসি নদীর এই ৬৫০ মাইল খাদে বারমাস নয় ফুট গভীর জল রক্ষা করা উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের একটি বিশেষ দায়িত্ব। এই দীর্ঘ পথে বারমাস ষ্টীমার চলাচলের ব্যবস্থা হওয়ায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইতেছে।

উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ যে সরোবরমালা নির্মাণ করিয়াছেন তাহার জলধারণশক্তি জানুয়ারী মাসে এক কোটি কুড়ি লক্ষ একর-ফুট এবং এপ্রিল মাসে এক কোটি পাঁচ লক্ষ একর-ফুট। এই সরোবরশ্রেণীর দ্বারা টেনেসি রাষ্ট্রের ছাতানুগা অঞ্চলের বৃহত্তম বন্যাজলের উচ্চতা অন্ততঃ ১৬ ফুট নামাইয়া দেওয়া সম্ভব। এখন এই অঞ্চলে বন্যা অসম্ভব।

পূর্বেই বলা হইয়াছে মাস্‌ল শোলসের কেমিক্যাল কারখানা লইয়াই উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ কাজ আরম্ভ করেন। বর্তমানে এখানে যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে তন্মধ্যে ফস্‌ফরাস, এমোনিয়াম্‌ নাইট্রেট ও ক্যালসিয়াম কারবাইড প্রধান। উৎপন্ন রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ সামরিক প্রয়োজন মিটাইয়া জমিতে সাররূপে ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট। ক্যালসিয়াম কারবাইড কৃত্রিম রবার উৎপাদনেই ব্যবহৃত হয়।

আঞ্চলিক উন্নতি বিষয়েও উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা বহুমুখী ; যথা : (১) কৃষির উন্নয়ন, (২) বনের প্রসার ও উন্নতি, (৩) খনিজ সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি, (৪) বিশ্রাম ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, (৫) জনস্বাস্থ্য, (৬) মাছধরা ও শিকারের

ব্যবস্থা, (৭) ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার তারতম্য নির্দেশক মানচিত্র নির্মাণ, (৮) বিশেষ গবেষণা।

হৃতশক্তি ভূমির উর্বরতা কিরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায় সে বিষয়ে উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের কার্য বিশেষ প্রশংসার্হ। শাসন এবং বন প্রতিষ্ঠা পূর্বক ভূমিক্ষয় নিবারণ করিয়া, ফসলের পৌর্বাপর্য নির্ণয় করিয়া, ভূমির ক্ষয়িত উপাদান যথাসম্ভব বাতাস হইতে আহরণ করিয়া, এবং হিসাব করিয়া জমির ব্যবহার করতঃ কর্তৃপক্ষ কৃষির যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছেন। শুনিলাম জমির প্রয়োজনীয় যাবতীয় নাইট্রোজেন শুধু ফসলের পৌর্বাপর্য দ্বারাই পাওয়া যায়। সারের মধ্যে শুধু ফস্‌ফরাসই ইহারা ব্যবহার করেন। জনৈক কৃষিবিশেষজ্ঞ আমাকে বলিলেন যে ফসলের পৌর্বাপর্য নির্ণয়ই যে ব্যয়িত নাইট্রোজেন পুনঃপ্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট এ ধারণা তাঁহারা প্রাচ্য দেশ হইতেই পাইয়াছিলেন।

উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের যুদ্ধকালীন সাহায্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। যখন শত্রুপক্ষ এবং মিত্রপক্ষের এরোপ্লেন নির্মাণের আপেক্ষিক দ্রুততার উপর যুদ্ধজয় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছিল তখন উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় উৎপন্ন অফুরন্ত বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যেই অসংখ্য এরোপ্লেন ক্ষিপ্রতার সহিত নির্মাণ করিয়া যুদ্ধের গতি ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

এখানে অফুরন্ত বিদ্যুৎশক্তি ছিল বলিয়াই টেনেসি রাষ্ট্রের ওক্‌রিজ নামক স্থানে আণবিক গবেষণা সম্ভব হইয়াছিল।

যে আণবিক বোমা জাপানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা এই গবেষণারই ফল।

উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের কর্মচারিগণ বিমানগৃহীত ছায়াচিত্র হইতে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের ভূমির উচ্চতা নির্দেশক মানচিত্র নির্মাণ করিয়া দেন। এই মানচিত্রগুলি আক্রমণ পরিচালনায় বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

ছাঁচে ঢালা বাড়ী তৈরীর কার্যে উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের অভিজ্ঞতা যুদ্ধের সময় বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল।

মাস্‌ল শোলস্‌-এ যুদ্ধের জন্য প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী হইয়াছিল। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ডি-ডি-টি ও অন্যান্য সরঞ্জাম উপত্যকা-কর্তপক্ষের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল।

উপত্যকা-কর্তৃপক্ষকে অনেক দুর্গম পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে বাঁধ নির্মাণ করিতে হইয়াছে। সেজন্য সেইসব স্থানে প্রথমেই মজুরদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এই উপ-লক্ষেই তাহাদের ছাঁচে ঢালা বাড়ী নির্মাণ এবং ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের কার্যে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইয়াছে।

উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের উন্নতিমূলক কার্যব্যবস্থাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষি প্রভৃতির উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তথা রাষ্ট্রীয় সরকারের নানা বিভাগ বর্তমান। আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ কদাপি তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেন নাই; সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াই কাজ চালাইয়াছেন। অথচ

লোকে এখন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছে যে, সরকারী প্রচেষ্টা হইতে স্বতন্ত্র আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস অধিক ফলপ্রসূ।

সমস্ত জগতের উৎসুক দৃষ্টি বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির উপর নিবদ্ধ। বিভিন্ন দেশ হইতে ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিকর্মী, একাউণ্ট্যাণ্ট, অর্থনীতিবিদ্, শাসনপরিচালক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিশেষজ্ঞগণ ইহার কার্যপ্রণালী দেখিবার জন্য নক্সভিলে সমাগত হইতেছেন। আমাদের দামোদর উপত্যকা করপোরেশন ইহারই আদর্শে পরিকল্পিত হইয়াছে।

১২ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার—প্রাতরাশের পর বাহির হইয়া পড়িলাম। উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের আপিসে দুইটি গ্রীক ভদ্রলোকের সঙ্গে মিলিত হইলাম। তাঁহারা আমারই মত কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী দর্শন-মানসে আসিয়াছেন। তাঁহাদের নাম মাইকেলিডিস্ ও পেট্রিয়াস্। মাইকেলিডিস্ ইঞ্জিনীয়ার। পেট্রিয়াস্ আঙ্কিক, জলবিষয়ক অঙ্কে বিশেষজ্ঞ। আমরা ফণ্টান্না বাঁধ দেখিতে যাইব। কর্তৃপক্ষ জনৈক তরুণ ইঞ্জিনীয়ারকে আমাদের সঙ্গে দিলেন। যুবকটি গাড়ী চালাইয়া আমাদিগকে লইয়া চলিল।

সুন্দর মসৃণ রাস্তা। বিশাল প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। মাটি লাল। লোকালয় বিরল। দুই একটি গ্রাম্য নরনারী ক্বচিৎ দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। দু'পাশের ক্ষেত হইতে ভুট্টা কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। শুক্‌না ভুট্টার ডাঁটা খাড়া হইয়া

রহিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত পুনরায় চাষ করা হইয়াছে। চাষে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার দেখিলাম না। মাঝে মাঝে গরু বা ঘোড়া চরিয়া বেড়াইতেছে। শীতের প্রকোপ বেশী নয়। তাপ ৪০ ডিগ্রীর কাছাকাছি হইবে। চমৎকার রোদ উঠিয়াছে। মাঝে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। মনে হইতেছে যেন সাঁওতাল পরগণা বা ভুবনেশ্বরের প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। মেবিভিল ও এল্‌কোয়া নামক দুইটি ছোট শহর অতিক্রম করিলাম। শহর দুইটিতে 'এল্যুমিনিয়াম কোম্পানী অব আমেরিকা'র কর্মচারিগণের বসতি বিদ্যমান। কোম্পানীর নামের শব্দচতুষ্টয়েব প্রথমাংশ সন্নিবেশে দ্বিতীয় শহরটির নামকরণ হইয়াছে। ক্রমশঃ জমি উচু হইতে সুরু করিল। পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। ছোট টেনেসি নদীব পাশ দিয়া চলিয়াছি—দু'দিকে পাহাড়। রাস্তাব পাশ দিয়া নদী নৃত্যচ্ছন্দে চলিয়াছে। পথে কল্‌ডার উড বাঁধ, চিওয়া হ্রদ এবং সেন্টিনেলের একটি পাওয়ার হাউস দৃষ্টিপথে পতিত হইল। টেনেসি রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করিয়া নর্থ ক্যারোলাইন রাষ্ট্রের মধ্যে পড়িলাম। চারিদিকে পাহাড়। এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ পাহাড়ের উচ্চতা নাকি প্রায় ৬০০০ ফুট। তরঙ্গায়িত পাহাড় ভেদ করিয়া চলিয়াছি। প্রায় দু' হাজার ফুট উচ্চে ফান্টানা বাঁধ। ফান্টানা বাঁধ নক্সভিল হইতে ৭০ মাইল। প্রায় দ্বিপ্রহরে তথায় উপনীত হইলাম। ছোট নদীটির উপর একটি ছোট সেতু। সেতুটি সম্পূর্ণ খোলা, ঈষৎ বক্র। প্রায়

১০০০ মাইল ব্যাসার্দ্ধের বৃত্তপরিধির মত ইহার বক্রতা। এই বক্রতাটুকু সেতুটিকে বেশ সুদৃশ্য করিয়াছে। এপারে উচ্চ পাহাড়। ওপারে পাহাড়ের গায়ে ইঞ্জিনিয়ারগণের আপিস। সেখানকার দুইজন ইঞ্জিনিয়ারের সহিত মিলিত হইলাম। বাঁধের কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন সামান্য টুকিটাকি কাজ চলিতেছে। বাঁধটি সম্পূর্ণ কংক্রিটের। ৪৮০ ফুট উঁচু; অর্থাৎ মিশরের পিরামিডের সমান ইহার উচ্চতা। ইহার পিছনে সুবিশাল হ্রদ কাটানো হইয়াছে; সম্মুখে বিবাট পাওয়ার হাউসে সগর্জনে টারবাইন ঘুরিতেছে। স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ প্রথমে চিত্র ও নক্সার সাহায্যে বাঁধেব পরিকল্পনাটি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। কিরূপে এই পর্বতসঙ্কুল নির্জন অরণ্যময় প্রদেশকে ম্যালেরিয়ার কবলমুক্ত করা হইল; কিরূপে ছাঁচে ঢালা সুন্দর সুন্দর বাড়ী আনিয়া বসান হইল; কিরূপে নানাবিধ সুবিধা ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া এখানে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হইল; কিরূপে সেই গ্রামে মজুর ও ইঞ্জিনিয়াবগণের বসতি স্থাপন করা হইল; কিরূপে বাঁধের যাবতীয় উপকরণ এখানে আনিবার ব্যবস্থা করা হইল; স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ এই সমস্ত বিষয় আমাদিগকে বলিলেন। তারপর আমাদিগকে পার্শ্ববর্তী সেই গ্রামে লইয়া গেলেন। ছাঁচে ঢালা বাড়ীগুলি দেখিতে বেশ মনোরম। বাড়ীগুলির মধ্যে বাসোপযোগী সমস্ত ব্যবস্থাই আছে। বাড়ীগুলি এখন খালি পড়িয়া আছে। ভ্রমণকারিগণ যাহাতে এ জায়গার প্রতি আকৃষ্ট হয় সেজন্য

কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এখনও সফল হন নাই। লোকালয় হইতে বহুদূরে এই নির্জন পর্বতময় স্থানে বাস করা আপাততঃ কাহারও মনঃপূত হইতেছে না। গত গ্রীষ্মকালে এক নবদম্পতি নাকি শিকাগো হইতে আসিয়া মাসাধিককাল এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন।

গ্রামের কেফিটেরিয়াটি এখনও আছে। খাবার সাজাইয়া বিক্রয়কারিণীগণ বসিয়া আছেন। ক্রেতা নাই। এখানে আমরা মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিলাম। অন্য কোন ভোজনার্থী দেখিলাম না। আহার ভালই হইল। আহারান্তে বাঁধে উঠিলাম। স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ সোৎসাহে আমাদিগকে সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। এই জনবিরল প্রদেশে আমাদিগকে পাইয়া তাহাদের উৎসাহ ও আনন্দের সীমা নাই। মাইকেলিডিসের প্রশ্নে তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং আমারও বিষয়টি বুঝিবার অনেক সুবিধা হইল। মাইকেলিডিস বেশ ইংরেজী বলেন। পেট্রিয়াস ভাল ইংরেজী বলিতে পারেন না, কাজেই তাঁহাকে প্রায়ই নীরব থাকিতে হইতেছে। বাঁধের উপর দর্শকগণের বসিবার জন্য একটি সুন্দর ঘর আছে। সেটি গোল্ডেন বাফ বা স্বর্ণাভ মর্মরে নির্মিত। এ প্রদেশে বহুবিধ মর্মর পাওয়া যায়। তন্মধ্যে স্বর্ণাভ মর্মরই সর্বাপেক্ষা সুদৃশ্য। এই কার্যে মর্মরের ব্যবহার শুধু ধনকুবেরের দেশ আমেরিকায়ই সম্ভব। বাঁধের রক্ষী সোৎসাহে তাঁহার বইয়ে আমাদের সই লইয়া গেল। কলিকাতা

হইতে দর্শক আসিয়াছে শুনিয়া তাহার উৎসাহ দ্বিগুণ হইয়াছে। দিনান্তে ক্লান্ত দেহে হোটেলে ফিরিলাম।

পরদিন শুক্রবার সকালে উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের আপিসে পুনরায় হাজির হইলাম। এই দিনের মধ্যে আমার এখানকার কাজ শেষ করিতে হইবে। কাজেই সমস্ত বিভাগ দেখা সম্ভব নয়। বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি বিভাগের কার্য দেখিলাম। প্রথমে বাজেট বিভাগের সি. ডব্ল্যু. ফোর্স মহাশয়ের সঙ্গে ইঁহাদের বাজেট সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিলাম। পরে চলচ্চিত্রে কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কার্যকলাপ ইঁহারা আমাকে দেখাইলেন। মধ্যাহ্নভোজনের পর হিসাব বিভাগ, বাণিজ্য বিভাগ, কৃষি ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ এবং ফুড্ ফ্রিজিং বা খাদ্য জমান বিভাগের কার্যাবলী দেখিলাম। হিসাব বিভাগে জনৈক মাদ্রাজী ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইনি মাদ্রাজের একটি হাইড্রোইলেকট্রিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিরূপে বিদ্যুৎসরবরাহের দাম নির্ণয় করা হয় তাহা দেখিবার জন্য ইনি এখানে আসিয়া মাসাধিককাল আছেন। ভদ্রলোকটি আধাবয়সী, এঁদের নিয়মাবলী সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে দেখিলাম। বৈদ্যুতিক শক্তিকে সুলভ করিয়া কৃষকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিবার জন্য ইঁহাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা দেখিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। যে কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল সকলেই অমায়িক, সকলেই তাঁহাদের কার্যাবলী আমাকে বুঝাইবার জন্য উৎসুক। ইঁহাদের মধ্যে

কৃষি-ইঞ্জিনিয়ার এল. এন্. বেকার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা ও সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের "হিন্দু ভিউ অব লাইফ" পড়িতে পরামর্শ দিলাম।

পরদিন শনিবার। আপিস আদালত ছুটি। হোটেলে বসিয়া কিছু কাজ করিলাম। পরে শহর দর্শনে বাহির হইলাম।

শহরের মধ্য দিয়া টেনেসি নদী প্রবাহিত। তাহারই অনতিদূরে আমার হোটেল। হোটেলের নাম এণ্ড্রু জনসন্। এণ্ড্রু জনসন এব্রাহাম লিঙ্কনের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট। তিনি টেনেসি রাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন। হোটেলটি ১৭।১৮ তলা হইবে। আমি ১৬ তলায় ছিলাম। শহরটি ছোট। প্রায় ৭৫ হাজার লোকের বাস। ১৭।১৮ তলা বাড়ী আর নাই। ১৬ তলার উপরে বসিয়া আমি নদীর তীর দিয়া বহুদূর বিস্তৃত শহরের সুবিন্যস্ত সৌধশ্রেণী দেখিতাম। সমস্ত আমেরিকান শহরের মত এটিও সরল ও সমান্তরাল রাজপথশ্রেণী দ্বারা পরিশোভিত। হোটেলের সম্মুখ দিয়া যে রাস্তাটি গিয়াছে তাহাই শহরের বড় রাস্তা। দু'ধারে শ্রেণীবদ্ধ দোকান। বড়দিন আগতপ্রায়। তদুপলক্ষে দোকান ও রাস্তা সুসজ্জিত। আলো ও রঙীন কাগজ প্রভৃতির সাহায্যে সুন্দর সজ্জা রচনা করা হইয়াছে। করুণাবতার সান্তা ক্লজের শ্মশ্রুল ছবি সর্বত্র। সান্তা ক্লজ সাজিয়া কেহ বড়দিনে ছেলেপেলেদের উপহার

দিবার জন্য বহু অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। ছেলেবুড়ো সকলেই বড়দিনে কিছু কিছু উপহার পাইবে। সর্বত্র আশা ও আনন্দের আভাস।

এখানে ভার্জিনিয়া তামাকের একটি বাজার আছে। কৃষকগণ স্ব স্ব তামাক আনিয়া এখানে নিলামে বিক্রয় করে। সিগারেট প্রস্তুতকারকগণ আসিয়া এই তামাক কিনিয়া লইয়া যায়। এখানে প্রচুর ও রকমারি খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়।

১৩ সংখ্যাটির প্রতি ইহাদের কুসংস্কার নানা ব্যাপারে পরিস্ফুট। হোটেলে ১৩ নম্বরের কোন তলা নাই। বারোর পরেই চোদ্দ। ১৩ তলায় থাকিলে নাকি ভাগ্যহানি হয়।

ঐদিন রাস্তায় অপর একজন ভারতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইনি যুক্তপ্রদেশের অধিবাসী। দিল্লীর কৃষিগবেষণাগারে কাজ করেন। কৃষিগবেষণা সম্বন্ধে ওয়াকিব্‌হাল হইবার জন্য এদেশে কয়েকমাস যাবৎ সফর করিতেছেন। ইঁহার বয়স চল্লিশের বেশী হইবে।

পর দিবস রবিবার নক্সভিল ত্যাগ করিয়া শিকাগো রওনা হইব। দুপুরে প্লেন ছাড়ে। কোম্পানীর গাড়ী হোটেল হইতে আমাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে। প্রস্তুত হইয়া লাউঞ্জে বসিয়া আছি। সেখানে মাইকেলিডিস ও পেট্রিয়াসের সঙ্গে অনেক কথা হইল। প্রাচীন কালে সভ্যতার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত গ্রীস ও ভারতবর্ষ এই দুই দেশের যোগাযোগের কাহিনী জানিবার জন্য ইঁহাদের আগ্রহ লক্ষ্য করিলাম।

আমাদের তারিখযুক্ত ইতিহাস যে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের ভ্রমণবৃত্তান্তই যে তৎকালীন ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ ইহা শুনিয়া তাঁহাদের আগ্রহ বর্ধিত হইল। কথোপকথনের মধ্যে অলক্ষিতে ইঁহাদের সঙ্গে আমার চিত্তের যোগ স্থাপিত হইয়া গেল।

গাড়ী আসিয়া আমাকে তুলিয়া লইল। সে গাড়ীতে আর একটি আমেরিকান ভদ্রলোক অন্য একটি হোটেল হইতে উঠিলেন। উভয়ে সীমাহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া বিমান ঘাটির দিকে চলিয়াছি। ভদ্রলোকটি মধ্যাহ্নভোজনাদির পর একটু আলাপেচ্ছু হইয়া উঠিয়াছেন। নানা বিষয়ে কথা বলিয়া চলিয়াছেন, মাঝে মাঝে বলিতেছেন—"আমি বেশী কথা বলিয়া আপনার বিরক্তি উৎপাদন করিতেছি না তো?" সুন্দর রৌদ্র। আকাশ পরিষ্কার। তাপ ৪০° ডিগ্রির কাছাকাছি। ভদ্রলোকটি বলিলেন: "শীতকালে বসন্তের আবির্ভাব হইয়াছে।" উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের কথা উঠিল। ভদ্রলোকটি বলিলেন: "পূর্বে লোকে বলিত যে উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ পাগলের মত বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়াই চলিয়াছেন। এত বিদ্যুৎ কোন্ কাজে লাগিবে? যুদ্ধ আসিল। সব বিদ্যুৎ কাজে লাগিয়া গেল। কিন্তু উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ এখন এক আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এই বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ওক্‌রিজে আণবিক গবেষণার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে দিন আণবিক

শক্তি সুপ্রতিষ্ঠ হইবে সেদিন তো বৈদ্যুতিক শক্তির দিন ফুরাইবে। আণবিক গবেষণার ব্যবস্থা করিয়া উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ নিজেদের মৃত্যুই ডাকিয়া আনিতেছেন।”

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্য-পশ্চিম

আমেরিকাকে পূর্ব পশ্চিমে চারি অংশে বিভক্ত করা হইযাছে। আটলান্টিক উপকূলে নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি স্থান পূর্বাঞ্চল। শিকাগো ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ মধ্য-পশ্চিাঞ্চল। তাহার পশ্চিমে পার্বত্য অঞ্চল। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী প্রদেশ পশ্চিমাঞ্চল। এই চারিটি অঞ্চলে চারি প্রকার সময় অনুসৃত হয়। দুইটি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে সময়েব পার্থক্য এক ঘণ্টা। নিউ ইয়র্কে যখন সকাল ১০টা, তখন শিকাগোতে সকাল ৯টা, পার্বত্য প্রদেশে সকাল ৮টা, এবং পশ্চিম প্রদেশে সকাল ৭টা। আটলান্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত আমেরিকার বিস্তার ৩০০০ মাইল।

নক্সভিল হইতে শিকাগোর দূরত্ব সিধা পথে বেশী নয়। কিন্তু আমি ওয়াশিংটন হইয়া যাইব। ওয়াশিংটনে বিমান বদল করিতে হইবে।

১৫ই ডিসেম্বর রবিবার বৈকাল আড়াইটায় নক্সভিল বিমানঘাঁটি হইতে বিমান উড়িল। বিমানটি একঘণ্টা বিলম্বে চলিতেছিল। ওয়াশিংটনে গিয়া শিকাগোর বিমান পাইব কি না সন্দেহ।

সাড়ে চারিটারও পরে ওয়াশিংটন বিমানঘাটিতে নামিলাম। শিকাগোর বিমান তখন প্রস্তুত। সোজা সেই বিমানে গিয়া উঠিলাম। পাঁচটায় বিমান উড়িল। রাত্রি নয়টা নাগাদ শিকাগো পৌঁছিবে। দূরত্ব প্রায় ৮০০০ মাইল। এর মধ্যে বিমান কোথাও নামিবে না। সন্ধ্যার অন্ধকারে পৃথিবী ও আকাশ আবৃত হইল। অন্ধকার ভেদ করিয়া বিমান সগর্জনে ছুটিয়াছে। বাক্‌চতুরা ষ্টুয়ার্ডেস যাত্রীগণের সঙ্গে নানাবিধ আলাপ করিয়া তাহাদের চিত্তবিনোদন করিতেছেন। তাঁহার ধারণা তাজমহল একটি দেবমন্দির। ইহা একটি স্ত্রীলোকের সমাধি-মন্দির শুনিয়া ভারতীয় স্ত্রীজাতির পোষাক-পরিচ্ছদ ও কাজকর্মাদি সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করিলেন। ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা কাজের উপযোগী খাটো কাপড় পরিয়া এরোপ্লেনের ষ্টুয়ার্ডেস্ হয় কিনা, অভিজাত সমাজের রুচিসম্মত আভূমি-বিলম্বিত পোষাক-পরিবার সুযোগই বা তাহাদের কিরূপ ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছিলেন। বিমানটি মাঝে মাঝে আলোকোদ্ভাসিত এক একটি সহর অতিক্রম করিতেছিল। তন্মধ্যে পিটস্‌বার্গের দৃশ্য সত্যই অপরূপ। কি অপূর্ব আলোকসজ্জা! রঙে ও উজ্জ্বলতায় তাহা অতুলনীয়।

রাস্তা ও বাড়ীগুলি সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রাস্তা দিয়া আলো ছড়াইয়া মটর ছুটিতেছে। স্থানে স্থানে আলোকমালা জ্বলিতেছে ও নিবিতেছে। যাত্রীগণ সে রমণীয় দৃশ্য হইতে চোখ ফিরাইতে পারিতেছেন না। অন্ধকার মহাসমুদ্রে দ্বীপের মত জাগিয়া থাকা ক্লিভল্যাণ্ড প্রভৃতি আরও কয়েকটি সহর অতিক্রম করিলাম। যেন অনন্ত মহাশূন্যের মধ্য দিয়া উড়িতেছি। মাঝে মাঝে এক একটা ব্রহ্মাণ্ড সেই মহাশূন্যে ভাসিতেছে। তারকাখচিত আকাশের নীচে তাহাই ক্বচিৎ কখনো দৃশ্যমান হইতেছে, আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে।

সহসা পরিষ্কার আকাশে মেঘোদয় হইল। শিকাগোর নিকটবর্তী হইতেছি। ষ্টুয়ার্ডেস্ সকলকে বলিয়া গেলেন যে শিকাগোতে বরফ পড়িতেছে। সেখানে বিমান নামিতে পারিবে না।

শতাধিক মাইল দক্ষিণে ইণ্ডিয়ানা পলিস্ বিমানঘাটিতে বিমান নামিল। যাত্রীগণের মধ্যে অনেকেই প্রভাতে শিকাগো পৌঁছিবার জন্য উদ্বিগ্ন। বিমানের কর্মচারিগণ খবর লইয়া বলিলেন যে শীঘ্রই শিকাগো যাইবার ট্রেন আছে। যাত্রীগণ দ্রুত স্ব স্ব মাল খালাস করিয়া লইলেন। ঘাটির কর্মচারিগণ ভাড়ার কিয়দংশ যাত্রীদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বাসে করিয়া তাহাদিগকে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিলেন।

মাল খালাস করিতে যাইয়া দেখি আমার মাল আসে নাই। বুঝিলাম ওয়াশিংটনে সময়াভাবে মালের প্লেন বদল

সম্ভব হয় নাই। এবার আমার কাগজপত্রের এবং প্রসাধনের থলিদ্বয় হাতেই রাখিয়াছিলাম। মনে করিলাম বড় থলি দুইটি ওয়াশিংটন হইতে পরবর্তী প্লেনে শিকাগো পৌঁছিবে। ভালই হইবে। ঘাটির আপিসে আমার শিকাগোর ঠিকানা লিখাইয়া দিয়া অন্যান্য যাত্রীগণের সঙ্গে ষ্টেশনগামী বাসে গিয়া উঠিলাম, বাস আলোকজ্জ্বল নগরীর মধ্য দিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিল।

এখানে রেলের প্রধানতঃ দুই শ্রেণী। কোচ এবং পুলম্যান্। পুলম্যানের মধ্যে দিনে প্রত্যেককে একটি করিয়া সোফা দেওয়া হয়। এরূপ সোফাসজ্জিত গাড়ীকে পার্লার কার বা বৈঠকখানা গাড়ী বলে। রাত্রে পুলম্যানের মধ্যে রকমারি বন্দোবস্ত থাকে। কোন গাড়ীতে শুধু শুইবার বার্থ থাকে। নীচের বার্থের ভাড়া কিছু বেশী। দিনের পার্লার কারই রাত্রে বার্থে পরিণত হয়। কোন গাড়ী কতকগুলি বেড রুম বা শয়ন কক্ষে বিভক্ত। এক একটি ছোট ছোট শয়নকক্ষে দুইটি করিয়া বার্থ এবং আলাদা বাথরুম। দিনে এই বার্থগুলি সোফায় পরিণত হয়। সমস্ত ট্রেনে একটি ক্লাব কার বা মিলনকক্ষ এবং একটি রেষ্টুর‍্যান্ট কার বা ভোজনকক্ষ থাকে। ক্লাব কারে যাত্রীগণ একত্র বসিয়া কথাবার্তা বলেন বা পুস্তকাদি পাঠ করেন। গাড়ীর মধ্যে পুস্তক ও মাসিকপত্র ইত্যাদি থাকে। কোচে শুধু বসিবার স্থান। তবে প্রত্যেক আসনেই পুরু ও কোমল গদি আঁটা। বার্থ বা শয়নকক্ষে কোম্পানী সম্পূর্ণ বিছানা দেয়। কোচে কোন বিছানা নাই।

কোচ ভিন্ন অন্য কোন গাড়ীতে স্থান পাওয়া গেল না। কোচের প্রত্যেক যাত্রী দুইটি করিয়া আসন পাইলেন। কোম্পানী কিঞ্চিৎ ভাড়া লইয়া কোচের যাত্রীগণকে বালিশ সরবরাহ করেন। এক ব্যক্তি কতকগুলি বালিশ আনিয়া গাড়ীর মধ্যে হাঁকিয়া গেল: "ভাল ঘুম, ভাল স্বপ্ন, চাই বালিশ"। একটি বালিশ লইলাম বটে। তবে ভাল ঘুমও হইল না, ভাল স্বপ্নও দেখিলাম না। ট্রেন যখন শিকাগো পৌঁছিল তখন ফর্সা হইয়া আসিতেছে। ট্যাক্সি লইয়া হোটেলে চলিলাম।

সমস্ত শহর বেশ পুরু বরফে ঢাকা। রাস্তা দিয়া যে মোটর গাড়ীগুলি যাইতেছে তাহাদের উপরে ৪।৫ ইঞ্চি পুরু বরফ। সারারাত্রি জাগিয়া মিউনিসিপ্যালিটির লোক রাস্তার বরফ ঠেলিতেছে। তাহাতে রাস্তাব দুই পাশে উঁচু বরফের লাইন সৃষ্টি হইয়াছে। মাঝে মোটর চলিবার মত খানিকটা রাস্তা। তাহাও অবশ্য বরফে আর্দ্র ও পিচ্ছিল। এ বছব এই প্রথম বরফ পড়িল। তবে প্রথম দিনই মাত্রাটা একটু বেশী।

শিকাগো বিরাট শহর। ইহার লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ। সমগ্র আমেরিকার মধ্যে নিউ ইয়র্কের পরেই ইহার স্থান। ব্যবসায়কেন্দ্র হিসাবে নিউ ইয়র্ক অদ্বিতীয় হইলেও শিল্পকেন্দ্র হিসাবে শিকাগোরই প্রাধান্য অধিক। আমেরিকার বড় বড় কলকারখানা এই অঞ্চলে এবং তাহাদের প্রধান কার্যালয় প্রায়ই শিকাগো শহরে। শীতের দিনে আকাশ হইতে পতিত

যে রজতশুভ্র হিমকণা শহরটিকে আবৃত করিয়া ফেলে তাহা শীঘ্রই এখানে ধূম্রমলিন হইয়া যায়। ইহা আমেরিকার বৃহৎ বাণিজ্যের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র। রিপাবলিকান দলের প্রভাব এখানে খুব বেশী। ইহা ইলিনয় রাজ্যের অন্তর্গত কিন্তু রাজ্যের রাজধানী অন্যত্র। সরকারী আপিস এখানে বিশেষ নাই। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পাবলিক্ ডেট্ আপিস এই শহরে বিদ্যমান। নগরোপকণ্ঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট হর্ম্যরাজি। শহরের চারিদিক হইতে অনবরত বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীগুলি যাতায়াত করিতেছে। ইহারা ঘনসন্নিবিষ্ট ষ্টেশনসমূহে বিপুল জনস্রোত ক্রমাগত কবলিত করিতেছে, আবার উদ্গীরণ করিতেছে। যাতায়াতের ইহাই প্রশস্ত উপায়। মাটির নীচে কোন লাইন নাই। এখানে খুব বড় বড় ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরস্ আছে। এই ষ্টোরগুলির ডাকে কারবার যথেষ্ট। বড়দিনের প্রাক্কালে এগুলির বিক্রয় পূরাদমে চলিতেছিল। এবার যুদ্ধের পর বিক্রয়ের হার খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। খবরের কাগজে রোজই এ বিষয়ে তথ্যপ্রকাশ ও আলোচনা চলিতেছিল। এখানকার মার্শাল ফিল্ডের ষ্টোর সমধিক প্রসিদ্ধ। স্প্রিংফিল্ডে এক পদস্থ ব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন: "এ যেন মার্শাল ফিল্ডের বিল পরীক্ষা করা। ইহার আয় যে স্তরে সেখানে বেশী আমদানী সত্ত্বেও আয়-কর দিয়া কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। ইহার বিল পরীক্ষা করিয়া সময় নষ্ট করা মূর্খতা।"

আমি যে হোটেলে ছিলাম তাহার নাম ব্লাক্‌ষ্টোন হোটেল। হোটেলটি সুপ্রসিদ্ধ; শহরের শ্রেষ্ঠ রাজপথ মিসিগ্যান এভিনিউতে অবস্থিত। হোটেলটি ১৮ তলা। আমি ছিলাম ১৪ তলায়। প্রকাণ্ড হোটেল। ওয়াশিংটন বা নক্সভিলের হোটেল হইতে এই হোটেলে কর্মব্যস্ততা অনেক বেশী দেখিতেছি। ভোজনকক্ষের শোভা, পরিবেশন-নৈপুণ্য এবং খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য তুল্যরূপেই চিত্তাকর্ষক। লাউঞ্জ কক্ষটি নাতিবৃহৎ; আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে সুসজ্জিত। বড়দিনের সজ্জার দুইটি বিশেষত্ব—খ্রীষ্টমাস তরু ও সান্তা ক্লজের মূর্তি। মধ্যস্থলে একটি বড় খ্রীষ্টমাস তরু জরি ও আলোকমালা দ্বারা শোভিত। এটা একটা বড় পাইন গাছের ডাল; শীতে তাহার ঘনসবুজ পাতা একটিও পড়ে নাই। পাতাব উপর মাঝে মাঝে সাদা রাঙতা বসান। মনে হইতেছে যেন পাতার উপর বরফ পড়িয়াছে। নানা রঙেব আলো গাছেব শাখা-প্রশাখায় লগ্ন। গাছটিকে ঘরের মধ্যস্থলে একটি বরফেব স্তূপের মধ্যে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। অপব কোণে করুণাবতার সান্তা ক্লজের সহাস্য শ্মশ্রুল মূর্তি। নিশাকালে আলোকোদ্ভাসিত মুখখানি স্বতঃই ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া যেন আগন্তুকদিগকে স্বাগত করিতেছে। ঘরটি ইতস্ততঃ-সঞ্চরমান সুদর্শন নরনারী সমাগমে পুলকোজ্জ্বল।

ভোজনকক্ষে একটি পরিবেশকের সঙ্গে আলাপ হইল। সে ব্রিটিশ আর্মির সঙ্গে বোম্বাই গিয়াছে; কিছুদিন ব্রিটিশ

উপনিবেশ ট্রিনিদাদে বাস করিয়াছে। ইহার মতে ব্রিটিশরা যে-হারে বেতন দেয় তাহা তাহাদের মারাত্মক অবিবেচনা ও নির্মমতার পরিচায়ক। এদেশে বর্তমানে দারিদ্র্য-সমস্যা দেখিতেছি না। বেকার কেহ নাই। মজুরীর সর্বনিম্ন হার মাসিক ১৭৫ ডলার বা প্রায় ৬০০৲ টাকা। শুধু সাধারণ কায়িক পরিশ্রমেরই এই মূল্য। বাড়ীতে চাকর রাখিবার প্রথা নাই বলিলেই হয। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ করে। তাহাতে লজ্জা বা মর্যাদাহানি হয় না। চাকরের মাহিনা মাসিক প্রায ২০০ ডলার। সাধারণতঃ শ্রমিকগণ সপ্তাহে ৫ দিনে মোট ৪০ ঘণ্টার বেশী খাটে না। শনি ও রবিবার দুই দিন পূরা ছুটি। অন্য দিন আট ঘণ্টা করিয়া খাটিবার নিয়ম। যন্ত্রপাতির ব্যবহার এদেশে খুব বেশী। নিজেরাও যন্ত্রের মত নিয়মানুবর্তী ও কঠোর পরিশ্রমী। অল্প পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন করে বলিয়া ইহাদের মজুরীর হার এবং বিশ্রামের সময় উভয়ই খুব বেশী। এদেশের ট্রেড ইউনিয়ন কদাপি যন্ত্রের বিরোধিতা করে না। ইহারা জানে যে যন্ত্র ব্যতীত উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়; আর উৎপাদন বৃদ্ধি না করিয়া মজুরী ও বিশ্রামকাল বৃদ্ধির আশা করা মূর্খতা। বদ্ধিত উৎপাদনের উপযুক্ত অংশ হইতে মজুরগণ যাহাতে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে অবশ্য ইহাদের কড়া নজর। ট্রেড ইউনিয়নগুলি বড় বড় অর্থনীতিবিদ্ ও সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ নিযুক্ত করিয়া সর্বদা হিসাব রাখে কি হারে মজুরের উৎপাদন-শক্তি বাড়িতেছে। তদনুসারে ইহারা

মজুরীবৃদ্ধি দাবি করে। ১৯৪৫ সালের নবেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কের ১৮১৯ নং ব্রডওয়েতে অবস্থিত ন্যাশন্যাল ব্যুরো অব ইকনমিক্ রিসার্চ মার্কিন শিল্পে শ্রমসংক্ষেপ বিষয়ে একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। নিবন্ধটির নাম "লেবর সেভিং ইন্ আমেরিকান ইন্ডাষ্ট্রি, ১৮৯৯-১৯৩৯"—লেখক সোলোমন ফেব্রিক্যান্ট। তাঁহার হিসাব মত ১৮৯৯ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় শ্রমিক-পিছু জাতীয় উৎপাদন ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ে সাপ্তাহিক শ্রমকাল উৎপাদন-শিল্পে পঞ্চমাংশ হ্রাস পাইয়াছে। ফলতঃ, প্রতি জনের ঘণ্টায় উৎপাদন শত শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে বা ঠিক দ্বিগুণ হইয়াছে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক ঘণ্টা খাটিয়া ১৮৯৯ সালে যত মাল উৎপাদন করিত ১৯৩৯ সালে করিত তার দ্বিগুণ।

এই দারিদ্র্যহীন দেশে কম্যুনিজমের প্রভাব নাই। ইহারা যে হারে মজুরী দেয় এবং এখানে মজুরগণ সপ্তাহে যত বিশ্রামকাল প্রাপ্ত হয় তাহা রাশিয়ায় মজুরদের স্বপ্নাতীত। শিকাগো পরিত্যাগ করিবার পর একটি কাগজে দেখিয়াছিলাম যে শিকাগোর জনৈক বড় ব্যবসায়ীকে একটি কাগজে কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন বলিয়া অভিহিত করায় উক্ত ভদ্রলোকটি কাগজের নামে আদালতে মানহানির মোকদ্দমা করিয়া ডিগ্রি পাইয়াছেন।

শিকাগোর যে বাড়ীটিতে আমার প্রধান কর্মস্থল ছিল তাহা পূর্বে ষষ্টিতম ষ্ট্রীটের ১৩১৩ নম্বর বাড়ী। বাড়ীটি

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনতিদূরে, শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। এই বাড়ীটিতে সাতটি এসোসিয়েশন্ বা সমিতির মূল আপিস। তাহাদের নাম ও বিবরণ এইরূপ :

১। কাউন্সিল্ অব্ ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট বা প্রাদেশিক সরকার পরিষদ্। আমেরিকার ৪৮টি ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ, আলোচনা ও গবেষণা চালানই এই পরিষদের কাজ।

২। পাব্লিক্ এ্যাড্মিনিষ্ট্রেশন সার্ভিস বা সরকারী শাসনপ্রণালীর সহায়ক সমিতি। সরকারী শাসনপ্রণালীর সংস্কার সাধনপূর্বক কিরূপে উহাকে উন্নততর করা যায় তাহাই ইঁহাদের গবেষণার বিষয়। ইঁহাদের নিযুক্ত সুনিপুণ তথ্যবিশারদ ও তত্ত্বজ্ঞগণ রহিয়াছেন। ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটিগুলি নিজেদের শাসনপ্রণালীর সংস্কার-মানসে এই সমিতির সাহায্য চাহিলে ইঁহারা গিয়া সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন।

৩। ফেডারেশন অব্ ট্যাক্স অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরস্ বা কর-নিয়ামকদের সমিতি। আমেরিকার সমস্ত রাষ্ট্রের কর নিয়ন্ত্রণাদি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব এখানে সংগৃহীত হয়।

৪। ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব্ এসেসিং অফিসারস বা করনির্ধারক কর্মচারিগণের জাতীয় সমিতি। আমেরিকার সমস্ত নগরে মিউনিসিপ্যাল কর কিরূপে ধার্য হয় এবং তদর্থে বাড়ীর মূল্য নির্ধারণ কিরূপে করা হয় ইঁহারা সে বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ ও তত্ত্বালোচনা করেন।

৫। সিভিল সার্ভিস এসেম্ব্লি বা সরকারী চাকুরিয়া সমিতি। সরকারী চাকরিকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করিয়া কিরূপে শুধু গুণমূলক করিয়া তোলা যায় ইঁহারা সেই বিষয়ে চিন্তা করেন।

৬। আমেরিকান সোসাইটি অব্ প্ল্যানিং অফিসিয়ালস্ বা মার্কিন পরিকল্পনাকারী কর্মচারিগণের সমিতি। সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা দ্বারা কিরূপে রাষ্ট্রের উন্নতিসাধন করা যায় ইহারা সে বিষয়ে গবেষণায় রত আছেন।

৭। পাব্লিক এডমিনিষ্ট্রেশন্ ক্লিয়ারিং হাউস বা সরকারী শাসন বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ ভবন। প্রথমোক্ত ছয়টি সমিতি যত গ্রন্থ প্রণয়ন বা নিবন্ধাদি রচনা করেন এই সমিতি সেগুলি প্রকাশ ও বিক্রয় করেন।

প্রত্যেকটি সমিতির সদস্য-সংখ্যা সহস্রাধিক। সরকারী কর্মচারী, অধ্যাপক ও ব্যবসায়ীগণ ইঁহাদের সদস্য। সদস্য-গণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও চিন্তা দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ের উপর যে আলোকপাত হয় তাহাতে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।

আমেরিকার বাহিরে এই জাতীয় গবেষকমণ্ডলী কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের আলোচনা দ্বারা যে কোন দৈনন্দিন কার্যের উন্নতিসাধন চেষ্টা এদেশের একটি বিশেষত্ব। এই সমস্ত সমিতির কর্মিগণ স্ব-স্ব কার্যে সর্বদা মনোযোগী। প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটিনাটি সংবাদ

ইহাদের নখদর্পণে। ইহাদেব সঙ্গে নানা বিষয়ে দিনের পর দিন আলোচনা করিয়া বহু জ্ঞানলাভ করিয়াছি। ইঁহারাও আমাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরম যত্নসহকারে আমার সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিয়াছেন। কখনও কখনও প্রশ্ন করিয়া ভারতবষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমার নিকট হইতে জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহারা এক দিন আমাকে বলিলেন, "এদেশে বর্তমানে ভারতীয় ছাত্র পূর্বাপেক্ষা বেশী আসিতেছে। তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন দেখিতেছি। পূর্বে ইহারা সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি পড়িত; এখন কাজ শিখিবার দিকেই ঝোঁক বেশী।"

১৩১৩ নম্বরের বাড়ীর অদূরেই বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়। বহুদূব ব্যাপিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধশ্রেণী। এখানে একটি বইয়ের দোকানের শো রুমে জবাহরলালের "ডিস্‌কভারি অব্‌ ইণ্ডিয়া" দেখিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেফিটেরিয়ায় প্রায়ই মধ্যাহ্নভোজন করিতাম। আসন্ন বড়দিন উপলক্ষ্যে কেফিটেরিয়ার প্রবেশকক্ষ খ্রীষ্টমাস তরুদ্বারা সজ্জিত।

কয়েকটি ভারতীয় ছাত্র দেখিলাম। ১৩১৩ নং বাড়ীতে সস্ত্রীক মুজেন সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়। ইনি ব্রেজিল নিবাসী পদস্থ সরকারী কর্মচারী। ব্রেজিলের অনেক কথা ইহাদের নিকট শুনিতাম। মুজেন-পত্নী আমার দশবর্ষীয়া কন্যার সম্বন্ধে প্রায়ই প্রশ্ন করিতেন।

১৯শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বৈকালে মার্কিন সরকারের

পাবলিক ডেট আপিস দেখিতে যাই। যে বাড়ীর একাংশে আপিসটি অবস্থিত তাহার নাম মার্চাণ্ডাইস্ মার্ট বিল্ডিং। বাড়ীটি শহরের কেন্দ্রস্থলে—নদীতীরে। সেতু পার হইয়াই ইহার সদর। অত্যুচ্চ বিরাট বাড়ী—১৮ তলা বিশিষ্ট। অসংখ্য দোকান ও আপিস এই বাড়ীতে অবস্থিত। এই বাড়ীটি পৃথিবীর বৃহত্তম বাড়ী বলিয়া পরিচিত। নিউ ইয়র্কের ১০২ তলা এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিংও নাকি ইহা অপেক্ষা ছোট।

মাত্র ১৮ তলা বাড়ীটি পৃথিবীর বৃহত্তম বাড়ী কিনা সে বিষয়ে আমার মনে অবশ্য কিছু সংশয়ের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু এই পাবলিক ডেট আপিস যে পৃথিবীর বৃহত্তম পাব্‌লিক ডেট আপিস সে বিষয়ে কেহ বলিয়া না দিলেও আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম। গত বিশ্বযুদ্ধ চলিয়াছিল আমেরিকার টাকায়। আর সেই টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল এই পাব্‌লিক ডেট আপিস। বর্তমানে টাকাসংগ্রহের পর্ব শেষ হইয়াছে। এখন সুদ দিবার পালা। শুনিলাম মাসে ৫০।৬০ লক্ষ চেক এই আপিস হইতে বর্তমানে বিলি হইতেছে। সুদ কষা, চেক লেখা ও চেকগুলিকে যথানামে প্রেরণ করা এক বিরাট কাজ। তৎসহ খতের মালিকের নাম পরিবর্তন, উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ ইত্যাদি নানাবিধ আনুষঙ্গিক কাজও কম নয়।

মাত্র ৫।৬ হাজার কর্মচারী এই সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করে। আপিসের সমস্ত কাজেই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, এত খত রাখিবার স্থান নাই, কাজেই খতগুলির ফটো তুলিয়া

ফিল্ম করিয়া কাটিমে জড়াইয়া অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে রাখা হয়। কোন খত লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে ফিল্মটিকে যথাস্থান হইতে বাহির করিয়া বৃহত্তর আকারে পরিণত করিয়া কোর্টে পেশ করা হয়। সুদের হিসাব তো যন্ত্রে হয়ই, চেক লেখা, সই করা, খামে পোরা, ঠিকানা লেখা প্রভৃতি সমস্ত কাজই যন্ত্রে হইতেছে। যন্ত্রের বহুল ব্যবহার আছে বলিয়া অল্প লোকে এত বেশী কাজ করিতে পারে। সেজন্য ইহারা কর্মচারীদের উঁচু হারে মাহিনা দিয়াও কম খরচে কার্যনির্বাহ করে। নিউ ইয়র্ক ও মন্ট্রিয়লের বিক্রয়-কর আপিসে দেখিয়াছি বেতনের সর্বনিম্ন হার মাসিক ১৭৫ ডলার হওয়া সত্ত্বেও আদায়-খরচ মাত্র সংগৃহীত করের ২ কি ৩ শতাংশ। আমাদের দেশে বেতনের সর্বনিম্ন হার মাত্র ৩৫৲ হওয়া সত্ত্বেও আদায়-খরচ তদপেক্ষা অনেক বেশী। শিকাগোর পাব্‌লিক ডেট আপিসের ডিরেক্টর মাইকেল ই. ম্যাক্‌ বোগান্‌ আপিসের যন্ত্রাধ্যক্ষ ডোলে মহাশয়ের সঙ্গে পরম যত্নসহকারে আমাকে আপিসের যাবতীয় কর্মপদ্ধতি দেখাইলেন। আমি সবিস্ময়ে ইঁহাদের কর্মকুশলতা দেখিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

পূর্বেই বলিয়াছি ইণ্ডিয়ানা পলিসে আমার মাল না পাইয়া বিমান কোম্পানীর নিকট আমার শিকাগোর ঠিকানা রাখিয়া আসিয়াছিলাম। একটি মার্কিন যুবক আমার সেক্রেটারীরূপে আমেরিকা ও ক্যানাডায় সর্বত্র আমার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিল। যুবকটি যুদ্ধের সময় প্যারাসুট-বাহিনীতে ছিল। তদুপলক্ষে

গ্রীস ও রাশিয়ায় গিয়াছে। স্প্যানিশ, গ্রীক এবং রুশ ভাষায় কথা বলিতে পারে। দ্রুত শ্রুতিলিখনে খুব নিপুণ। যুবকটি যেমন কর্মঠ তেমনি চরিত্রবান, নাম ওয়েবষ্টার। তাহাকে দুই দিন বিমান আপিসে পাঠাইলাম। মালের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। পরদিন খবর লইয়া জানিলাম যে, কোম্পানীর হেড আপিস নিউ ইয়র্ক হইলেও এখানে একটি বড় শাখা আপিস আছে এবং সে আপিসের স্থানীয় অধ্যক্ষ কোম্পানীর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। তাঁহার নাম কিং। ১৮ই ডিসেম্বর সকালে ওয়েবষ্টারকে মিঃ কিংএর নিকট পাঠাইলাম। ওয়েবষ্টার আসিয়া বলিল, "মিঃ কিং শুনিয়া বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। এবং প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে যেরূপেই হোক তিনি আজকের মধ্যে মাল সন্ধান করিয়া হোটেলে পৌঁছাইয়া দিবেন। তিনি উপহার-স্বরূপ আপনাকে চুরুট ও পানীয় দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি খান না বলিয়া আমি উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।" তৃতীয় দিবসেও মাল না পাওয়ায় মিঃ কিংএর কথায় খুব আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই, সারাদিন কাজকর্ম করিয়া সন্ধ্যার পর সংশয়ান্দোলিত চিত্তে হোটেলে ফিরিলাম। অভ্যর্থনাকক্ষে ঘরের চাবি আনিতে গিয়া দেখি সম্মুখে আমার থলিদ্বয়। ওয়েবষ্টারকে বলিলাম, "মিঃ কিংকে পরদিন টেলিফোনযোগে বিশেষরূপে ধন্যবাদ দিয়া দিও।" পরে ওয়েবষ্টার কিং মহাশয়ের নিকট হইতে জানিয়াছিল যে মাল ডেট্রয়েটের মালগুদামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

শিকাগোর কর্মবহুল দিনগুলি দ্রুত কাটিয়া যাইতেছিল। বাহিরে তীব্র শীত। রবিবার বৈকালে যে বরফ পড়িয়াছিল সোমবারের মধ্যে তাহা অনেকটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেও রাস্তার বাহিরে সর্বত্র বরফ জমিয়াছিল। ১৩১৩ নং বাড়ী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে একটা খোলা জায়গায় বরফের মসৃণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া ছেলেমেয়েরা স্কেট করিত। রাশীকৃত বরফ রোলার দিয়া সমতল করিয়া তাহার উপর মৃদুধারায় জল ছিটাইয়া দিলেই সেই পাতলা জলের পর্দাটা জমিয়া জমাট সিমেণ্টের মত শক্ত ও মসৃণ ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। আর বাহিরে যে তাপ তাহাতে বরফ গলে না। স্কেট-রত বালকবালিকাদের ভিড় দেখিতে বেশ লাগিত। সোমবার ঠাণ্ডা খুব বেশী ছিল না। মঙ্গলবার হইতে খুব শীত পড়ে। তাপ ৫° ডিগ্রি হইতে ১৮° ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠানামা করিতেছিল। পরে সর্বোচ্চ তাপ ৩০° পর্যন্ত উঠিয়াছিল। দুদিন বেশ উত্তুরে হাওয়াও বহিতে-ছিল। কাজের চাপ ও বাহিরের আবহাওয়া কোনটিই বাহিরে বেড়াইবার পক্ষে অনুকূল নয়। কিন্তু আমার হোটেলের নিকটবর্তী মিশিগান হ্রদ আমাকে অনবরত আকর্ষণ করিতেছিল। ১৯শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পাবলিক ডেট আপিস হইতে ফিরিয়াই হ্রদের দিকে গেলাম।

মিশিগান এভিনিউর উপর হোটেল। রাস্তার অপর পারে অদূরে বিরাট সমুদ্রতুল্য হ্রদ। অপর পার দৃষ্টিগোচর হয় না। হ্রদটি আমেরিকা ও ক্যানাডার মধ্যস্থ মহা হ্রদমালার

বা কিরূপ ছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রোতৃবর্গ পুলকিত হইয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্মক্ষেত্র শিকাগো নগরী ভারতবাসীর নিকট তীর্থস্থানস্বরূপ। প্রাতঃকালে টেলিফোন গাইড দেখিয়া স্থানীয় বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলাম। তাঁহার নাম স্বামী বিশ্বানন্দ। তিনি টেলিফোনে সহসা বাঙালীর কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়াছিলেন নিশ্চয়। নৈশ ভোজনের পর তাঁহার আশ্রমে যাইব, কথা হইল। ভোজনান্তে ট্যাক্সিযোগে অত্যুজ্জ্বল আলোকমালাশোভিত শহরের মধ্য দিয়া আশ্রমের দিকে চলিলাম। এক স্থানে বহু খ্রীষ্টমাস তরু বিক্রয়ার্থ রাখা হইয়াছে। তাহারই নিকট আশ্রম। নীচে কলিং বেল টিপিলাম। সঙ্গে সঙ্গে উপর হইতে স্বামীজীও একটি বেল টিপিলেন। তাহাতে দরজায় একটি শব্দ হইল এবং তৎক্ষণাৎ দরজার অর্গল মুক্ত হইল। তখন ধাক্কা দিতেই দরজাটি খুলিয়া গেল এবং ভিতরে ঢুকিতেই পুনরায় বন্ধ হইয়া গেল। এদেশে সমস্ত ফ্লাট বাড়ীতেই উপর হইতে বোতাম টিপিয়া নীচের দরজা খুলিবার যান্ত্রিক বন্দোবস্ত আছে।

স্বামীজীর সহিত আমার পূর্বপরিচয় ছিল না। কিন্তু তাঁহার পরমাত্মীয়ের মত ব্যবহারে পরিতৃপ্ত বোধ করিলাম। উপরে তুইটি ঘর দেখিলাম। যেটিতে আমরা কথা বলিতেছিলাম সেটি বড় ঘর। স্বামীজীর অনেক বই ঘরের চারদিকে

সাজান। একটি বড় তৈলচিত্রে পরমহংসদেবের সেই সমাধিস্থ চিরপরিচিত মূর্তি। স্বামীজী বলিলেন, একজন সুইডিস ভক্ত চিত্রটি আঁকিয়াছেন। চিত্রটি খুব ভাল লাগিল। পাশের ছোট ঘরটি পূজার ঘর। সেখানে সন্ধ্যারতি হয়; উৎসব উপলক্ষে এদেশের লোকেরা আসিয়া গৈরিক বস্ত্র পরিহিত স্বামীজীর পূজারতি দর্শন করেন। স্বামীজী বলিলেন, এদেশে তাঁহাদের মোট বারটি আশ্রম আছে। নিউ ইয়র্ক, বষ্টন ও লস্ এঞ্জেলসের আশ্রমের কথা বিশেষ করিয়া বলিলেন। দার্শনিক হাক্স্লি শেষোক্ত আশ্রমের একজন ভক্ত। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্যন্ত পরমানন্দে সদালাপে কাটাইয়া হোটেলের দিকে ফিরিলাম। তীব্র শীতের মধ্যে স্বামীজী আমার সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত আসিয়া ট্যাক্সি ডাকিয়া আমাকে তাহাতে তুলিয়া দিয়া আশ্রমে ফিরিলেন।

মিশিগান হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে শিকাগো শহর অবস্থিত। শহরটি খুব বড় এবং বিস্তীর্ণ। শহরটির একটি বিশেষ রূপ আছে। বিরাট হ্রদ। বিস্তীর্ণ উদ্যান ও বেড়াইবার জায়গা। মিশিগান এভিনিউর উপর শ্রেণীবদ্ধ বিরাটকায় ২০।২৫ তলা সৌধাবলী। হ্রদ হইতে ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী নির্গত হইয়া শহরের মধ্য দিয়া চঞ্চল চরণে চলিয়াছে। উভয় পার্শ্বে বড় বড় বাড়ী। বাড়ীগুলির উচ্চতা সুষম। কোন বাড়ী হঠাৎ অন্য সকলকে অসম্ভব রূপে ছাড়াইয়া গিয়া সে সুষমা ভঙ্গ করে নাই। মানুষ সর্বদা কর্মব্যস্ত। এখানে দক্ষিণের বর্ণবৈষম্য

নাই। মানুষ মাত্রই এখানে মানুষ। শহরের এই বিশিষ্ট রূপ দেখিতে দেখিতে রাত্রি ১১টার পর হোটেলে ফিরিলাম। লিফটের মধ্যে একটি ভদ্রলোক আমার দিকে তাকাইতে তাকাইতে বলিয়াই ফেলিলেন, "আপনি কি ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছেন ?"

আমি—"হাঁ।"

ভদ্রলোক—"আমি আপনাকে কয়েকদিন যাবৎ লক্ষ্য করিতেছি ; আর আপনি ভারতবাসী কি না একথা জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেছি। আজ প্রশ্নটা করিয়াই ফেলিলাম। আমি বহুবৎসর ভারতে ছিলাম। বম্বেতে ডাক্তারি করিতাম। আপনি কতদিন এখানে থাকিবেন।"

"আমি কাল সকাল ১১টায় এ শহর ত্যাগ করিব।"

"আমার দুর্ভাগ্য। আপনার সঙ্গে বেশি আলাপ হইল না। যদি অন্ততঃ এখন একবার আমার ঘরে আসেন।"

ভদ্রলোকটির আগ্রহ দেখিয়া, নিদ্রাকর্ষণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার ঘরে গেলাম। তিনি পরম আগ্রহে ভারতবর্ষের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, "ভুলাভাইয়ের খবর কি ? তাঁহার খবর অনেকদিন পাই না।"

বলিলাম—"তিনি কয়েক মাস হয় মারা গিয়াছেন।" ভদ্রলোক বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন, বলিলেন—"তাই তাঁর খবর পাই না। তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমাদের কি সৌহার্দ্যই

ছিল! তাঁহার ছেলেকে আমি কাল চিঠি দিব। আপনার কথা আমি তাঁহাকে লিখিব।"

আমি আমার একটি কার্ড তাঁহাকে দিলাম। তিনিও তাঁহার কার্ড আমাকে দিলেন। ভদ্রলোকটির নাম ডাক্তার গিলবার্ড একলাণ্ড। বর্তমানে আমেরিকার নেভেডা রাজ্যের রাজধানী রেনোতে ডাক্তারি করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "আমি পরশু এ স্থান ত্যাগ করিব। এবার রেনোতে বড়দিনে আমাদের একটি পারিবারিক সম্মেলন হইবে। আমরা সমস্ত ভ্রাতাভগিনী বার বৎসর পর একত্র মিলিত হইতেছি।"

ভদ্রলোক অনেক কথা বলিলেন। রাজাগোপালাচরীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, "তিনি আমার একজন রোগী ছিলেন।" ভারতবর্ষের রাজনীতির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা খুব সঙ্গীন। বলিলেন, "জিন্না যে এত জেদ করিবেন তাহা আমরা কেহই পূর্বে ভাবি নাই।"

ভদ্রলোক একদিনও অন্ততঃ আমাকে খাওয়াইতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি সস্ত্রীক সিনেমায় গিয়াছিলেন। স্ত্রী নীচে লাউঞ্জে আছেন। শীঘ্রই আসিবেন। আমাকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল—কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া ঘরে আসিলাম। পরদিন প্রাতরাশের সময় খাবার ঘরে ভদ্রলোক আমার টেবিলের নিকট উপস্থিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা

করিলেন—'আপনার আজ যাওয়াই কি ঠিক ?'—ভদ্রলোকের আগ্রহ দেখিয়া ভাল লাগিল।

২১শে ডিসেম্বর শনিবার এগারটায় শিকাগো হইতে ট্রেনে রওনা হইয়া দুইটার সময় লিঙ্কনের স্মৃতিবিজড়িত স্প্রিংফিল্ড নগরে পৌঁছিলাম। স্প্রিংফিল্ড ইলিনয় রাজ্যের রাজধানী। শিকাগো হইতে দূরত্ব ২০০ মাইল। ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে ট্রেন ছুটিতেছিল। পথে তিনটি ষ্টেশন, কান্‌কাকি, গিব্‌সন সিটি ও ক্লিণ্টন। রওনা হইবার সময় এবং প্রায় সারা রাস্তাই বরফ পড়িতেছিল। ট্রেনের দুই ধারে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর। আগাগোড়া বরফে ঢাকা। স্প্রিংফিল্ড শিকাগোর দক্ষিণে। এখানে বরফ ছিল না। মাঝে মাঝে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছিল। ওয়েবষ্টারের সহিত হোটেলে গিয়া উঠিলাম। আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে শহর সুসজ্জিত। হোটেলের লাউঞ্জে উত্তমরূপে সাজানো খ্রীষ্টমাস তরু। চারিদিকেই আনন্দ। পরের দিন বৃষ্টি কাটিয়া গেল। তারপর যে তিন দিন এখানে ছিলাম সে তিন দিন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছিল।

স্প্রিংফিল্ড এব্রাহাম লিঙ্কনের কর্মক্ষেত্র। তাঁর জন্ম হইয়াছিল কেণ্টাকি রাজ্যে। সাত বৎসর বয়সে তিনি ইণ্ডিয়ানা রাজ্যে আসিয়া কয়েক বৎসর বাস করেন। পরে যৌবনে ইলিনয় রাজ্যের সালেম গ্রামে আসেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান। বেশী লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। সালেম গ্রামে প্রথম এক মুদির দোকানে কাজ করেন। পরে নিজেই

একটি দোকান করেন। কিন্তু সে দোকান লোকসান হইয়া উঠিয়া যায়। তখন কিছু আইন পড়িয়া স্প্রিংফিল্ডে আসিয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এখানে বেশ পসার হয়। পরে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়া এখান হইতে ওয়াশিংটন চলিয়া যান। যুক্তরাজ্য তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। তৎকালে আমেরিকায় দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। লিঙ্কন উহা রহিত করিয়া দেন। ইহাতে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাজ্য হইতে আলাদা হইয়া পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে সঙ্কল্প করে। লিঙ্কন তাহাতে বাধা দেন। উভয় রাষ্ট্রে যুদ্ধ হয়। লিঙ্কন জয়ী হন। দেশের ঐক্য রক্ষা হয়। সে ঐক্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। এই ঐক্যের জন্যই আজ এরা এত বড়। এদেশের লোক লিঙ্কনকে খুব শ্রদ্ধা করে। গৃহ-বিবাদের দিনে ইনিই এদের পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিজয়ী লিঙ্কন পরে গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে নিহত হন।

পরদিন রবিবার। সুন্দর রৌদ্র উঠিয়াছে। সকালেই বাহির হইয়া পড়িলাম। ওয়েবষ্টারকে সঙ্গী করিলাম। উভয়ে লিঙ্কনের সমাধি-মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। হুলেট নামক একজন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ হইল। কলিকাতা হইতে আগত দর্শকের সাক্ষাৎলাভে বৃদ্ধের কি উৎসাহ। আমি বলিলাম, আমেরিকা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা খুবই বেশী। গত যুদ্ধের পূর্বে এদেশকে জানিবার কৌতূহলও বিশেষ ছিল না। তবে ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের

কথা আমরা স্কুলপাঠ্য পুস্তকে পাঠ করিতাম। বৃদ্ধ ভারত-বর্ষের সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিলেন। গান্ধীজীর সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ তন্ন তন্ন করিয়া আমাকে সমাধিমন্দিরের সমস্ত দেখাইলেন। পরে এই সমাধিমন্দিরের প্রাণস্বরূপ এইচ, ডব্লিউ, ফে মহাশয়ের গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। ফে মহাশয়ের বয়স ৮৮। এই লোলচর্ম বৃদ্ধ লিঙ্কনের পরম ভক্ত। এই সমাধির পার্শ্বেই বাস করেন। লিঙ্কনের স্মৃতি-বিজড়িত ছোট-বড় বহু জিনিস সংগ্রহ করিয়া যক্ষের ধনের মত আগলাইতেছেন। আমাকে একটি একটি করিয়া সব দেখাইলেন। তন্মধ্যে লিঙ্কনের একটি ছোট চেয়ার দেখিলাম। তিনি ইহাতে বসিয়া কাজ করিতেন। বৃদ্ধদ্বয় আমাকে এই চেয়ারে বসাইবেনই। পুরাতন চেয়ার। বহু স্মৃতি এর সঙ্গে বিজড়িত। আমার আড়াই মনী বপুকে ইহার উপর স্থাপন করিতে কিছুতেই ভরসা পাইতেছিলাম না। বৃদ্ধদ্বয় নাছোড়-বান্দা। তাঁহারা বলিলেন, "আপনি বসুন। যে চেয়ারে লিঙ্কন বসিতেন সে চেয়ারে বসিলে আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবে।" অগত্যা চেয়ারের উপর অতি সন্তর্পণে বসিতেই হইল। সহসা ফে মহাশয় বলিলেন, "আপনার পিতা যখন এদেশে আসিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহার নিকট একটি স্বর্ণমুদ্রা ধার করিয়াছিলাম। আজ আপনার হাতে তাহা প্রত্যর্পণ করিতেছি।"

আমি প্রথমে কথাটির অর্থ বুঝি নাই। বলিলাম—আমার পিতা তো এদেশে আসেন নাই।

বৃদ্ধ হাসিয়া একটি স্বর্ণমণ্ডিত মুদ্রা পকেট হইতে বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। বলিলেন, "আপনার কয়টি সন্তান?" আমি বলিলাম, "তিনটি।" বৃদ্ধ তখন আরও দুইটি মুদ্রা আমাকে দিলেন। বলিলেন, "আমার কথা বলিয়া আপনার সন্তানগণকে এই মুদ্রাগুলি দিবেন। তারা যখন এখানে আসিবে তখন আমাকে স্মরণ করিবে। আমি তো তখন থাকিব না।" মুদ্রাগুলিতে লিঙ্কনের মূর্তি মুদ্রিত। লিঙ্কনের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ এই গিল্টিকরা মুদ্রাগুলি লিঙ্কন স্মৃতি-কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত ও প্রচারিত। বিশিষ্ট অতিথিগণকে স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ এইগুলি দেওয়া হয়। তখন বৃদ্ধ হুলেট আর একটি স্বর্ণমণ্ডিত মুদ্রা আমার হাতে দিলেন। আমি ইঁহাদের হৃদয়স্পর্শী ব্যবহারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমি বলিলাম, "তিনটি তো পাইয়াছি আর কেন?" হুলেট মুদ্রাটি দেখাইয়া বলিলেন, "এটি স্প্রিংফিল্ড মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক নির্মিত ও প্রচারিত। সম্পূর্ণ অন্য ধরণের।" এই সহৃদয় উপহার প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। বলিলাম, "বেশ, এটি আমার ভাইপো লইবে।" এখনও ঐ মুদ্রা চতুষ্টয়ের মধ্যে আমি বৃদ্ধদ্বয়ের তথা স্প্রিংফিল্ড-বাসিগণের হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করি। বৃদ্ধ ফে-র সহাস্য মুখখানি এখনও মুদ্রাগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ করি।

বৈকালে জনৈক সরকারী কর্মচারী হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। নাম হ্যারল্ড ব্রাড্‌শ। ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্টের গবেষণা ও সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ। এখানে আমার কাজের কিরূপ প্রোগ্রাম হইবে প্রথমে সে সম্বন্ধে আলোচনা হইল। পরে ভদ্রলোকটি বলিলেন, "স্প্রিংফিল্ডে এসেছেন। চলুন এব্রাহাম লিঙ্কনের স্মৃতিচিহ্নগুলি আপনাকে দেখাইয়া লইয়া আসি। আমি এগুলি কয়েকবার দেখিয়াছি। কিন্তু যখনই যাই তখনই পুনরায় নূতন কিছু দেখিতে পাই।"

আমি বলিলাম, "আমি সকালে লিঙ্কনের সমাধিমন্দির দেখিয়া আসিয়াছি।"

ব্রাড্‌শ বলিলেন, "তবে চলুন প্রথমে লিঙ্কনের নিজ বাড়ী। ও পরে সালেম গ্রামে যাওয়া যাইবে। তাঁহার নিজ বাড়ী খুব কাছে। সালেম গ্রাম ১৫ মাইল দূরে।"

অদূরস্থিত লিঙ্কনের নিজ বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। একটি মহিলা গৃহের রক্ষণকার্যে নিযুক্ত এবং আগন্তুকগণের প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিতেছেন। এটি ভিন্ন লিঙ্কনের দ্বিতীয় নিজ বাড়ী ছিল না। সরকার এই বাড়ীটি কিনিয়া লইয়া লিঙ্কনের সময় যেরূপ ছিল ঠিক সেই ভাবে রক্ষা করিতেছেন। বাড়ীটি ছোট, দোতলা, খুব সাদাসিধা। উপরে নীচে তিনটি করিয়া ঘর। ঘরগুলি বেশী বড় নয়। আসবাবপত্র খুব সামান্য। একটা বৈঠকখানা ঘর একটু সাজান। ব্রাডশ

বলিলেন, "এঘরটি সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়। যেন একটু বেশী সজ্জিত। লিঙ্কনের সাদাসিধা অভ্যাসের সঙ্গে এটা যেন খাপ খায় না। হয়তো বা প্রেসিডেণ্ট হইবার পর বিশিষ্ট অতিথিদের বসাইবার জন্য ঘরটি সাজাইয়াছিলেন।" লিঙ্কন-পত্নী যে স্থানে যে চেয়ারে বসিয়া জামা প্রভৃতি বুনিতেন, লিঙ্কন যেখানে বসিয়া কাজ করিতেন সব ঠিক সেই ভাবে আছে। সবই খুব সাদাসিধা। সাজাইবার চেষ্টাও বিশেষ লক্ষিত হয় না।

তারপর সালেমের দিকে চলিলাম। সুন্দর রাস্তা। দু'ধারে দিগন্তবিস্তৃত শূন্য প্রান্তর। ব্রাড্‌শ গাড়ী চালাইতেছেন; আমি পাশে বসিয়া। নানা বিষয়ে আলাপ চলিতেছে। এ দেশে লোকবসতির বিরলতা সর্বত্রই লক্ষ্য করিতেছি। মাঠই বেশী। শুনিলাম ভুট্টাই এখানকার প্রধান ফসল। একটি ছোট বনাকীর্ণ পাহাড় দেখিলাম। তাহার নীচে একটি ছোট লোহার কারখানা। পাহাড়ের উপরে সালেম গ্রাম।

আসল গ্রামটি দুই মাইল দূরে ছিল। লিঙ্কনের সময় সেখানে বহু লোকের বাস ছিল। ক্রমশঃ গ্রামটি পরিত্যক্ত হয়। জনশূন্য গ্রামটিও নষ্ট হইয়া যায়। শুধু কাঠের ঘরগুলির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান থাকে।

১৯১৮ সনে আসল গ্রামের ধ্বংসাবশেষ লইয়া এই পাহাড়ের উপর গ্রামটিকে ঠিক পূর্বের মত পুনর্গঠিত করিতে

আরম্ভ করা হয়। একটি স্থানীয় লিঙ্কন-সমিতি এই কাজ আরম্ভ করেন। পরে সরকার ইহার ভার লন। লিঙ্কনের সময় যেরূপ ছিল সরকার বাড়ীগুলিকে ঠিক সেইভাবে নির্মাণ করিয়া রক্ষা করিতেছেন। ছোট ছোট কাঠের ঘর; সামান্য বিছানা। বিছানার সরঞ্জামের মধ্যে কাঁথাই প্রধান। আস্‌বাব নাই বলিলেই চলে। গ্রাম্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কয়েকটি দোকান। তাহার মালপত্র অতি সামান্য রকমের। কামারশালা, মুদির দোকান, ডাক্তারখানা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে। গ্রামটি আমাদের দেশের গ্রামেরই মত ছিল বলিয়া মনে হয়। ঘরগুলিও আমাদের দেশের গ্রামের সাধারণ লোকদের ঘরের মত। সেদিন ভারতবর্ষের গ্রাম ও আমেরিকার গ্রামে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। আজ তাহাদের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। একটি ছোট সংগ্রহশালা আছে। তার মধ্যে লিঙ্কনের ব্যবহৃত অনেক জিনিস বিদ্যমান। ব্রাড্‌শ একটি শীল-করা পেট্‌রার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। লিঙ্কনের পুত্র এটি উপহার দেন। এর মধ্যে লিঙ্কনের বহু চিঠিপত্র আছে। পেট্‌রাটি দিবার সময় লিঙ্কনের পুত্র একটি সর্ত করিয়া দেন যে ১৯৪৭ সনের অমুক মাসের পূর্বে এ পেট্‌রা যেন খোলা না হয়। তাই এতদিন ইহা বন্ধই আছে। ব্রাড্‌শ বলিলেন, "আমি কয়েক বার এখানে আসিয়াছি। অথচ এই পেট্‌রাটি দেখি নাই। ইহা খুলিবার দিন যে এত নিকটবর্তী তাহাও লক্ষ্য করি নাই। দেখুন,

আমি ঠিকই বলিয়াছি যে, এখানে আমি যখনই আসি তখনই নূতন কিছু দেখি।"

আমি—"আচ্ছা খুলিবার তারিখ সম্বন্ধে এইরূপ সর্তের অর্থ কি?"

ব্রাড্‌শ—"এই সমস্ত চিঠির মধ্যে পরিবারের অনেকের ব্যক্তিগত কথাবার্তা নিশ্চয়ই আছে। তাহাদের জীবিতকালে সেগুলির প্রকাশ হয়তো তাঁহারা পছন্দ করিবেন না। সেজন্যই এই সর্ত।"

শ্রদ্ধা-বিনম্র চিত্তে এই সব দেখিলাম। এই কাষ্ঠ-কুটীর (লগ কেবিন) হইতেই লিঙ্কন হোয়াইট হাউস্ বা "সাদা বাড়ীতে" গিয়াছিলেন। এখানে তিনি ছিলেন সামান্য মুদির দোকানের কর্মচারী।

ব্রাড্‌শ লিঙ্কনের একজন ভক্ত। লিঙ্কন বলিতে গদগদ। বলিলেন—"লিঙ্কন অতি সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার ভাষা এত প্রাঞ্জল, এত সরল এবং এত মর্ম্মস্পর্শী যে তাহার মধ্য হইতে প্রক্ষিপ্ত অংশ বাছিয়া ফেলা খুব সহজ।" কথাটি শুনিয়া আমার বিশেষ করিয়া লিঙ্কনের দুইটি বক্তৃতাংশ মনে পড়িল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী লিঙ্কন প্রেসিডেন্টের কার্যে যোগ দিবার জন্য স্প্রিংফিল্ড ত্যাগ করিয়া যান। সেদিনকার বিদায়-সভায় তিনি বলিয়াছিলেন—

"২৫ বৎসরের বেশী আমি আপনাদের মধ্যে বাস করিয়াছি। এতকাল ধরিয়া আপনাদের কাছে সদয় ব্যবহার

ভিন্ন অন্য কিছুই পাই নাই। যৌবনকালে আমি এখানে বাস করিতে আসিয়াছিলাম। আজ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি এখানেই পৃথিবীর পবিত্রতম বন্ধনগুলি গ্রহণ করিয়াছি। আমার সমস্ত সন্তান এখানে জন্মিয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক জন এখানেই চিরনিদ্রায় মগ্ন।

"বন্ধুগণ, আমার যা কিছু আছে এবং আমি যা কিছু হইয়াছি সবই আপনাদের জন্য। আমার অদ্ভুত ঘটনাবহুল অতীত আজ আমার মনের মধ্যে ভিড় করিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে। আজ আমি আপনাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি। জর্জ ওয়াশিংটনের উপর যে দুরূহ কার্য বর্তিয়াছিল আজ তদপেক্ষা কঠিন কাজের ভার গ্রহণ করিতে আমি যাইতেছি। পরমেশ্বর তাঁহার সহায় ছিলেন। পরমেশ্বর যদি আজ আমার সঙ্গে না থাকেন তবে আমি নিশ্চয়ই বিফল হইব। কিন্তু সেই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যদি আমাকে চালাইয়া লন আমি কিছুতেই বিফল হইব না, সফল হইবই। আসুন আমরা প্রার্থনা করি আমাদের পিতৃপিতামহের প্রতি প্রসন্ন ভগবান যেন আমাদিগকে ত্যাগ না করেন। তাঁহারই চরণে আমি আপনাদিগকে সমর্পণ করিতেছি। অনুরূপ সরল বিশ্বাস লইয়া আপনারাও তাঁহার দয়া আমার জন্য মাগিয়া লউন—ইহাই আপনাদের নিকট প্রার্থনা করি।"

১৮৬৩ সনের ১৯শে নবেম্বর গেটিস্‌বার্গের রণক্ষেত্রে লিঙ্কন এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"চার কুড়ি সাত বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুগণ এই মহাদেশে এক নূতন জাতির জন্ম দিয়াছিলেন। সে জাতির জন্ম স্বাধীনতায়; মানুষমাত্রই সমান অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে এই মহাভাব ছিল তাহাদের সাধনা।. আজ আমরা গৃহ-যুদ্ধে ব্যাপৃত। আজ পরীক্ষা হইবে সেই জাতি অথবা স্বাধীন-তায় উদ্বুদ্ধ মানবের সমতাসাধক অনুরূপ যে-কোন জাতি পৃথিবীতে বাঁচিতে পারে কিনা? সেই গৃহযুদ্ধের একটি মহা-রণক্ষেত্রে আজ আমরা মিলিত হইয়াছি। যাঁহারা জাতিকে বাঁচাইবার জন্য নিজেরা মৃত্যু বরণ করিলেন তাঁহাদের চির-বিশ্রামের জন্য এই মহারণক্ষেত্রের একাংশ আজ আমরা উৎসর্গ করিব। ইহাই আমাদের অবশ্যকর্তব্য।

"কিন্তু লৌকিক আচারের কথা ছাড়িয়া দিলে এই মহারণ-ক্ষেত্রকে উৎসর্গ বা পবিত্র করিতে আমরা কে? যে জীবিত এবং মৃত বীরগণ এখানে সংগ্রাম করিয়াছেন তাঁহারাই ইহাকে পুণ্য-ভূমিতে পরিণত করিয়াছেন। সে পুণ্যভূমির পবিত্রতা বাড়াইবার বা কমাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা আজ এখানে কি কথা বলিলাম পৃথিবী তাহা ভুলিয়া যাইবে। তাঁহারা এখানে যাহা করিয়া গেলেন তাহা পৃথিবী কদাপি ভুলিবে না। অতএব আসুন আমরা আজ সেই বীরগণের অসমাপ্ত কর্মে নিজেদেরই উৎসর্গ করি। যে মহাকার্যের জন্য তাঁহারা সংগ্রাম করিয়া গেলেন আসুন তাহা সমাধা করিবার জন্য আমরা আত্মোৎসর্গ করি। আসুন আমরা জীবন পণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করি—

যে কাজে এই বীরগণ জীবন দিলেন আমরা সেই কাজের প্রতি অনুরাগী রহিব; আমরা সঙ্কল্প করিতেছি যে যাঁহারা মরিলেন তাঁহাদের মৃত্যু আমরা বৃথা হইতে দিব না; পরমেশ্বরের অনুশাসনে এই জাতীর স্বাধীনতামন্ত্রে আজ নবজন্ম হইল; এবং জনগণ কর্তৃক জনহিতে জনশাসন পৃথিবী হইতে আমরা কখনও বিলুপ্ত হইতে দিব না।”

ব্রাড্‌শ'র সঙ্গে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। শহরে আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ৭৫০০০ লোক-অধ্যুষিত সুন্দর শহরটি দেখিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বর কাজে ব্যস্ত রহিলাম। ষ্টেট ক্যাপিটলেই আমার কাজ বেশী ছিল। প্রত্যেক ষ্টেটেই ষ্টেট ক্যাপিটলটি খুব গৌরবের স্থল। ইহা নগরের কেন্দ্র-স্থলে অবস্থিত। বড় গম্বুজ এবং বড় বড় ঘর। ষ্টেটের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মর্মরমূর্তি ইহার চারিদিকে বসানো। ষ্টেটের অতীত ইতিহাসের ছবি দেওয়ালে ঝুলানো। আইন-সভার অধিবেশন এই ভবনে হয়। সরকারের কেন্দ্রীয় আপিস-গুলি সাধারণতঃ এই ভবনে। রাষ্ট্রের স্বাধীনতার এবং মর্যাদার প্রতীক এই ষ্টেট ক্যাপিটল। স্প্রিংফিল্ডে ষ্টেট ক্যাপিটলের সদর দরজায় এব্রাহাম লিঙ্কনের দণ্ডায়মান পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপিত। এখানে যে কয়জন সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ হইল তন্মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাজেট ডিরেক্টর টি, আর, লেথ এবং রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের

উইলার্ড আইস। লেথ প্রবীণ, সদালাপী এবং সদা সহাস্যবদন। নিজের বিভাগের তথ্যাদি ইঁহার নখদর্পণে। গণতন্ত্রের নিরঙ্কুশ প্রবণতা এবং কর্ম-সচিবগণের নিয়মানুবর্তিতার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা—এই দুইয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য ইঁহাতে দেখিতে পাই। এই দুইটি পরস্পরবিরোধী ভাবের সুষ্ঠু সমন্বয় ইঁহার কথাবার্তায় লক্ষ্য করিলাম। উইলার্ড আইস যুবক, সম্পূর্ণ অন্ধ। অথচ ইনি ট্যাক্স আইনে একজন বিশেষজ্ঞ। ইঁহাদের বিবিধ ট্যাক্স সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আমার সঙ্গে রেভেনিউ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ একটি বৈঠকে মিলিত হন। তাহাতে এই অন্ধ যুবকটির আইনজ্ঞান দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিয়াছিলাম।

২৫শে ডিসেম্বর বুধবার বড়দিন। বেলা এগারটায় রেল-যোগে স্প্রিংফিল্ড ত্যাগ করিলাম। দুটায় শিকাগো আসিয়া অন্য ট্রেনে রাত আটটার সময় ম্যাডিসন নগরে পৌঁছিলাম। ম্যাডিসন উইস্‌কন্‌সিন ষ্টেটের রাজধানী। শিকাগো হইতে প্রায় ১৪০ মাইল উত্তরে। উইস্‌কন্‌সিন রাজ্যের বৃহত্তম নগর মিলওয়াকি পথে পড়িল।

ম্যাডিসন ছোট শহর। জনসংখ্যা ৮৫০০০। উইস্‌কন্‌সিন রাষ্ট্র কৃষিপ্রধান। পনির প্রস্তুত করিবার জন্য বিখ্যাত। এই রাষ্ট্রে সহস্র স্বাভাবিক হ্রদ বিদ্যমান। গ্রীষ্মকালে মৎস্যশিকারে ও প্রমোদভ্রমণার্থ এখানে বিস্তর লোকসমাগম হয়। ম্যাডিসন নগরটি এইরূপ দুইটি হ্রদের মধ্যস্থলে অবস্থিত। হ্রদ-দ্বয়ের

নাম মেনোনা ও মেণ্ডোটা। মেণ্ডোটার আয়তন ২১ বর্গমাইল। মেনোনা তাহার অর্দ্ধেক। মেনোনার অদূরে ক্যাপিটল এবং অন্যান্য সরকারী ভবন। মেণ্ডোটার পারে উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ব-বিদ্যালয়। আমার হোটেলটি ছিল ক্যাপিটলের খুব কাছে। নাম হোটেল লোরেন। হ্রদ-দ্বয়ের কোনটির পারেই প্রশস্ত রাজপথ নাই। তবে প্রত্যেকটির তীরেই বসিবার ও ঘুরিবার স্থান আছে। মেণ্ডোটার পারে সাঁতারের ক্লাবও আছে। শীতে সব জায়গাই জনশূন্য ; আশে-পাশে শুধু স্তূপাকার বরফ। কিন্তু দেশের এ হিমাবগুণ্ঠিত রূপ অতীব নয়নসুখকর। বিশ্ব-বিদ্যালয়টির বেশ নাম আছে। কিছু ভারতীয় ছাত্র এখানে পড়িতেছে।

যে কয়দিন এখানে ছিলাম মেঘ বৃষ্টি ও বরফের খেলাই দেখিয়াছি। যে তাপে বরফ গলে সাধারণতঃ তাপ তার চেয়ে ১০।১৫ ডিগ্রি নীচে থাকে। কখনও আরও নীচে নামিয়া যায়। রোদ উঠিলে ঠাণ্ডা বেশী হয়। একটু ঠাণ্ডা কমিলেই মেঘ হয় এবং বৃষ্টি বা বরফ পড়ে। বরফ তো আর গলে না, কাজেই শীত যতই প্রচণ্ড হয় ততই বরফের স্তূপ উঁচু হয়। রাস্তাগুলিকে কষ্টেসৃষ্টে চলনসই করিয়া রাখা হয়। প্রায়ই কুয়াশা ও ধোঁয়া হয়। 'স্মোক' (ধোঁয়া) এবং ফগ (কুয়াশা) কথা দুইটির সংমিশ্রণ করিয়া ইহার নামকরণ করিয়াছে স্মগ। এখানকার বাজেট-ডিরেক্টর ই. সি. গিজেল আমাকে বলিলেন, "এবার তো বরফ কম। অন্যবার অন্ততঃ হাঁটু-সমান বরফ এ

সময় হয়-ই। আর আপনি সেণ্টপলে যাইতেছেন। সেখানে দেখিবেন কোমর সমান বরফ।”

এই ষ্টেটে একটি প্ল্যানিং বোর্ড দেখিলাম। ১৯২৯ সন হইতে বোর্ডটি আছে। এত আগে স্বতন্ত্র প্ল্যানিং বোর্ড অন্য কোন রাষ্ট্রেই গঠিত হয় নাই। কিন্তু ইহার উপর রাষ্ট্রীয় সরকারের নীতির খুব বেশী প্রভাব লক্ষ্য করিলাম না। স্থানীয় সরকারগুলির উপদেষ্টা হিসাবেই ইহার কাজ সমধিক।

২৭শে ডিসেম্বর সকালে ট্যাক্স বিভাগের কমিশনার এ. ই. ওয়েগনার মহাশয়ের আপিসে যাই। তাঁহার সেক্রেটারী আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, “বিশেষ জরুরী কার্যে ওয়েগনার মহাশয়ের মিনিট পাঁচেক দেরী হইবে। সেজন্য তিনি খুব দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি, আপনি তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন।”

সেক্রেটারী মহাশয়া তখন নানা বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করিলেন। বলিলেন, “দু’দিন আগে আপনাকে পাইলে আমাদের খুব সাহায্য হইত।” আমি বলিলাম—“কি ব্যাপার বলুন দেখি!”

মহিলাটি বলিলেন, “আমার ছোট বোনের এক বন্ধু ভারতবর্ষে আছেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে একটি শাড়ী বড়দিনের উপহার-স্বরূপ আমার বোনকে পাঠাইয়াছেন। শাড়ীটি পরম মনোরম। কিন্তু আমরা কেহ পরিতে জানি না। ভদ্রলোক অবশ্য শাড়ী পরিবার নিয়ম সম্বন্ধে অনেকগুলি

ফটো সহ ছাপান উপদেশাবলী ভারতবর্ষ হইতে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও আমাদের ভুল হইতেছিল। পরে এক লাইব্রেরিতে গিয়া একখানি মাসিক পত্রিকা লইয়া আসি। তাহাতে শাড়ী পড়িবার নিয়ম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সহ একটি প্রবন্ধ ছিল। তাহা দেখিয়া আমরা দু'জনে মিলিয়া শেষে কৃতকার্য হই। কি সুন্দর শাড়ী! পরিবার পর আমার বোনকে অপূর্ব সুন্দরী দেখাইতেছিল। আপনাদের দেশের মেয়েরা কি সর্বদা ঐরূপ শাড়ী পরেন?"

বলিতে বলিতে মহিলাটির কণ্ঠ গদগদ হইয়া উঠিল। অচিরাগত ওয়েগনার মহাশয়ের সহিত সরকারী কর-সংগ্রহ-বিষয়ক নানাবিধ আলোচনান্তে হোটেলে ফিরিলাম।

২৮শে ডিসেম্বর শনিবার। বসুমতী হিমাবৃতা; প্রকৃতি 'স্মগে' আচ্ছন্না। বিশেষ কাজ না থাকিলে কেহ বাহিরে আসে না। বেলা দুটায় বিনানযোগে ম্যাডিসন ত্যাগ করিয়া বেলা চারটায় সেণ্ট পল বিমান ঘাটিতে পৌঁছিলাম। উপর হইতে শুধু তুষারাবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তরই দৃষ্টিগোচর হইল। রচেষ্টার নামক একটি ষ্টেশনে বিমানটি নামিয়াছিল।

ম্যাডিসন হইতে সেণ্ট-পল বিমানযোগে ২৩৩ মাইল। ইহা আমেরিকার উত্তর সীমানাস্থ মিন্নেসোটা রাজ্যের রাজধানী। বিমানঘাঁটি হইতে মোটরযোগে হোটেলে আসিতে এক ঘণ্টা লাগিল। গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়িতেছে। সর্বত্র বরফে ঢাকা। মিসিসিপি নদীর পাশ দিয়া আসিতেছি। নদীর জল জমিয়া

গিয়াছে। নদীর নিকটেই আমার হোটেল। নাম হোটেল লাউরী। নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকিয়া দেখি ঘরের রেডিওটি খোলা রহিয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শী কর্তৃক একটি অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসলীলার সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। বুঝিলাম শহরে একটি খুব বড় এলিভেটরে আগুন লাগিয়াছে। দশ লক্ষ বুশেল গম সহ এলিভেটারী পুড়িয়া যাইতেছে।

পর দিবস ১৯শে ডিসেম্বর রবিবার। আকাশ হইতে শেফালিকা ফুলের মত বরফ ঝরিতেছে। সর্বত্র স্তূপাকার বরফ। বিকালে বরফ পড়া বন্ধ হইল। বেশ রোদ উঠিল। কিন্তু ঠাণ্ডা খুব বেশী। পরিষ্কার আকাশে উজ্জ্বল সূর্য। সূর্যের দিকে তাকান যায় না। উজ্জ্বল রৌদ্র মনকে বাহিরে টানে। কিন্তু বাহিরে আসিলেই ঠাণ্ডায় জমিয়া যাইতে হয়। রোদের কোন তাপ নাই ; বরফ গলাইবার ক্ষমতাও নাই। বিকালের দিকে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু রাস্তায় হাঁটা যায় না। পিচ্ছিল বরফের উপর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে যে-কোন সময় পা ফস্‌কাইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। আপাদ-মস্তক নানাবিধ গরম কাপড়ে ঢাকা থাকিলেও নাক ও মুখের অনাবৃত অংশ যেন জমিয়া যায়। হোটেলের মধ্যে তাপ ৭০ বা ৭৫ ডিগ্রী। বাইরের তাপ শূন্যের উপরে ক্বচিৎ উঠে। কখনও শূন্যের ১৭।১৮ ডিগ্রী নীচে নামিয়া যায়। বাহিরে আসিবামাত্র নাক হইতে খানিকটা স্বচ্ছ জল গলিয়া পড়িল। কোটের উপর তাহা জমিয়া শক্ত হইয়া গেল। ট্রামে প্রবেশ

করিলে গলিয়া ঝরিয়া গেল। ট্রামের মধ্যে কেন্দ্রীয় তাপ ব্যবস্থা আছে। নচেৎ তাহার মধ্যে অধিকক্ষণ বসা সম্ভব হইত না। ট্রামে শহর দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

সেণ্ট পল ও মিনিয়াপলিস নামক শহর দুইটি পরস্পর-সংলগ্ন। কোথায় এক শহরের সীমানা শেষ হইয়া অন্য শহর আরম্ভ হইল তাহা বলিয়া না দিলে বুঝা সম্ভব নয়। ইহারা যমক-শহর নামে সুপরিচিত। গুরুত্বে, আকারে ও লোক-সংখ্যায় মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে শিকাগোর পরেই যমক-শহরের স্থান। শহরদ্বয় বাণিজ্যপ্রধান। লোকসংখ্যা আট লক্ষ। কাঁচা লোহা ও গম চালান দিবার কারবারই এখানকার বড় কারবার। আটা ও ময়দার বড় বড় কলও এখানে অনেক। মিন্নেসোটা রাজ্যের উত্তর প্রান্তে বড় বড় লৌহ-খনি আছে। এ অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। রাজ্যের উত্তর সীমানায় সুপিরিয়র হ্রদ। সুপিরিয়র হ্রদের তীরে ডুলুথ বন্দর। বন্দরটি যমক-শহর হইতে কিঞ্চিদধিক শত মাইল দূরে অবস্থিত। ওপারে কানাডা রাষ্ট্রের পোর্ট আর্থার নামক বন্দরে পৃথিবীর বৃহত্তম গমের আড়তসমূহ বিদ্যমান। কানাডায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর সীমানায় সুপিরিয়র হ্রদ, মিসিগান হ্রদ, হুরণ হ্রদ, ইরী হ্রদ, অণ্টেরিও হ্রদ প্রভৃতি বড় বড় হ্রদ পর পর সাজান রহিয়াছে। এই হ্রদমালা স্থানে স্থানে খালদ্বারা সংযুক্ত হইয়া সেণ্ট লরেন্স নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। সেণ্ট লরেন্স মন্ট্রিয়ল নগরের পাদদেশ ধৌত করিয়া

আটলান্টিকে পতিত হইতেছে। ডুলুথ ও পোর্ট আর্থার বন্দরদ্বয় হইতে এ অঞ্চলের বহু মালপত্র জলপথে দেশের ভিতরে ও আটলান্টিকের পথে দেশের বাহিরে রপ্তানি হয়। বন্দর হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিউ ইয়র্কের পরেই ডুলুথের স্থান। এখান হইতে মিন্নেসোটার কাঁচা লোহা বিশ্ববিখ্যাত পিট্‌স্‌-বার্গের লোহার কারখানায় প্রেরিত হয়। যমক-শহরের যাবতীয় বাণিজ্যদ্রব্য ডুলুথের পথেই যাতায়াত করে। যমক-শহর হইতে ডুলুথের দূরত্ব শতাধিক মাইল। ডুলুথে ও সেণ্ট পল-মিনিয়াপলসে বড় বড় 'এলিভেটর' আছে। এক একটি এলিভেটর লক্ষ লক্ষ মণ গম চালান দেয়। ইহারা বস্তা ব্যবহার করে না। যন্ত্রসাহায্যে রাশি রাশি গম গুদাম, গাড়ী বা জাহাজে স্থানান্তরিত করে। 'এলিভেটরে'র ব্যবহার যত বেশী হইবে পাটের চাহিদা তত কমিবে। এই হিসাবে 'এলিভেটর' পাটের প্রতিযোগী।

ট্রামে চলিতে চলিতে দু'ধারে সুন্দর সৌধশ্রেণী দেখিতেছি। আমেরিকার সমস্ত শহরের মত এই যমক-শহরও সুসজ্জিত এবং সমান ও সমান্তরাল পথশ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। রাস্তায় পথচারী নাই বলিলেই হয়। লোক ঘর হইতে বাহির হইয়া যত শীঘ্র পারে ট্রাম বা অন্যান্য যানে আরোহণ করে। রাস্তায়, প্রান্তরে, বাড়ীর ছাদে, গাড়ীর মটকায়, গাছের নগ্ন শাখায় শুধু বরফের স্তূপ। মিউনিসিপ্যালিটির বরফ-ঠেলা গাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গাড়ীগুলির সামনে বিরাট্ পাখা। সেই পাখা

দিয়া রাস্তার মধ্যস্থলের বরফস্তূপ ঠেলিয়া দিতেছে। তাহাতে রাস্তার পাশে পর্বত-প্রমাণ বরফ জমিতেছে। পরে বরফ-বাহী গাড়ী আসিয়া যন্ত্রসাহায্যে সেই বিরাট স্তূপকে উড়াইয়া গাড়ীর মধ্যে ফেলিতেছে, আর শহর হইতে দূরে লইয়া গিয়া সেই বরফরাশি রাখিয়া আসিতেছে। ট্রাম লাইনের পাশেই গত দিনকার অগ্নিদগ্ধ এলিভেটরটি দেখিলাম। বিরাট 'এলিভেটর'। বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া সম্পূর্ণ ভস্মীভূত অবস্থায় ইহা পড়িয়া আছে। তখনও স্থানে স্থানে আগুন জ্বলিতেছে। বরফ আগুনের মধ্যে পড়িয়া গলিতেছে। পাশে সরিয়াই আবার জমাটবদ্ধ হইয়া যাইতেছে। এইরূপে স্থানে স্থানে বহু জটাজুট সৃষ্টি হইয়াছে। নিকটেই মিসিসিপি নদী। নদীর উপর সুদৃশ্য সেতু। তাহার উপর দিয়া ট্রাম লাইন গিয়াছে। নদীর জল জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। মার্চ পর্যন্ত এই বরফ বাড়িবে। তারপর যখন এই দিগন্তবিস্তৃত বরফরাশি গলিতে সুরু করিবে তখন মিসিসিপি নদীর দক্ষিণাংশে বন্যা দেখা দিবে। এই বন্যা নিবারণ করাই টেনেসি উপত্যকা কর্তৃপক্ষের অন্যতম কর্তব্য। শহর ঘুরিয়া ফিরতি ট্রামে হোটেলে আসিলাম। তখন ৫টা বাজিয়াছে। তাপ শূন্য ডিগ্রী। রাত্রে তাপ শূন্যের ১৩ ডিগ্রী নীচে নামিয়া গেল।

৩০শে ডিসেম্বর সোমবার সকালে মিনিয়াপলিসের মিউনিসিপ্যাল আপিসে গেলাম। সেখানে শিকাগোর ১৩১৯ নং বাড়ীর পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশন সার্ভিসের কতিপয়

বিশেষজ্ঞ কাজ করিতেছিলেন। নগরের শাসন-প্রণালীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধান মানসে মেয়র মহাশয় এই সমিতিকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সমিতির বিশেষজ্ঞগণ শাসনযন্ত্রের সমস্ত অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেছেন। ইঁহাদের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়া ইঁহাদের কর্মপদ্ধতি দেখিলাম। ইঁহাদের মধ্যে হেষ্টভেড্ নামক জনৈক ইঞ্জিনীয়ার যুবক আমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিতেছিলেন। ইঁহাকে লইয়া নিকটস্থ একটি হোটেলে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিলাম। আপিসে ফিরিবার পথে দেখি বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। পরিষ্কার নীলাকাশ। ধরণী রৌদ্রস্নাতা। উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান্ সূর্য। তাহার দিকে তাকান যায় না। কিন্তু রৌদ্রের একটুও তাপ নাই। বরফ গলাইতেও সে রৌদ্র অসমর্থ। সূর্যের এবংবিধ রূপ আমাদের কল্পনাতীত। আমি হেষ্টভেডকে বলিলাম, "আমাদের পুরাণে আছে যে এক অসুর সূর্যকে শাসন করিয়াছিলেন; তিনি এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন যে পদ্মফুল ফুটাইতে যতটা তাপ প্রয়োজন তার বেশী তাপ সূর্য প্রকটিত করিতে পারিবেন না। কিন্তু এদেশে দেখিতেছি সূর্যকিরণে উজ্জ্বলতা আছে, তাপ আদৌ নাই। সূর্যের আর এক রূপ দেখিয়াছি নবেম্বর মাসে লণ্ডনে। ধোঁয়াটে আকাশে নিস্তেজ সূর্য। সে সূর্য রৌদ্র বিকিরণ করে না। চিত্রিত সূর্যের ন্যায় তাহার দিকে যতক্ষণ ইচ্ছা তাকাইয়া থাকা যায়। সূর্যের সে রূপ তবুও

আমরা কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু এ রূপ ভাবিতেই পারি না। এ সূর্য আমাকে বহুবার বিভ্রান্ত করিয়াছে। ঘরে বসিয়া ভাবিয়াছি যে একটু রোদ পোহাইয়া আসি। বাহিরে আসিয়া হতাশ হইয়াছি।"

হেষ্টভেড্ আমাকে ক্যাপিটল ভবনে লইয়া গেলেন। সেখানে সকলের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়া তিনি স্বকার্যে ফিরিয়া গেলেন। সরকারী আপিসগুলির বেশীর ভাগ এই ভবনে অবস্থিত। কতকগুলি আপিস রাস্তার ওপারে আর একটি বাড়ীতে। দুইটি বাড়ীর মধ্যে মাটির নীচে দিয়া সুড়ঙ্গ-পথ আছে। শীতের অত্যধিক প্রকোপের জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা। এখানে ড্রিস্‌কল ও আর্লবার্গ নামক দুইজন কর্মচারী আমাকে যথাসম্ভব সহায়তা করেন। ড্রিস্‌কলের পদবী কমিশনার অব্ এডমিনিষ্ট্রেশন আর আর্লবার্গ তাঁহার সহকারী।

পরদিনের কর্মসূচী স্থির করিয়া বৈকালে হোটেলে ফিরিলাম। ঐদিন বেশ রোদ ছিল। সকাল ন'টায় তাপ ছিল শূন্যের দশ ডিগ্রী নীচে। সর্বোচ্চ তাপ চার ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়াছিল। তখন বেলা ২টা। বৈকাল ৬টায় তাপ নামিয়া শূন্যে আসিল। রাত্রি ২টায় শূন্যের ষোল ডিগ্রী নীচে নামিয়া গেল।

বৈকালে হোটেল লাউঞ্জে বসিয়া আছি। লোকজন আসিতেছে, যাইতেছে। একটি বৃদ্ধ আমার পাশে আসিয়া বসিলেন। প্রশ্ন করিলেন—

"আপনি কোন্ দেশের লোক ?"

আমি—"ভারতবর্ষের"

বৃদ্ধ—"ইংরেজ কি আপনাদিগকে স্বাধীনতা দানে কৃতকার্য হইবে ?"

কথাটা কানে ঠেকিল। একটি ইংরেজী প্রবাদবাক্য আবৃত্তি করিলাম—"ইচ্ছা থাকিলে উপায় হইবেই।"

বৃদ্ধ—"আমাদের ভারতবর্ষে কোন স্বার্থ নাই। কাজেই ওদেশের খবর বিশেষ রাখি না। চীনে আমাদের কিছু স্বার্থ আছে। কাজেই চীনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ উদ্বেগ আছে।"

আমি—"আমরাও গত যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকার বিশেষ খবর রাখিতাম না। অবশ্য জর্জ ওয়াশিংটন ও এব্রাহাম লিঙ্কনের নাম অনেকেই জানিতেন।"

বৃদ্ধ মিন্নেসোটার হ্রদমালার সৌন্দর্য এবং আকর্ষণের কথা বলিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ উঠিয়া গেলে ভাবিলাম এমন কাট-খোট্টা কথাবার্তা এদেশে তো কাহারও কাছে শুনি নাই। বৃদ্ধের কথার মধ্যে ঘৃণাও নাই, প্রীতিও নাই। ভারতবর্ষ ও ইংরেজ-শাসন সম্বন্ধে এখানে ওখানে দু-একটি কথা শুনিয়া তাহার মনে যেটুকু দাগ লাগিয়াছে তাহাই সরলভাবে প্রকাশ করিলেন মাত্র।

পরদিন ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার। সকাল আটটায় তাপ খুব নামিয়া গেল। তখন তাপ শূন্যের ২২ ডিগ্রী নীচে। ১৯১৭

সনের পর নাকি এদেশে তাপ এত নীচে আর নামে নাই। তীব্র শীতের নানারূপ প্রতিক্রিয়ার কথা খবরের কাগজে পড়িলাম। শিশু অতিরিক্ত আবরণের চাপে দম বন্ধ হইয়া মরিয়া গিয়াছে। রেলগাড়ীর চাকা অতিরিক্ত শীতে ফাটিয়া গিয়াছে। ট্রেন চলাচল অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। টেলিফোন লাইন অকেজো হইয়া গিয়াছে। লোক ঠাণ্ডায় জমিয়া মরিয়া গিয়াছে। শীতের চোটে সতী পতি ছাড়িয়া আদালতে ডাইভোর্স-কেস আনিয়াছে। এক পত্নী নালিশ করিয়াছেন যে তাঁহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জমিয়া যাওয়া পর্যন্তও তিনি পতির সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু পরে আর থাকিতে পারিলেন না। পতিরও উষ্ণতর গৃহের ব্যবস্থা করিবার মত আথিক সংস্থান নাই। কাজেই বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থনা করিতে হইতেছে।

বেলা ৯টার পর বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন তাপ শূন্যের ১৮° ডিগ্রী নীচে। ক্রমশঃ বেলা একটায় শূন্যের ১০° ডিগ্রী নীচে গিয়া আরো নামিতে সুরু করিল।

সেদিন ক্যাপিটল ভবনে বহু সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হইল। এক দিনের মধ্যে অনেক কাজ শেষ করিতে হইল। সকলেরই ব্যবহার অমায়িক। আমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবার জন্য তাহাদের আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। আর্লবার্গ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু আলাপ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। আমার

এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ভারতবর্ষে বম্বেতে ডাক্তারী করিতেন। তাঁহার খবরও অনেক দিন পাই না।"

আমি—তাঁহার নাম একল্যাণ্ড। তিনি এখন রেনোতে ডাক্তারী করেন।

বার্গ (সবিস্ময়ে)—আপনি কি করিয়া জানিলেন ?

আমি—তাঁহার সঙ্গে আমার শিকাগোর এক হোটেলে সাক্ষাৎ হইয়াছে।

"আচ্ছা, ইঙ্গ-ভারতীয় সমস্যার আসল স্বরূপটি কি ?"

আমি—এক কথায় সমস্যাটি হইল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সমস্যা। উভয় পক্ষ এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধমত পোষণ করেন।

বার্গ—ইংরেজ বোধ হয় আপনাদের সঙ্গে সামাজিকতার ক্ষেত্রেও খারাপ ব্যবহার করে। ব্রেজিলের একটি ভদ্রলোক কিছুদিন পূর্বে আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন। যাইবার সময় তিনি আমাকে বলিলেন যে, আপনারা আমার সঙ্গে যেরূপ সহৃদয় ব্যবহার করিলেন ব্রেজিলের আমেরিকানগণ যদি স্থানীয় অধিবাসিগণের সহিত অনুরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে ব্রেজিল আমেরিকার প্রতি অন্যরূপ ধারণা পোষণ করিত।

আমি—অবশ্য কথায় বলে সুয়েজের পূর্বে গেলে ইংরেজের রূপান্তর হয়। কিন্তু সেটি মূল সমস্যা নয়, মূল সমস্যার অন্যতম বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র।

বার্গ—আপনাদের দেশে তো নানা মত, নানা রুচি।

আমি—ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ, প্রায় যুক্তরাষ্ট্রেরই মত। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেও বিভিন্নতা কম নয়। পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে রুচি, আচার, মত ও স্বার্থ বিভিন্ন। তথাপি এই আঞ্চলিক পার্থক্য এব্রাহাম লিঙ্কনের পর আর আপনাদের জাতীয় ঐক্যের বা স্বাধীনতার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় নাই।

বার্গ—আপনি ঠিক বলিয়াছেন।…দেখুন আমি জার্মান, কাল হেষ্টভেড আসিয়াছিল, সে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান। বহু দেশের লোক আসিয়া এখানে এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছে। বাহ্যিক পার্থক্য লইয়া কেহ এখানে কলহ করে না।

আমি—পার্থক্য শক্তিবৃদ্ধিরই কারণ হইয়া থাকে যদি না রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি তাহাকে অন্য কার্যে নিয়োগ করে। বিশেষত বহু দিনের পরাধীনতার ফলে এই সব পার্থক্যকে আশ্রয় করিয়া এক-একটি কায়েমী স্বার্থ শিকড় গাড়িয়া বসে। পরাধীনতা ও এই কায়েমী স্বার্থগুলিকে আমাদের যুগপৎ উৎপাটিত করিতে লইবে। অথচ সময়ও বেশী নাই। কাজেই বুঝিতেছেন আমাদের সমস্যা কি কঠিন। জর্জ ওয়াশিংটন ও এব্রাহাম লিঙ্কন যুগপৎ এই উভয় মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করাই আমাদের প্রয়োজন। সমস্যা যত কঠিনই হোক, আপনাদের ও সারা দুনিয়ার যখন শুভেচ্ছা রহিয়াছে তখন আমরা তাহার সমাধান করিবই।

ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে একটি বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইনি

গান্ধীভক্ত। গান্ধীজীর অহিংসাবাদ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিলেন। ম্যাক্ ক্র ইঞ্জিনীয়ার। এখানকার খনিজ লৌহের নমুনা দেখাইলেন। বলিলেন, "আপনাদের দেশের খনিতে অনেক বেশী লোহা আছে এবং আপনাদের দেশে লোহা, কয়লা ও চুনাপাথর খুব কাছাকাছি পাওয়া যায়।"

আমি যে রাষ্ট্রের অধিবাসী তাহার লোকসংখ্যা সম্বন্ধে কথা উঠিতে আমি বলিলাম—"উহা শুনিতে চাহিবেন না। শুনিলে হয়ত আপনাদের মাথা ঘুরিয়া যাইবে। বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা ছয় কোটি অর্থাৎ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যার অর্ধেক।"

আর. ভি. পাওয়ার্স এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার অব্ ট্যাক্সেশন। জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর সেদেশের ট্যাক্স আদায়ের বিভাগগুলিকে পুনর্গঠন পূর্বক সক্রিয় করিয়া তুলিবার ভার দিয়া ইহাকে জার্মানীতে পাঠানো হইয়াছিল। সেখান হইতে সদ্য ফিরিয়া আসিয়াছেন। বলিলেন—"জার্মানীতে দেখিয়াছি এক একটি জায়গায় এত লোক বাস করে যে আমরা ধারণা করিতে পারি না। আমি তো দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি।"

আর. এফ. হ্যাট্‌ফিল্ড সদ্য জাপান হইতে ফিরিয়াছেন। জাপানের আত্মসমর্পণের পর তাঁহাকে জাপানের রাজ-পরিবারের বাজেট ডিরেক্টর করিয়া পাঠানো হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "আপনি কাল চলিয়া যাইবেন। এই আবহাওয়ায় আপনাকে আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলে শুধু কষ্টই দেওয়া

হইবে। কারণ আমার বাড়ী শহরের বাহিরে। অদ্য রাত্রিতে নববর্ষ-উৎসব উপলক্ষে আমি সেণ্টপল হোটেলের ক্যাসিনোতে একটি টেবিল রিজার্ভ করিয়াছি। সেণ্টপল হোটেলের দূরত্ব আপনার হোটেল হইতে এক শত গজের অনধিক। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন কি?”

আমি—কতক্ষণ আপনাদের উৎসব চলিবে?

হ্যাট্‌ফিল্ড—নয়টায় সুরু হইয়া ভোর দুইটা-তিনটা পর্যন্ত চলিবে।

আমি—আমি বড় ঘুমকাতুরে। ঘণ্টাখানেক থাকিয়া চলিয়া আসিলে যদি দোষ না হয় তবে অবশ্যই যাইব।

হ্যাট্‌ফিল্ড—আপ.ন যেরূপ সুবিধা মনে করেন তাহাতে কোনই আপত্তি হইবে না।

হোটেলে ফিরিবার মুখে বার্গের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলাম। বার্গ বলিলেন, “আজ নববর্ষ-উৎসব আমাদের উচিত আপনাকে নিমন্ত্রণ করা।”

আমি—হ্যাট্‌ফিল্ড সেণ্টপল হোটেলে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

বার্গ—বেশ হইয়াছে। আমেরিকাবাসিগণ কিন্তু নববর্ষ উৎসবে প্রচুর মদ্য পান করে। আপনি কিছু মনে করিবেন না।

আমি—আমি যে মোটেই মদ্য পান করি না তাহাতে অন্যান্য সকলের অসুবিধা হইবে না তো?

বার্গ—কিছু না। আপনি কিন্তু আমাদিগকে মাতাল

মনে করিবেন না। এক দিনের জন্য সকলেই এখানে একটু ছেলেমানুষী করে।

নৈশ ভোজন সমাপনান্তে রাত্রি নয়টায় সেণ্টপল হোটেল অভিমুখে চলিলাম। হোটেলটি আমার হোটেলের খুব কাছে। হাঁটিয়া যাইতে দুই-তিন মিনিট মাত্র লাগিল। দারুণ শীতে সব জমিয়া যাইতেছে। সর্বত্র স্তূপাকার বরফ। ভিতরে ঢুকিয়াই ঈষত্তপ্ত বায়ু-সংস্পর্শে-আরাম বোধ করিলাম। গলাবন্ধ, কান-ঢাক্‌নি ও ওভারকোট রক্ষীর হেপাজতে রাখিয়া ক্যাসিনো ঘরে প্রবেশ করিলাম। জিজ্ঞাসা করিতে হ্যাট্‌ফিল্ডের টেবিলটি দেখাইয়া দিল। তখন হ্যাট্‌ফিল্ড-দম্পতি আসেন নাই। আমি একাকী বসিয়া কক্ষটির সজ্জা দেখিতেছি প্রত্যেক চেয়ারের সঙ্গে একটি করিয়া বেলুন বাঁধা। বেলুনগুলি নানা রঙের। পত্‌ পত্‌ করিয়া উড়িতেছে। প্রত্যেক টেবিলে যতগুলি চেয়ার ততগুলি বার্ণিশ করা কাগজের টোপর। টোপরগুলিও নানা রঙের। ক্রমশঃ নরনারীর সমাগম হইতে লাগিল। প্রত্যেকের পকেটে একটি করিয়া ছেলেদের খেলনা হারমোনিয়াম বাঁশী। সবাই আসিয়া টোপর মাথায় দিয়া বসিয়া পড়িতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া ছেলেদের মত সোৎসাহে বাঁশী বাজাইতেছেন। আর মাঝে মাঝে পানীয় পরিবেশকের নিকট পানীয় চাহিয়া লইয়া পান করিতেছেন। মনে হইল সবাই যেন বাল্যকালে ফিরিয়া গিয়াছেন।

কক্ষটি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। পার্শ্বে মঞ্চের উপর বাদকসম্প্রদায় বাদ্যযন্ত্রসমূহ লইয়া প্রস্তুত। সামনে নৃত্য-প্রাঙ্গণ।

কিছুক্ষণ পরে হ্যাট্‌ফিল্ড-দম্পতি প্রবেশ করিলেন। প্রাথমিক আলাপের পর হ্যাট্‌ফিল্ড-গৃহিণী পানীয় ফরমারেস করিলেন। আমি বলিলাম, "আমার পানীয় চাই না।" তিনি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আজকার দিনে একটু ?" আমি তখন কমলালেবুর রস চাহিলাম। আমি ছাড়া ইঁহাদের আরও দুই জন অতিথি ছিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোকটি হ্যাট্‌ফিল্ডের সঙ্গে গত বৎসর জাপানে ছিলেন। সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী। ইহাদের সকলেরই বয়স চল্লিশের কম। মহিলাদ্বয়ের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। ক্রমে আলাপ জমিয়া উঠিল, হ্যাটফিল্ড-গৃহিণী বলিলেন—"আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়াছি। গান্ধী ও নেহেরুর কথাও কিছু কিছু পড়িয়াছি।"

আমি—তবে তো আপনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন।

হ্যাট্‌ফিল্ড গৃহিণী—আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্যসত্যই কিছু জানি না।

আমি—আমেরিকা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা ততোধিক। বর্তমানে অবশ্য এদেশের কথা জানিবার ইচ্ছাটা খুব বাড়িতেছে। পূর্বে ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের নাম ভিন্ন বিশেষ কিছু জানিতাম না।

হ্যাট্‌ফিল্ড—এঁদের সম্বন্ধে আপনাদের কিরূপ ধারণা।

আমি—ইঁহাদের নিকট আমরা প্রেরণা লাভ করিয়াছি। ওয়াশিংটন এদেশকে স্বাধীন করিয়াছেন। লিঙ্কন এ দেশকে একতাবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা ছেলেবেলায় লিঙ্কনের একটি জীবনী পড়ি, বইখানির নাম 'কাষ্ঠকুটীর হইতে সাদাবাড়ী', আমি এবার সে কাষ্ঠকুটীর এবং 'সাদাবাড়ী' উভয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

গান্ধীজী, জওহরলাল ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কথা উঠিল। হ্যাট্‌ফিল্ড-গৃহিণী বলিলেন যে, একটি ইংরেজী কবিতা-সংগ্রহে তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা পড়িয়াছেন। হ্যাটফিল্ড বলিলেন—নেহেরুকে আমরা সহজে বুঝিতে পারি, কিন্তু বর্তমান যুগে গান্ধীনীতি আমরা বুঝি না। এ যুগে কি অহিংসা বা কুটীর-শিল্প চলিতে পারে?

সহসা হ্যাট্‌ফিল্ড-গৃহিণী বলিলেন—আচ্ছা, আপনি বলিয়াছেন যে আপনি স্বদেশেই শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ইংরেজী শিখিলেন কোথায়? আপনি শুধু দ্রুত এবং শুদ্ধ ইংরেজীই বলেন না, সমস্ত ইডিয়ম অতি সহজ ভাবে বলিয়া যান তাহা ইংরেজী ভাষার সহিত নিবিড় পরিচয় ভিন্ন সম্ভব নয়। তারপর আমরা উত্তুরে লোক, খুব দ্রুত কথা বলি। আমাদের দেশের দক্ষিণী লোকেরা বলে, আমরা এত দ্রুত কথা বলি যে তাহারা সব সময় ধরিতে পারে না। কিন্তু আপনার ত কোন অসুবিধা হইতেছে না।

আমি—বিলাত ও আমেরিকার বাহিরে যে এরূপ ইংরেজী শেখা যায় তাহা শুনিয়া আপনি অবাক হইতেছেন। কিন্তু আমরা 'একটা বিদেশী ভাষা শিখিবার জন্য কি পরিমাণ সময় ও শক্তি নষ্ট করি তাহা দেখিলে আপনি এর চেয়ে অনেক বেশী অবাক্ হইতেন। হ্যাট্ফিল্ড-গৃহিণী তাঁহাদের বন্ধুপত্নীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—ইনি খুব ধর্মশাস্ত্র চর্চা করেন।

বন্ধুপত্নী—আপনাদের দেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি কিরূপ ধারণা।

আমি—আমাদের বিশ্বাস, ঈশ্বরের কাছে যাইবার পথ অসংখ্য। যে যে পথেই চলুক না কেন সে ঈশ্বরের নিকটেই পৌঁছিবে। কাজেই অন্য পথাবলম্বীর সঙ্গে আমাদের কোন দ্বন্দ্ব তো নাই-ই, পরন্তু আমরা অন্য পথকে আমাদের নিজেদের পথের মতই শ্রদ্ধা ও মান্য করি।

হ্যাট্ফিল্ড—আচ্ছা, বৌদ্ধধর্মের সার কথা কি ?

আমি—আমি এসব বিষয়ে বড়ই অজ্ঞ। তবে যতদূর জানি বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা কর্মফলে বিশ্বাসী। বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের বা ঈশ্বর-কৃপার উপর জোর দেন না। তাঁহাদের মতে মানুষের স্বীয় কর্মফলই তার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করে।

হ্যাট্ফিল্ড-গৃহিণী—আপনার কথা শুনিয়া আত্মনির্ভরশীল বৌদ্ধধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল।

জাপানের কথা উঠিল। আমি হ্যাট্ফিল্ডকে জিজ্ঞাসা

করিলাম—জাপানে ভাষার জন্য বা সেখানকার কর্মপদ্ধতির নূতনত্বের জন্য আপনার কোন অসুবিধা হয় নাই ?

হ্যাট্‌ফিল্ড—বিশেষ কিছুই নয়। রাজ-পরিবারে সবাই ইংরেজী জানিতেন। আর আমাকে জাপানে পাঠাইবার পূর্বে দু'মাস ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছিল।

এখানে দেখিতেছি নূতন কাজে হাত দিবার পূর্বে সকলেই ট্রেনিং নেয়, আর সমস্ত বিষয়েই গবেষণার ব্যবস্থা আছে।

আমরা যখন এইরূপ আলাপ করিতেছি তখন নৃত্যবাদ্য ও হারমোনিয়াম বাঁশীর উচ্চ ধ্বনিতে কক্ষটি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কলরব ক্রমে কোলাহলে পরিণত হইতেছে। বন্ধু-পত্নীটি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি একবার কক্ষটির সর্বত্র ঘুরিয়া আসিলেন।

হ্যাট্‌ফিল্ড-গৃহিণী—আপনাকে আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল। তাহা হইলে অনেক বিষয়ে আলাপ করা যাইত। আপনি কি কালই চলিয়া যাইবেন ?

আমি—হাঁ।

তখন কক্ষমধ্যে নরনারীর সম্মিলিত বলনৃত্যের ধূম পড়িয়াছে। তালে তালে সুমধুর বাদ্য চলিতেছে। যাঁহারা নাচিতেছেন না তাঁহারা মাঝে মাঝে হারমোনিয়াম বাঁশী উচ্চৈস্বরে বাজাইয়া এবং কখনও করতালির দ্বারা গৃহটিকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছেন। নানা রঙের বেলুন উড়িতেছে। নরনারীর মাথায় নানা রঙের টোপর। তখন রাত্রি ১১টা

হইয়াছে। নববর্ষকে নাচিয়া গাহিয়া আনন্দ-কোলাহলের দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে হইবে। আমি দম্পতিদ্বয়ের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহাদিগকে এই আনন্দোন্মত্ত জনতার মধ্যে নিজেদের বিলাইয়া দিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়া চলিয়া আসিলাম। বাহিরে তখন তাপ শূন্যের ১২ ডিগ্রী নীচে। হিম-শীতল বায়ু বহিতেছে। চারিদিকে শুধু শুষ্ক বরফ।

দু'দিন পরে সংবাদপত্রে লণ্ডনের একটি ঘটনার এইরূপ বিবরণ পড়িলাম। একটি ভদ্রলোক নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে লণ্ডনের কোন হোটেলে একটি টেবিল রিজার্ভ করিবার জন্য বহু প্রকারে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হন। প্রত্যেক বারই জবাব পাইলেন যে, সমস্ত টেবিল রিজার্ভ হইয়া গিয়াছে—'হাউস্ ফুল'। শেষে ভদ্রলোকটি একটি চাল চালিলেন। টেলিফোনযোগে হোটেলের কর্তৃপক্ষকে বলিলেন, "আমি পোশোয়ারের মহারাজের সেক্রেটারী। নববষ উৎসব উপলক্ষে মহারাজের জন্য আপনার হোটেলে চারিটি আসনযুক্ত একটি টেবিল রিজার্ভ করিতে পারেন কি?" সঙ্গে সঙ্গে টেবিল রিজার্ভ হইয়া গেল। ভদ্রলোক নিজে পেশোয়াবের মহারাজা এই পরিচয় দিয়া বন্ধুবান্ধব লইয়া সেই হোটেলের নববর্ষ উৎসবে যোগদান করিলেন। হোটেলেব কর্তৃপক্ষ জানিলেন না যে, পেশোয়ারের মহারাজা বলিয়া কোন মহারাজা নাই।

সপ্তম অধ্যায়

নিউইয়র্ক

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে হোটেল ত্যাগ করিয়া সেণ্টপল মিনিয়া-পলিসের বিমান-ঘাঁটিতে পৌঁছিলাম। দেখিলাম এখানে পূর্ব এবং প্রাচ্য কথা দুইটি দ্বারা দুটি বিপরীত দিক সূচিত হইতেছে। প্রাচ্যদেশগামী বিমান পশ্চিমাভিমুখে রওনা হইয়া উত্তর মেরুর উপর দিয়া উড়িয়া জাপানে পৌঁছিবে। এ লাইনটি নূতন খুলিয়াছে। পূর্ব-দেশগামী বিমান পূর্বাভিমুখেই গিয়া নিউইয়র্ক পৌঁছিবে। বিমান সাধারণ লোকের শুধু কালজ্ঞানেই বিভ্রাট ঘটায় নাই; দিক-জ্ঞানেও বিভ্রাট সৃষ্টি করিতেছে।

সেণ্টপল হইতে নিউইয়র্ক বিমানপথে ১০৪৬ মাইল। সকালে বিমান নিউইয়র্ক ছাড়িয়া কোথাও না থামিয়া সেণ্টপল পৌঁছিবে। সেই বিমানই আবার বৈকালে সেণ্টপল ছাড়িয়া সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক পৌঁছিবে। বিমানটি বড় কন্‌ষ্টিলেশন শ্রেণীর। ১০৪৬ মাইল পথ ৪ ঘণ্টায় যায়।

বিমানটি সেণ্টপল ছাড়িয়া দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী হইয়া মিল-ওয়াকীর উপর দিয়া উড়িয়া মিশিগ্যান হ্রদ পাড়ি দেয়। তারপর মিশিগ্যান, হুরণ ও ইরী হ্রদ দ্বারা তিন দিকে পরি-বেষ্টিত ভূমিখণ্ড অতিক্রম করিয়া ডেট্রয়েটের নিকট ইরী হ্রদ পাড়ি দিতে সুরু করে। মিলওয়াকী হইতে ডেট্রয়েট সিধা পূর্ব

দিকে। ডেট্রয়েটের নিকট হ্রদটি খুব সরু। ওপারেই ক্যানাডা এবং অদূরে টরোণ্টো নগরী। বিমানটি ডেট্রয়েট হইতে একটু দক্ষিণে বাঁকিয়া ক্লিভল্যাণ্ডের নিকট ইরী হ্রদ অতিক্রম করে। সেখান হইতে নিউইয়র্ক সোজা পূর্বে। ক্লিভল্যাণ্ড ছাড়াইবার কিছু পরেই বাম দিকে অর্থাৎ উত্তরে নায়াগ্রা জলপ্রপাত। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে বিমানে বসিয়া সূর্যকরোজ্জ্বল প্রপাতটি দেখা যায়।

সেদিন নিউইয়র্ক হইতে আসিতে বিমানটির প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব হইল। তিনটায় সেণ্টপল ত্যাগ করিল। স্তিমিত দিবা-লোকে মিলওয়াকী অতিক্রম করিয়া মিশিগ্যান হ্রদের উপর দিয়া উড়িতেছি। নীচে সমুদ্রোপম হ্রদের শুভ্র-মেঘ-খচিত নীলাম্বুরাশি নিবাণপ্রায় দিবালোকে অপূর্ব দেখাইতেছিল। ক্রমশঃ দশদিক অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। স্থির বিমানে বসিয়া তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে জানি না। সহসা তন্দ্রাভঙ্গ হইল। দেখি সামনে লেখা পড়িয়াছে "আসন-বন্ধ আঁটিয়া দিন। ধূমপান করিবেন না।" ঘড়িতে দেখিলাম তখনও সাতটা বাজে নাই। দ্রুত চলিয়া চার ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই নিউইয়র্ক পৌঁছিতেছি ভাবিয়া প্রফুল্লতা বোধ করিলাম। বিমান নামিতে সুরু করিল। সহসা ষ্টুয়ার্ডেস্ আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে, আমরা মিলওয়াকীতে অবতরণ করিতেছি। ক্যাপ্টেন আসিয়া বলিলেন, "আমরা ডেট্রয়েট পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। নিউইয়র্কে খুব বরফ

পড়িতেছে। হাওয়া আপিস কোন বিমানকেই সেদিকে অগ্রসর হইবার ইঙ্গিত দিতেছে না। ডেট্রয়েটে অবতরণ করিবার অনুমতিও পাই নাই। কাজেই মিলওয়াকীতে ফিরিতে হইয়াছে। আপনাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম বিমান-ঘাঁটিতে জানিতে পারিবেন।”

মিলওয়াকীতে নামিয়া কিছুক্ষণ ভাবী প্রোগ্রামের কোন আভাস মিলিল না। যাত্রীদল চঞ্চল। প্রায় ১ ঘন্টা পরে ঘোষণা করা হইল, “যাঁহারা আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত এখানে থাকিতে চান তাঁহাদের জন্য শহরে হোটেলের ব্যবস্থা করা হইবে। আর যাঁহারা শিকাগো যাইতে চান তাঁহাদের বাসে করিয়া এক্ষুণি শিকাগো পৌছাইয়া দেওয়া হইবে। সেখান হইতে কোম্পানীর স্থানীয় কর্মচারিগণ ট্রেনে বা অন্য প্লেনে যাত্রীদের নিউইয়র্ক পৌছাইবার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিবেন।

ওয়েব্‌ষ্টার ও আমি অন্য ২০।২২ জন যাত্রীসহ বাসে গিয়া উঠিলাম। মিশিগ্যান হ্রদের তীর দিয়া বাস দ্রুতবেগে সিধা দক্ষিণে চলিতেছে। সুন্দর মসৃণ রাস্তা, সর্বত্র উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। দুই ঘণ্টায় প্রায় ১০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটে কোম্পানীর শিকাগো আপিসে পৌছিলাম। সেখানে যাহা খবর পাইলাম তাহা এইরূপ: আগামী কল্য দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সমস্ত বিমানের নিউইয়র্ক গমন বা নিউইয়র্ক ত্যাগ বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিউইয়র্কের আকাশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই বিরতি-কাল আরও বাড়াইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। যাত্রী-গণের মধ্যে যাঁহারা বিমানেই বাকী পথটুকু যাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের জন্য লাইন না খোলা পর্যন্ত হোটেলে স্থান সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইবে। রাত্রি ১১টা ১৫ মিনিটে নিউইয়র্ক-গামী একটি ট্রেন শিকাগো ত্যাগ করিবে। ট্রেনটি ১৯ ঘণ্টায় অর্থাৎ পরদিন সন্ধ্যা ছ'টায় নিউইয়র্ক পৌঁছিবে। শিকাগো হইতে ট্রেনে নিউইয়র্কের দূরত্ব প্রায় ১০০০ মাইল। সেই ট্রেনে কিরূপ স্থান আছে তাহার খবর লওয়া হইতেছে। যদি স্থান থাকে তবে যাঁহারা ট্রেনে যাইতে চান তাঁহাদিগকে টিকেট দিয়া ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে।

কেহ কেহ অনির্দিষ্ট কালের জন্য শিকাগোতেই থাকিয়া গেলেন। আমি ট্রেন ভ্রমণ পছন্দ করিলাম। সময় খুব কম। তাড়াতাড়ি কোম্পানীর একটি গাড়ী ধরিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, তখন ট্রেন ছাড়িবার পাঁচ মিনিট বাকী। বিমান কোম্পানী-প্রদত্ত চিঠির বদলে ষ্টেশনে টিকিট মিলিবার কথা। দেখি কাউন্টারে উহা লইয়া টিকিট বিক্রেতার সঙ্গে ওয়েবষ্টারের বচসা উপস্থিত। আমি আগাইয়া গিয়া মধ্যস্থতা করিয়া টিকিট সংগ্রহপূর্বক ব্যাগ কাঁধে করিয়া দ্রুত ট্রেনের দিকে ছুটিলাম। দু' এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঠিক প্লাটফর্মে প্রবেশ করিয়া লম্বা ট্রেনের শেষ কামরায় উঠিয়া পড়িলাম। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ট্রেনে কেন্দ্রীয় তাপ-ব্যবস্থা আছে। ভিতর দিয়া এক

গাড়ী হইতে অন্য গাড়ীতে যাইবার বন্দোবস্ত আছে। এখানে রেল কোম্পানী ও পুলম্যান কোম্পানী স্বতন্ত্র। রেল কোম্পানী কোচ অথবা পুলম্যানের টিকিট দেয়। কোচের টিকিটে আসন মিলে। কিন্তু পুলম্যানের টিকিটে কোন বার্থ বা আসন মিলে না। পুলম্যান কোম্পানীকে অতিরিক্ত মাশুল দিয়া বার্থ বা বেড্‌রুম সংগ্রহ করিতে হয়। ওয়েব্‌ষ্টার ও আমি ব্যাগ বহন করিয়া আগাইয়া যাইতেছি। পথে পুলম্যান কোম্পানীর কর্মচারীর সাক্ষাৎ পাইলাম। কোন বার্থ খালি নাই। একটি বেড্‌রুম বা শয়নকক্ষের ঠিকানা দিয়া আমাদিগকে সেখানে যাইতে বলিলেন। কোম্পানীর লোক তখন আমাদের ব্যাগ লইয়া সেই কক্ষে পৌঁছাইয়া দিয়া বিছানা প্রভৃতি পাতিয়া দিল। শয়নকক্ষে দুইটি বার্থ। একটি উপরে, একটি নীচে। আমি নীচে রহিলাম। ওয়েব্‌ষ্টার উপরেরটি দখল করিলেন। বিমান কোম্পানী আমাদের শুধু পুলম্যানের মাশুল ফেরত দিয়াছিলেন। শয়নকক্ষের অতিরিক্ত ভাড়া আমাকেই দিতে হইল। শয়নকক্ষের নীচের বার্থকে দিনের বেলায় আরামদায়ক কৌচরূপে ব্যবহার করা যায়।

রাত্রে ভালই ঘুম হইল। দিনে দ্রুতগামী ট্রেনে বসিয়া হিমার্তা পৃথিবীর অপূর্ব রূপ দেখিতেছি। আকাশে তখনও ঝড়ের আভাস। রোদ ওঠে নাই। প্রবল বায়ু বহিতেছে। মানুষ বাধ্য হইয়া ঘরের মধ্যে আটকা পড়িয়াছে। প্রকৃতি তাঁর সমস্ত শোভা গুটাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার রিক্ত নিরাভরণ

অঙ্গের উপর হিমরাশি স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরে সন্ধ্যা সাতটায় ট্রেন নিউইয়র্ক পৌছিল। শহর তখনও বরফে ঢাকা।

নিউইয়র্ক শহর ছয়টি 'বরোতে' বিভক্ত। ম্যান্হ্যাটন্, ব্রুক্লিন, ব্রঙ্কস্, কুইন্স ও রিচমণ্ড। এই পাঁচটি 'বরোর' মোট লোকসংখ্যা ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে ছিল ৭৭,৫৬,৬১১ জন। উপকণ্ঠে আরও ৫০ লক্ষ লোক বাস করে।

উপরোক্ত 'বরো'গুলির মধ্যে ম্যানহ্যাটন 'বরোটি' সর্বশ্রেষ্ঠ। এটি সরু লম্বা একটা ফালির মত। দক্ষিণাংশ ক্রমশীর্ণায়মান হইয়া আটলান্টিক মহাসাগরে একটি সূক্ষ্মাগ্র শীর্ষে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পশ্চিমে হাড্সন নদী, পূর্বে ইষ্ট নদী এবং উত্তর-পূর্বে হার্লেম নদী হাডসন ও ইষ্ট নদীদ্বয়কে সংযুক্ত করিয়া ম্যানহ্যাটনকে একটি সম্পূর্ণ দ্বীপের আকৃতি প্রদান করিয়াছে। ইষ্ট ও হার্লেম নদীর ওপারেও নিউইয়র্ক শহর। হাডসনের ওপারে নিউ জার্সি শহর। তিনটি নদীরই উপরে সেতু ও নীচে সুড়ঙ্গপথ। ম্যানহ্যাটন দৈর্ঘ্যে সাড়ে বারো মাইল। ইহার প্রশস্ততা যেখানে সব চেয়ে বেশী সেখানে আড়াই মাইল।

ম্যানহ্যাটন 'বরো'টি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ১৪টি সমান্তরাল এভিনিউ এবং পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ২২০টি সমান্তরাল রাস্তা দ্বারা বিভক্ত। হাডসন্ নদীতীরে রুজভেল্ট মোটর-রাস্তা। তারপর ১ম, ২য় করিয়া ইষ্ট নদীতীরস্থ ১২তম এভিনিউ পর্যন্ত ১২টি এভিনিউ। ৩য় ও ৪র্থ এভিনিউর মধ্যে

লেক্সিংটন এভিনিউ এবং ৪র্থ ও ৫ম এভিনিউর মধ্যে ম্যাডিসন এভিনিউ অবস্থিত। ৪র্থ এভিনিউর অপর নাম পার্ক এভিনিউ। সেইরূপ ৬ষ্ঠ এভিনিউর অপর নাম এভিনিউ অব দি আমেরিকাস্। ইহা ছাড়া ব্রড্‌ওয়ে নামক উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটি রাস্তা একটু বাঁকিয়া ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম এভিনিউকে কাটিয়া গিয়াছে। ষ্ট্রীট্‌গুলির নামকরণ দক্ষিণ হইতে আরম্ভ হইয়া ১ম, ২য় করিয়া পর পর উত্তর দিকে চলিয়াছে। শহরের মধ্যস্থলে কেন্দ্রীয় পার্ক। পার্কটি আয়তনে ৮৪০ একর; পূর্ব-পশ্চিমে ৫ম হইতে ৮ম এভিনিউ পর্যন্ত এবং উত্তর-দক্ষিণে ৫৯তম হইতে ১১০তম ষ্ট্রীট্ পর্যন্ত বিস্তৃত।

শহরের নিম্নাংশে অর্থাৎ দক্ষিণাংশে টাকাব বাজার। সারা তুনিয়াব বিরাট টাকার বাজার আজ এই স্থানে। বিশ্ব-বিখ্যাত ওয়াল ষ্ট্রীট এই অংশে অবস্থিত। অদূরে সিটি হল ও সিটি পার্ক। এই অংশটি আট্‌লান্টিক উপকূল হইতে ২২তম ষ্ট্রীট পযন্ত বিস্তৃত।

২৩তম ষ্ট্রীট হইতে কেন্দ্রীয় পার্ক বা ৫৯তম ষ্ট্রীট পর্যন্ত মধ্য ম্যানহাটন। এখানে বহু বড় বড় হোটেল, ব্যবসাকেন্দ্র এবং দোকান অবস্থিত। এখানকার রক্‌ফেলার কেন্দ্রটি একটি স্বতন্ত্র নগরবিশেষ। এই অঞ্চলে পঞ্চম এভিনিউর 'মেসি', 'সাক্‌স' প্রভৃতি দোকানগুলিতে সূচ হইতে এরোপ্লেন পর্যন্ত যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ সর্বদা প্রস্তুত থাকে। প্রসিদ্ধ ওয়াল্‌-ডর্ফ এষ্টোরিয়া হোটেল, পৃথিবীর উচ্চতম বাড়ী এম্পায়ার

ষ্টেট্ বিল্ডিং, রঙ্গালয়বহুল টাইমস্ স্কোয়ার, ক্রীড়া-ভূমিযুক্ত ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন প্রভৃতি এই অঞ্চলে অবস্থিত।

উত্তর ম্যান্‌হ্যাটন্ লোকবসতি-প্রধান। কলম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় এই অঞ্চলে অবস্থিত। ইষ্ট নদীর তীর দিয়া এখানকার সৌখীন লোকদের বসতি। এই অঞ্চলে পূর্ব ৯৪তম ষ্ট্রীটে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সমিতির আশ্রম।

হাডসন ও ইষ্ট নদীতে জাহাজ নোঙ্গর করিবার বহু পায়ার বা ঘাট। বড় জাহাজগুলি হাডসন নদীতেই প্রবেশ করে।

আটলান্টিক হইতে হাডসন নদীর প্রবেশপথে পৃথিবীর বৃহত্তম মূর্তি অবস্থিত। ইহা 'স্বাধীনতার মূর্তি' নামে পরিচিত। ঊর্ধ্ব-বাহু স্বাধীনতা-দেবী আকাশে স্বাধীনতার মশাল সর্বদা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। মঞ্চের ভূমি হইতে মশালের অগ্রভাগ পর্যন্ত মূর্তিটির উচ্চতা ৩০৫ ফুট। ইহার দক্ষিণ তর্জনীর দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ও পরিধি ৫ ফুট। ফ্রান্স ও আমেরিকার বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ উভয় জাতির যুক্তদানে মূর্তিটি নির্মিত হইয়াছিল। সেদিন ফ্রান্সের দানই ছিল সমধিক। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করা হয়।

আমি যে হোটেলে উঠিলাম তাহার নাম হেন্‌রী হাডসন হোটেল। ২৪ তলা হোটেলের ১৬ তলায় আমার ঘর। মধ্য-ম্যান্‌হ্যাটনে ৮ম ও ৯ম এভিনিউর মধ্যবর্তী অংশে পশ্চিম ৫৭তম ষ্ট্রীটে হোটেলটি অবস্থিত। ষ্ট্রীট্‌গুলির ৫ম এভিনিউর পূর্বাংশ পূর্ব বলিয়া এবং পশ্চিমাংশ পশ্চিম বলিয়া অভিহিত হয়।

২রা জানুয়ারী সন্ধ্যায় আমি নিউইয়র্ক পৌঁছাই। ৮ই জানুয়ারী বুধবার প্রাতঃকালে আমাকে অটোয়া অভিমুখে রওনা হইতে হইবে। এর মধ্যে শনি ও রবিবার ছুটি। আপিস খোলা থাকিবে মাত্র তিন দিন; শুক্র, সোম ও মঙ্গলবার। এর মধ্যে অনেক কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।

আমার নিউইয়র্কে অবস্থান কালে তাপ ২২° হইতে ৩৫° ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠানামা করিতেছিল, ফলে এখানে বরফ পড়িলে তাহা গলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে চলাফেরার অসুবিধাই হয়। তবে এরা খুব দ্রুত বরফ সাফ করিয়া ফেলে। এই শহরের বরফ ফেলিবার খরচ বৎসরে দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা। বুধবার ও বৃহস্পতিবার যে বরফ পড়িয়াছিল শুক্রবারেব মধ্যেই তাহা সাফ করিয়া ফেলা হইল। পরবর্তী দিনগুলি ভালই কাটিল।

৩রা জানুয়ারী শুক্রবার সকালে ট্যাক্সি লইয়া সিটি আপিসের দিকে চলিলাম। ট্যাক্সিওয়ালা আলাপ সুরু করিল। বলিল, "আমার ভাই যুদ্ধে গিয়াছিল। যুদ্ধেব সময় ভারতবর্ষে ছিল। ভারতবর্ষ বেশ ভাল দেশ। আমার ভাই সেখানে পরম আরামে ছিল। তার দুই-তিনটা বেয়ারা ছিল, ডাকিলেই 'হুজুর' বলিয়া হাজির হইত।"

'হুজুর' কথাটা হিন্দুস্থানীতে উচ্চারণ করিল। এদেশের লোক ব্যক্তিগত চাকর রাখিতে অভ্যস্ত নয়। কাজেই ব্যক্তিগত চাকরের কথায় এরা বেশ আমোদ অনুভব করে। আমি

বলিলাম, "তুমি আমাদের ভাষায় একটু আধটু কথা কহিতে শিখিলে কিরূপে?"

"ভাইয়ের নিকট শুনিয়া শিখিয়াছি। আমি হিন্দুস্থানী ভাষার আরও কিছু কিছু কথা জানি। 'যাও', 'বকশিশ'। কেমন, ঠিক বলি নাই? আমার ভাই বেশ হিন্দুস্থানী বলিতে পারে। তুমি যাইবে আমার বাড়ী? যে রাস্তায় আমরা সিটি হলে যাইব সেখান থেকে একটু বাঁকিলেই আমাদের বাড়ী। আমার ভাই তোমার সঙ্গে হিন্দুস্থানীতে কথা বলিয়া খুবই খুশী হইবে।"

আমি বলিলাম, "আমিও খুশী হইতাম। কিন্তু সিটি আপিসে ঠিক এগারটায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করিবার কথা। আর তো সময় নাই।"

ট্যাক্সিওয়ালা দুঃখিত হইল। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার কথা বলিবার উৎসাহ কমে না। বলিল, "তোমার দেশের ট্যাক্সিওয়ালারা বক্‌শিশের জন্য বড় বিরক্ত করে, না? আমার ভাই একবার অল্পদূর গিয়া এক টাকা বক্‌শিশ দিল। কিন্তু তোমার দেশের ট্যাক্সিওয়ালা আরও চায়। তখন আমার ভাই বলিল; আচ্ছা টাকাটা ফেরত দাও। টাকাটা ফেরত নিয়া বলিল, 'যাও'। ট্যাক্সিওয়ালা বেকুব বনিয়া চলিয়া গেল।" 'যাও' কথাটি সোৎসাহে হিন্দুস্থানীতে উচ্চারণ করিল। ইহাতে তাহার পরম পরিতোষ।

সিটি আপিসে নামিয়া ভাড়ার অতিরিক্ত বক্‌শিশ বাবদ

৫০ সেণ্ট দিবার মানসে একটি ডলার বাহির করিয়া উহাকে দিলাম। সে বলিল, "তোমার দেশের ট্যাক্সিওয়ালা কিন্তু কিছুই ফেরত দিত না। আমার কাছে কত ফেরত চাও?" আমি বলিলাম, "তুমি গোটা ডলারটিই লও।" আমি আপিসের দিকে চলিয়া গেলাম। সেও প্রফুল্ল চিত্তে অন্তর্হিত হইল।

সিটি আপিসে কণ্ট্রোলার লেজারাস জোসেফ ও সেক্রেটারী এডোয়ার্ড আর এঙ্কার মহাশয়দ্বয়ের সহিত নগরীর বাজেট, কর-সংগ্রহ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলাপ করিয়া সোম ও মঙ্গলবারের প্রোগ্রাম স্থির করিয়া নগর-শাসন সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক ও কাগজপত্রাদি সঙ্গে লইয়া হোটেলে ফিরিলাম।

বৈকালে রামকৃষ্ণ মিশনেব স্বামী অখিলানন্দের সহিত দেখা করিতে বার্কমায়ার হোটেলে গেলাম। অপ্রত্যাশিত রূপেই স্বামীজীর দর্শন মিলিয়াছিল। শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার আমাকে স্বামীজীর নিকট একখানি পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। স্বামীজীর আশ্রম প্রভিডেন্সে। আমার সফর তালিকার মধ্যে প্রভিডেন্সের স্থান ছিল না। কাজেই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না ভাবিয়াছিলাম। শিকাগোয় স্বামী বিশ্বানন্দ আমাকে বলিয়াছিলেন যে স্বামীজী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বষ্টনে বেদান্তের ক্লাস করিতে আসিবেন এবং তাঁহার বষ্টনের টেলিফোন নম্বরও আমাকে দিয়াছিলেন। বৃহস্পতি

বার সন্ধ্যায় বষ্টনে টেলিফোনযোগে স্বামীজীকে পাইতেই তিনি বলিলেন যে শুক্রবার কয়েক ঘণ্টার জন্য জনৈক মার্কিন শিষ্যার সহিত তিনি নিউইয়র্ক আসিতেছেন। এদেশের টেলিফোনের ক্ষিপ্রতা আমার বিস্ময় উৎপাদন করিত। ট্রাঙ্ক লাইনে দূরস্থিত বষ্টনের সংযোগ মুহূর্ত্তের মধ্যে পাইয়া গেলাম। কলিকাতায় ভবানীপুর হইতে আলিপুরের সংযোগ পাইতেও তদপেক্ষা বেশী সময় লাগে। স্বামীজী ও তাঁহার বর্ষীয়সী মার্কিন শিষ্যার সহিত আলাপ করিয়া পরম আপ্যায়িত বোধ করিলাম। বেলুড় মঠের মর্ম্মরমন্দির ইঁহারই শিষ্যাগণের দানে সম্ভব হইয়াছে।

শনিবার সকালে এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিঙের ছাদে গিয়া উঠিলাম। কিছু প্রবেশমূল্য লইয়া ইহারা দর্শনার্থিগণকে ছাদে উঠায়। শ্রেণীবদ্ধ অসংখ্য লিফট্ নরনারীকে উঠাইতেছে ও নামাইতেছে।

৫টি বা ৬টি করিয়া তলার জন্য এক একটি লিফট্ নির্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক লিফট্ শুধু নির্দিষ্ট তলা কয়টিতেই ওঠানামা করে। এতদ্ভিন্ন এক্সপ্রেস লিফট্ আছে। সেগুলি সকল তলায় না থামিয়া দ্রুত একটি বা দুইটি নির্দিষ্ট তলায় চলিয়া যায়। ছাদে উঠিতে আমাদের একবার লিফট্ বদল করিতে হইল। প্রথম এক্সপ্রেস লিফট্ কোথাও না থামিয়া আমাদিগকে ৮৭ তলায় লইয়া গেল। দ্বিতীয় এক্সপ্রেস লিফট্ ৮৭ তলা হইতে ছাদ পর্য্যন্ত চলে। অন্য কোথাও থামে না।

মধ্য-ম্যান্হ্যাটনে ৫ম এভিনিউ ও ৩৪তম ষ্ট্রীটের সংযোগ-স্থলে বাড়ীটি অবস্থিত। বাড়ীটি ১০২ তলা, ১২৫০ ফুট উচ্চ—পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম। একবার নাকি একটি এরোপ্লেন এই বাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ছাদ হইতে নিউ ইয়র্ক নগরীর দৃশ্য অপূর্ব। আকাশচুম্বী সৌধমালা এখান হইতে ছোট মনে হয়। অদূরে ১০৪৬ ফুট উচ্চ, ৭৭ তলা ক্রাইস্লার বিল্ডিং। ইহা পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতায় দ্বিতীয় বাড়ী। রক্ফেলার কেন্দ্রের উচ্চতম ৭০ তলা আর, সি, এ বিল্ডিং উচ্চতায় তৃতীয়। দক্ষিণে ৬০ তলা বিশিষ্ট উল-ওয়ার্থ বিল্ডিং। ৫০ তলা, ৬০ তলা বাড়ীর অভাব নাই। সমস্ত শহরটি ছাদের উপব হইতে চক্ষের সামনে ভাসিযা উঠে। দক্ষিণে স্বাধীনতার মূর্তি পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। পূবে ও পশ্চিমে নদী। নদীতে ইতস্ততঃ ভাসমান জাহাজসমূহ। নদীর উপর সেতুসমূহ দৃশ্যমান। হাডসনেব ওপাবে নিউ জার্সি শহর। দূরে ক্যাটস্কিল পর্বতমালা। ইষ্ট নদীর ওপারে ব্রুকলিন্। বহু দূরে লাগার্ডিয়া এরোড্রোম। দূরে হাডসনেব উপবিস্থিত জর্জ ওয়াশিংটন সেতু। উত্তরে কেন্দ্রীয় পার্ক সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে। ওয়াল্ডর্ফ এষ্টোরিয়া হোটেল বেশীদূর নয়। আমাব হোটেলটিও দেখা যাইতেছিল। রাস্তায় প্রবহমান নদীর মত জনস্রোত ও শকটশ্রেণী। গাড়ীগুলি চলিতে চলিতে ইষ্ট নদীর টানেলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। সমস্ত মিলিয়া এক অতুলনীয় দৃশ্য।

বিকালে রক্‌ফেলার-কেন্দ্রে গেলাম। দর্শনার্থীদের এক একটি দল লইয়া এক একটি গাইড সমস্ত কেন্দ্রটি দেখাইতেছে। কয়েক মিনিট পর পরই এক একজন গাইড এক একটি দল লইয়া রওনা হইতেছে।

উক্ত কেন্দ্রটি ১৪টি আকাশচুম্বী সৌধের সমষ্টি ; ৫ম ও ৬ষ্ঠ এভিনিউর মধ্যে ৪৮তম ষ্ট্রীট হইতে ৫১তম ষ্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত। বাড়ীগুলির উচ্চতা সমান নয়। উচ্চতম বাড়ীটি ৭০ তলা। বহু দোকান, আপিস, থিয়েটার প্রভৃতি এই গৃহসমষ্টির মধ্যে অবস্থিত। ৩০,০০০ কর্মচারী প্রত্যহ এই বাড়ীটিতে কাজ করিতে আসে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় ও ছুটির সময় এই ত্রিশ হাজার লোককে উঠানো ও নামানো লিফট্‌গুলির একটি বিরাট কার্য। প্রত্যহ নানাবিধ কার্যোপলক্ষে এই বাড়ীতে কয়েক লক্ষ লোক প্রবেশ করে। এত বড় অঞ্চলের কেন্দ্রীয় তাপ-ব্যবস্থা ও সুড়ঙ্গপথশ্রেণী বিস্ময়কর বস্তু। বস্তুতঃ ইহা একটি স্বতন্ত্র নগরবিশেষ।

বাড়ীগুলির মধ্যে বহু হোটেল ও আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত আছে। একস্থানে ছেলেমেয়েরা স্কেট করিতেছে। দেখিতে বেশ লাগিল। পৃথিবীর বৃহত্তম রঙ্গমঞ্চ ইহারই একটি বাড়ীর মধ্যে অবস্থিত। এখানে ৬,২০০ লোকের বসিবার আসন বিদ্যমান। একটি বাড়ীর নাম আন্তর্জাতিক বাড়ী। ইহাতে ইংরেজ, ফরাসী, ইটালী, ভারতীয় প্রভৃতি বহু জাতির কন্‌সালগণের আপিস। একটি বাড়ীতে

রেডিওতে নানা অনুষ্ঠান চলিতেছে। ছোট ছেলেমেয়েদের একটি গীতাভিনয় আমাদের সমক্ষে প্রচারিত হইল। এখানে টেলিভিশন দেখিতে পাইলাম। আমাদেরই মধ্যে কেহ কেহ দূরের একটি ঘরে গিয়া কিছু আবৃত্তি করিলেন বা অন্য কথা-বার্তা বলিলেন। এ ঘরে যন্ত্রেব উপরে তাঁহাদের চেহারা ও অঙ্গসঞ্চালন ভাসিয়া উঠিল। আমরা তাঁহাদিগকে পরিষ্কার দেখিলাম ও তাঁহাদের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনিলাম। ইহার কয়েকদিন পরে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সর্বপ্রথম তাঁহার "সাদা বাড়ী"তে বসিয়া টেলিভিশন যোগে কংগ্রেসের অধিবেশন দেখিলেন ও বক্তৃতাদি শুনিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন টেলিভিশন যোগে সাধারণ্যে প্রচার করা সঙ্গত কিনা এ সম্বন্ধে তখন খবরের কাগজে আলোচনা চলিল। এক পক্ষ ইহার বিরোধিতা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "কংগ্রেসের অধিবেশনকালে সভ্যগণের আচরণ প্রত্যক্ষ করিলে কংগ্রেসের উপর এবং কংগ্রেসের পাস করা আইনের উপর সর্বসাধারণের অশ্রদ্ধা আসিবে।"

ঐ দিন রাত্রে নিউইয়র্কস্থ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমিতির বাড়ীতে গিয়া সমিতির অধ্যক্ষ অখিলানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করি। ১৭নং পূর্ব-৯৪তম ষ্ট্রীটে সমিতির নিজস্ব বাড়ী। স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম এবং পরদিন সকালের প্রার্থনা-সভায় এবং মধ্যাহ্ন-ভোজনে উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

স্বামীজীর নিকট সংবাদ পাইলাম যে মহলানবিশ-গৃহিণী নিউ জার্সিতে ডাক্তার শুহার্ট নামক এক প্রসিদ্ধ সংখ্যাতত্ত্ববিদের গৃহে অতিথি রূপে অবস্থান করিতেছেন।

রবিবার সকালে নিউ জার্সিতে টেলিফোন করিয়া জানিলাম যে মহলানবিশ-গৃহিণী নিউ ইয়র্কে এক ভারতীয় ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটে দুই দিন যাবৎ আছেন। সেখানে টেলিফোন করিতেই মহলানবিশ-গৃহিণী তৎক্ষণাৎ আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে প্রাতরাশে যোগ দিতে বলিলেন। ফ্ল্যাটটি দূরে ছিল না— অধিবাসী একজন যুক্তপ্রদেশীয় ভদ্রলোক। তাঁহার পত্নী মার্কিন, বংশে রুশ। মাত্র এক কক্ষের ফ্ল্যাট। অতিথিসেবা-পরায়ণা মহিলাটি স্বামীকে বন্ধুগৃহে ঘুমাইতে পাঠাইয়া মহলানবিশ-গৃহিণীকে স্বীয় কক্ষে অভ্যর্থনা করিয়া স্থান দিয়াছেন। আমি পৌঁছিবার একটু পরেই ভদ্রলোক স্বগৃহে ফিরিলেন। তিনি ইঞ্জিনীয়ার। অনেক দিন এদেশে আছেন। তাঁহার মার্কিন গৃহিণী স্বহস্তে প্রাতরাশ প্রস্তুত ও পরিবেশন করিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। প্রাতরাশের টেবিলে একটি বাটিতে পাইন বৃক্ষের কতকগুলি কাঁচা পাতা জ্বালাইয়া দিলেন। এই অভিনব গন্ধে আমোদিত বোধ করিলাম। মহিলাটি বলিলেন, "এ গন্ধটা আমি খুব ভালবাসি।" কালিদাসের সরল-বৃক্ষ-পরিস্রুত ক্ষীর সৌরভে সুরভিত বায়ুর বর্ণনা মনে পড়িল।

পীতাম্বর পন্থকে খবর দিয়া ওখানে ডাকিয়া আনা হইল।

তাঁহাকে বৈকালে আমার হোটেলে আসিতে বলিয়া একটি ট্যাক্সি লইয়া দ্রুত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমিতির বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তখন স্বামীজীর বক্তৃতা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। বাড়ীটির নীচের তলায় বড় হলঘরের প্রান্তে দাঁড়াইয়া স্বামীজী বক্তৃতা করিতেছেন। পরিধানে গেরুয়া বস্ত্র। মাথায় গেরুয়া পাগ্‌ড়ী। প্রায় দুই শত মার্কিন নরনারী একাগ্রচিত্তে বক্তৃতা শুনিতেছে। বক্তৃতার বিষয়—প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ। বক্তৃতান্তে শ্রোতাগণ কিছুকিছু দান করিয়া উঠিয়া গেলেন।

আশ্রমে একটি বাঙালী যুবক ও একটি মার্কিন যুবক বাস করে। উভয়েই ছাত্র। মার্কিন যুবকটি সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক ভারতবর্ষেই জীবন কাটাইবে সঙ্কল্প করিয়াছে। স্বামীজী বলিয়াছেন যে, যদি ভারতবর্ষেই থাকিবে তবে যাতে সে দেশবাসীর কাজে লাগিতে পার এরূপ কিছু শিখিয়া যাও। তিনি যুবকটিকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়াছেন।

যুবকটি ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ মিশনের ডাক্তারী বিভাগের ভার লইতে পারিবে। সে বিনয়ী, অল্পভাষী ও কর্তব্যপরায়ণ। বাঙালী যুবকটিও অনুরূপ গুণসম্পন্ন। একটি বৃদ্ধা মার্কিন প্রতিবেশিনী আশ্রমের খুব ভক্ত। আশ্রমের অনেক কাজকর্ম করেন। আমাকে বলিলেন, "আমার একবার ভারতবর্ষে যাইবার ইচ্ছা আছে। তোমরা আমাকে গ্রহণ করিবে ত?"

আমি—"ভারতবর্ষ সকলকেই গ্রহণ করিয়াছে। কাহাকেও সে প্রত্যাখ্যান করে না।"

মহিলাটি (লজ্জিতভাবে)—"হাঁ, এ বিষয়ে তোমাদের উদারতা সুবিদিত। হয়তো এ উদারতা আর একটু কম হইলেই তোমাদের সুবিধা হইত।" একটি নবাগত গুজরাটি যুবকের সহিত এখানে আলাপ হইল। তিনি টাটা কোম্পানীর অভিজ্ঞ কর্মচারী। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমেরিকা দর্শনে আসিয়াছেন। বলিলেন, "সঙ্গে আমার স্ত্রী আসিয়াছেন; কিন্তু আবাসস্থলের অভাবে বড়ই বিপন্ন বোধ করিতেছি।"

স্বামীজী বলিলেন—"বাসস্থান এখানে খুবই দুর্লভ। তারপর এখানে আদিম অধিবাসীদিগকে অনেকে বাসা দিতে চায় না। আপনাকে যদি আদিম অধিবাসী বলিয়া ধরিয়া লয় তবে আরও মুশকিল। আপনার স্ত্রী যখন সঙ্গে আছেন তখন এ অসুবিধা নাও হইতে পারে। কারণ শাড়ীপরিহিতা স্ত্রীলোক দেখিলে বিদেশী বলিয়া বুঝিতে পারিবে এবং বিদেশীর সঙ্গে এরা ভাল ব্যবহারই করে।"

বিভা মুখোপাধ্যায় নামে একটি মেয়ে এদেশে এম্‌স্‌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নিউট্রিশন পড়িতেছে। দুই দিনের ছুটিতে আশ্রমে বেড়াইতে আসিয়াছে। আশ্রমে মেয়েদের থাকিবার বিধি বা বন্দোবস্ত নাই। কাজেই মেয়েটি বৃদ্ধা মার্কিন প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে আছে। মেয়েটি দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসিনী। আমাকে চিনিতে পারিল। সেদিন সে-ই ডাল ভাত, কপির

ডালনা রান্না করিল। বহুদিন পর আশ্রমেব প্রসাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

ঐ দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনে স্বামীজী, আশ্রমবাসী বাঙালী ও মার্কিন যুবকদ্বয়, বৃদ্ধা মার্কিন প্রতিবেশিনী, বিভা মুখুয্যে ও আমি ভিন্ন আরও দুই জন আগন্তুক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এক জন মাদ্রাজী ও অন্য জন হিন্দুস্থানী। মাদ্রাজী ভদ্রলোক হায়দরাবাদ রাজ্যের ব্রডকাষ্টিং ডিপার্টমেণ্টের অধ্যক্ষ। হিন্দুস্থানী যুবকটি ছাত্র। ভোজনান্তে নানা বিষয়ে আলাপ চলিল। প্রসঙ্গত স্বামীজী বলিলেন, "আমি অনেক সময় বলিয়া থাকি যে আমাদেব বিবেকানন্দ আমেবিকাবই দান। ভারতবর্ষে ত কেহ তাঁহাকে চেনে নাই। যখন আমেরিকা তাঁহাকে চিনিল তখনই ত ভাবতবর্ষ তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া বরণ কবিয়া লইল।" সকলের সঙ্গে সদালাপে পরিতৃপ্ত হইয়া, স্বামীজীব আন্তবিকতায় মুগ্ধ হইয়া হোটেলে ফিবিলাম।

বৈকালে পন্থ আমার হোটেলে উপস্থিত হইলেন। পন্থ উচ্চ আদর্শবাদী যুবক। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালযেব কৃতী ছাত্র ও পরে অধ্যাপকরূপে সুনাম অর্জন কবিয়াছেন। ১৯৪২ সনের আগষ্ট-আন্দোলনে জেলও খাটিয়াছেন।

কংগ্রেসের বিগত সাধারণ নিবাচনের সময জবাহরলাল নেহরুব সেক্রেটারী রূপে বহু ঘুবিয়াছেন, পরে কলিকাতায় ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে গবেষণা করিবার জন্য যোগদান

করেন। সম্প্রতি অধ্যাপক মহলানবিশের সঙ্গে এদেশে আসিয়াছেন। অধ্যাপক দেশে গিয়াছেন; অল্পদিন পরেই ফিরিবেন। তাঁহার কাজের ভার ইহার উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। পন্থ একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "এখানে যে ধরণের হোটেলে আছি তাহাতে খরচ বড় বেশী। ইহার অনেক কম খরচেও এদেশে থাকা চলে এবং সে টাকাটা আমি বোধ হয় চেষ্টা করিলে রোজগার করিয়া লইতে পারি। সরকারের উপর নির্ভরশীলতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে এখানে থাকিতে পারি কিনা তাহাই চিন্তা করিতেছি।"

পন্থের সঙ্গে মধ্য-মান্হ্যাটনে অনেক ঘুরিলাম। সন্ধ্যার পর টাইম্ স্কোয়ারের দৃশ্য সত্যই অপরূপ। ব্রড্ওয়ের উভয় পার্শ্বে ৪২তম ষ্ট্রীট হইতে ৫২তম ষ্ট্রীট পর্যন্ত টাইম স্কোয়ার বিস্তৃত। অঞ্চলটি থিয়েটার, সিনেমা, নাচঘর, হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট প্রভৃতিতে পূর্ণ। আলোক সজ্জা পরমাশ্চর্য, উজ্জ্বলতায় দিবালোককেও হার মানাইয়াছে। রঙের খেলায় মনে হয় যেন সহস্র রামধনুর উদয় হইয়াছে। আলোকমালার নানা ভঙ্গীর গতিশীলতা এবং পালা করিয়া জ্বলা-নেবার খেলায় এক অপূর্ব মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। মনে হয়, ইহার তুলনা নাই।

একটি সিংহল-ভারতীয় রেষ্টুরেণ্টে ভারতীয় খাদ্যে নৈশ-ভোজন সমাপন করিয়া ম্যাডিসন্ স্কোয়ার গার্ডেনের দিকে চলিলাম।

প্রকাণ্ড উঁচু বাড়ী। ভিতরে হকি প্রভৃতি সর্বপ্রকার খেলা হয়। ১৯০০০ দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা আছে। গৃহাভ্যন্তরে এত বড় ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। শুনিলাম ভিতরে হকি খেলা চলিতেছে। লাইনে দাঁড়াইয়া টিকিট কিনিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। দোতলার ছাতে খেলার মাঠ। উপরে চারিদিকে ঘুরানো গ্যালারী। লোকে পরিপূর্ণ। ফিরিওয়ালা আইস্‌ক্রীম, বাদাম প্রভৃতি হাঁকিয়া বেড়াইতেছে। উজ্জ্বল আলোক দ্বারা ঘরটিকে দিবালোকের মতই আলোকিত করা হইয়াছে। খেলার মাঠটি বরফে প্রস্তুত স্কেটিঙের মাঠের মত। খেলোয়াড়গণ স্কেট পায়ে বাঁধিয়া বরফের উপর খেলিতেছে। স্কেট পায়ে হকি-ষ্টিক হাতে বল লইয়া ছুটাছুটি করার দৃশ্য আমার নিকট শুধু অপূর্ব নয়, অদ্ভুত লাগিতেছে। এ খেলায় পরিশ্রম অত্যধিক। সর্বদা স্কেটের উপর দেহের ভার-সাম্য রক্ষা করিয়া স্কেট ঠেলিয়া বলের পিছনে ছুটায় অত্যধিক পরিশ্রম হয়। রেঞ্জার্স দল ও শিকাগো দলে খেলা হইতেছে। ৬ জনে এক এক পক্ষ। রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিট হইতে সাড়ে দশটা পর্যন্ত খেলা চলিল। ২০ মিনিটের পর ৫ মিনিট বিশ্রাম। এইরূপ তিন বারে মোট ১ ঘণ্টা খেলা হইল। প্রত্যেক দলের রিজার্ভ খেলোয়াড়গণ পাশেই লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া। যে কোন খেলোয়াড় ক্লান্তি বোধ করিলে সেইখানে আসিয়া দাঁড়ায় এবং অপর এক জন তাহার জায়গায় নামিয়া পড়ে। এইরূপে যতবার ইচ্ছা বদ্‌লী দিয়া বিশ্রাম

লওয়া যায়। এই খেলায় রেঞ্জার্স দল ৯-০ গোলে জিতিল। প্রত্যেক বিশ্রামের সময় মাঠের আল্‌গা বরফ চাঁছিয়া ফেলিয়া জল ছিটাইয়া ঐ জলকে জমাইয়া দিয়া পুনরায় শক্ত ও মসৃণ করিয়া দেওয়া হয়। এই মাঠেই বক্সিং, বাস্কেটবল প্রভৃতি খেলাও হয়। যন্ত্র-সাহায্যে মাঠটিকে ইচ্ছামত ছোট বড় করা চলে এবং গ্যালারীগুলিকেও আগাইয়া বা পিছাইয়া লওয়া যায়। প্রয়োজনমত বরফ দিয়া মাঠ ঢাকিয়া দেওয়া হয় বা বরফ গলাইয়া ফেলা হয়।

নিউ ইয়র্কের সুড়ঙ্গ-রেলপথ লণ্ডনের সুড়ঙ্গ-রেলপথেব মত সুদৃশ্য নয়। লণ্ডনে লাইনের হদিস ও মানচিত্রগুলি বিদেশীব পরম সহায়ক বলিয়া মনে হয়। এখানে সেরূপ হদিস ও ম্যাপ নাই বলিলেই হয়। তবে লণ্ডন অপেক্ষা শ্রমসংক্ষেপমূলক যান্ত্রিক ব্যবস্থা নিউ ইয়র্কে অনেক বেশী। এখানে ভাড়ার কোন তারতম্য নাই। একবার উঠিলে পাঁচ সেণ্ট ভাড়া—তা তুমি যত দূরই যাও না কেন। টিকিট কেনা-বেচার রীতি নাই। ষ্টেশনে কোম্পানীর কোন টিকিট-ঘর, টিকিট বিক্রেতা বা টিকিট সংগ্রাহক নাই। একটি বাক্সের মধ্যে একটি মাত্র লোক কতকগুলি পাঁচ সেণ্ট মুদ্রা লইয়া বসিয়া থাকে। যাত্রী-গণ ইহার নিকট অন্য মুদ্রার পরিবর্তে পাঁচ সেণ্ট মুদ্রা পাইতে পারে। ষ্টেশনের প্রবেশপথ যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একটি পাঁচ সেণ্ট মুদ্রা নির্দিষ্ট ছিদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিলে প্রবেশ-পথটি খুলিয়া যায় এবং একজন মাত্র লোক প্রবেশ করিলে

তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। ষ্টেশন হইতে বাহিরে যাইবার পথ আলাদা। সেখানে পয়সা লাগে না। এইরূপে অনেক কম কর্মচারীর দ্বারা, বিনা টিকিটে রেলপথটিতে লোকজন ও যানবাহন চলাচল করিতেছে। রেলের কোন কর্মচারীর সঙ্গে যাত্রীদের দেখাই হয় না। ভাড়াও খুব সস্তা, মাত্র পাঁচ সেণ্ট বা দশ পয়সায় বহু দূর যাওয়া যায়।

নানা স্থানে ঘুরিয়া খেলা দেখিয়া সুড়ঙ্গ-পথে পন্থ ও আমি স্ব-স্ব আবাসে ফিরিলাম।

৬ই জানুয়ারী সোমবার। সকালে ট্যাক্সিযোগে সিটি আপিসের দিকে চলিলাম। এ ট্যাক্সিওয়ালাও আলাপ সুরু করিল। সে যাহা বলিল তাহার মর্ম এইরূপঃ "তোমাদের দেশ ঐশ্বর্যের দেশ। পৃথিবীর যত সোনা, রূপা, মণি, মুক্তা তোমাদের দেশ হইতে আসে। অথচ তোমরা নিজেরা এত মারামারি কর কেন? ইংরেজ তোমাদের শাসক। তাহারা কি করে? আমরা দেখ ট্রুম্যানকে প্রেসিডেণ্ট করিয়াছি। তাঁহাকে সেলাম করিতেছি। কিন্তু যদি তিনি তাঁহার কর্তব্য পালন না করেন তবে তাঁহাকে গদি হইতে টানিয়া নামাইব। তোমরা সেরূপ কর না কেন? আচ্ছা, তোমরা আমাদেব গবর্ণমেণ্টের নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত কর না কেন? ইংরেজ আমাদের কাছে অনেক টাকা ধারে। আমাদের গবর্ণমেণ্টের কথা না শুনিয়া পারিবে না।"

ঐ দিন নগরীর প্রথম ডেপুটি কণ্ট্রোলার সিড্নি সুগার-

ম্যানের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি ট্যাক্স কৌঁসুলি মিল্‌টন স্যাণ্ডবার্গের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়া বলিলেন, "ইনি জাপানে য়িমাশিটা বিচারে আসামী পক্ষের কৌঁসুলি ছিলেন।" ইহার সঙ্গে নিউ ইয়র্কের বিক্রয়-কর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইল। নদীর ওপারে নিউ জার্সি শহরে বিক্রয়-কর নাই। কাজেই নিউ ইয়র্কের বিক্রয়-করের হার যতক্ষণ খুব বেশী না হয় ততক্ষণ কেহ সামান্য জিনিস কিনিবার জন্য কষ্ট করিয়া নদী পার হইয়া ওপারে যায় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপের পর য়িমাশিটার বিচারের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। স্যাণ্ডবার্গ বলিলেন, "য়িমাশিটা বিচারে নুরেম্‌বার্গ বিচারগুলির ন্যায় আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন উঠে নাই। সাধারণ অপরাধ-ঘটিত আইনের উপরই ইহা চলিয়াছিল। য়িমাশিটার সৈন্যগণ লোকের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে, রমণীর উপর অত্যাচার করিয়াছে—এই সমস্ত বিষয়েই সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা হইয়া-ছিল। এই সমস্ত কাজ যে য়িমাশিটার আজ্ঞায় হইয়াছিল তাহারও কোন প্রমাণ ছিল না। আমি এইরূপ তর্ক করিয়া-ছিলাম যে এই সমস্ত সাক্ষ্য হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই সমীচীন যে য়িমাশিটা তাহার সৈন্য-বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় য়িমাশিটার সৈন্যবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব সৃষ্টি করিবার জন্য মার্কিন সরকার তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যখন তাহাদের এই প্রচেষ্টা সফল হইল

এবং তাহাদের ঈপ্সিত বিশৃঙ্খলা ও আইন না মানার প্রবণতা দেখা দিল তখন সেই বিশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাবকে য়িমাশিটার অপরাধ বলিয়া বর্ণনা করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। আমার এই তর্কে বিচারকগণের মধ্যে অন্ততঃ একজন সমর্থন করিয়াছিলেন।”

৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার এখানকার বয়স্কাউটের সদর আপিসে যাই। আমার পরম সুহৃদ্, উৎসাহের প্রতিমূর্তি শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ বঙ্গীয় বয় স্কাউট সঙ্ঘের প্রাদেশিক কমিশনার। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বয় স্কাউট সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষের সহিত বঙ্গীয় সঙ্ঘের সংযোগ স্থাপন মানসে বঙ্গীয় সঙ্ঘের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি লণ্ডনে আন্তর্জাতিক স্কাউট সঙ্ঘের সভাপতি কর্ণেল উইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি কলিকাতার স্কাউট-সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ঘোষ মহাশয়ের গুরু। আমার নিকট কলিকাতার এবং বিশেষতঃ ঘোষ মহাশয়ের কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। আগামী জাম্বুরীতে ঘোষ মহাশয়ের যোগ দিবার সম্ভাবনা আছে শুনিয়া তিনি খুবই উৎফুল্ল হইলেন। মার্কিন স্কাউটের ডাক্তার রে ও ওয়াইল্যাণ্ডের নিকট তিনি আমাকে একটি পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। সেইটি লইয়াই এখানে আসিয়াছিলাম। সেদিন ওয়াইল্যাণ্ড মহাশয় অনুপস্থিত ছিলেন।

তাঁহার সহকারী টম্‌চীন্‌ পরম যত্নে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। দেখিলাম কর্ণেল উইলসনের উপর ইঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা। চীন্‌ মহাশয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হইল। ইনি বলিলেন, "আমেরিকার হাতে আজ বিশ্বনেতৃত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত শিক্ষা তাহার নাই। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের বহু দিনের শিক্ষা। কিন্তু তাহার হাত থেকে আজ বিশ্বনেতৃত্ব চলিয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে আমেরিকার শিক্ষা লইতেই হইবে।" আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্বন্ধে বলিলেন, "ট্যাফ্‌ট যদি দাঁড়ান এবং নির্বাচিত হন তবে সব চেয়ে ভাল হয়। ইঁহার পিতা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ইনি নানা সদ্‌গুণে ভূষিত। বর্তমান বিশ্বে আমেরিকার নেতৃত্ব করিবার পক্ষে ইনি যোগ্যতম ব্যক্তি।" দেখিলাম দেশের বালকদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী হিসাবে স্কাউটিঙের উপর ইহাদের অগাধ বিশ্বাস।

চীন্‌ মহাশয় আমাকে হাউয়ার্ড আর. প্যাটনের নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। ইঁনি বিশ্ব-বন্ধুত্ব তহবিলের ডিরেক্টর। তাঁহার সহৃদয় ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইলাম। এক এক করিয়া সমস্ত পদস্থ কর্মচারীর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিলেন। ইঁহাদের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আমাকে বলিলেন। আপিসের যাবতীয় বিভাগ আমাকে দেখাইলেন। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠানটি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। লণ্ডনে কর্ণেল উইলসনের আপিসে দেখিয়াছি তিনি নিজে একটি সেক্রেটারী লইয়া কাজ করেন।

এ আপিসে দেখিতেছি ৬০০ কর্মচারী। যন্ত্রের ব্যবহারও যথেষ্ট। সমগ্র আমেরিকার স্কাউট-সঙ্ঘগুলি বৎসরে ৮০ লক্ষ ডলার ব্যয় করে। তন্মধ্যে এই আপিসের মারফত খরচ হয় ১৫ লক্ষ ডলার। এ দেশে ২০ লক্ষ স্কাউট আছে। এ দেশে যত লোক যুদ্ধে গিয়াছিল তাহার শতকরা ২৫ জন স্কাউট। এই শতকরা ২৫ জন পুরস্কার ও সম্মানাদির শতকরা ৪০ ভাগ লাভ করিয়াছিল। স্কাউট-সঙ্ঘ তাহাদের এই বিশিষ্টতায় বিশেষ গৌরব বোধ করে।

প্যাটন মহাশয় তাঁহাদের প্রচারিত পুস্তকাবলী কলিকাতার স্কাউট-সঙ্ঘের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে শুনিয়াছিলাম যে তাঁহারা এত পুস্তক পাঠাইয়াছেন ও পাঠাইতেছেন যে কলিকাতার স্কাউট আপিসের কর্ণধারগণের পক্ষে তা ছিল সম্পূর্ণ অভাবনীয়।

প্যাটন মহাশয় বলিলেন, "সকল জাতির প্রতিনিধির সহিতই আমার সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু যে কয়েকটি জাতির বুদ্ধিমত্তা আমাকে চমৎকৃত করিয়াছে ভারতবর্ষ তাহাদের অন্যতম। গ্রীস, চীন এবং কোরিয়ার লোকেরাও অনুরূপ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন।

প্যাটন মহাশয় আমাকে পরদিন একটি প্রাতরাশের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করিলেন। বলিলেন, "বহু জাতির প্রতিনিধি এই প্রাতরাশে উপস্থিত থাকিবেন। ভারতবর্ষের কেহই নাই। আপনি আসিয়া পড়িয়াছেন ভালই হইয়াছে। আপনি ভারত-

বর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।" পরদিন প্রাতরাশের পূর্বেই আমাকে অটোয়া রওনা হইতে হইবে। কাজেই দুঃখের সহিত নিমন্ত্রণটি প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলাম।

স্বদেশী যুগের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী তারকনাথ দাস মহাশয়ের দর্শনলাভেচ্ছায় তাঁহার নিকট টেলিফোনে একটু সময় চাহিয়া লইয়াছিলাম। তদনুসারে নৈশ ভোজনান্তে রাত্রি আটটায় তাঁহার হোটেলে উপস্থিত হইলাম। ব্রড্‌ওয়ে এবং ৭৩তম ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে 'হোটেল এনসোনিয়ার' ১৫৯২ নম্বর ঘরে অর্থাৎ ১৬ তলার ৯২ নং ঘরে তিনি সস্ত্রীক বাস করিতেছেন। শুভ্রকেশ উজ্জ্বল-চক্ষু বৃদ্ধ আমাকে দেখিয়াই 'বন্দে মাতরম্' শব্দে অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। তদীয় গৃহিণীকে আরও বেশী বৃদ্ধা দেখাইতেছিল। ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী লইয়া আলাপ হইল। দেখিলাম দাস মহাশয় বহু বিষয়ে অধুনাতম সংবাদসমূহ রীতিমত সংগ্রহ করেন। যাদবপুর কলেজ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের একটি চিঠিতে কলেজের অনেকগুলি সমস্যার কথা উত্থাপন করা হইয়াছে। সেগুলি উল্লেখ করিলেন। আমাদের দেশে সরকারী সাহায্য সরকারী হস্তক্ষেপের অজুহাত হইয়া দাঁড়ায়। সে হস্তক্ষেপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নতির জন্য না করিয়া বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য করা হয়। এরূপ কেন হয়? তিনি অভিযোগ করিলেন, "আমাদের দেশের ধনী ব্যক্তিগণ শিক্ষার জন্য দান করেন না কেন? সাধারণ উপার্জনক্ষম

ব্যক্তিরাই বা তাহাদের আয়ের কিয়দংশ, অন্ততঃ একটি বা দুইটি ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য দান করেন না কেন?"

আমি—আমাদের দেশে শিক্ষার জন্য দানের অভাব আছে কি? শিক্ষার উন্নতিকল্পে রাসবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিতের বদান্যতার কথা তো সুবিদিত। পি. সি. রায় কি করিয়া গিয়াছেন? তাঁহার সমস্ত বেতন তো তিনি এই জন্যই দিয়া গিয়াছেন? শিক্ষার্থীকে স্থান, আহার প্রভৃতি দানে সাহায্য করায় কোন দিনই কি আমাদের দেশের লোক পরাঙ্মুখ ছিল?

দাস মহাশয়—কিন্তু এখন তো সেরূপ দেখি না। এ-দেশের উচ্চশিক্ষা বেশীর ভাগই ব্যক্তিগত দানে। এই সেদিন জেনারেল মোটরের ম্যানেজার খুব বড় রকমের একটি দান করিলেন। তিনি বাল্যে সামান্য কারিগর রূপে ঐ কারখানায় কাজ সুরু করেন। আজ তিনি জেনারেল ম্যানেজার। তিনি বলেন, স্বাধীন ব্যক্তিগত উদ্যোগের দ্বারা ব্যষ্টির প্রতিভা-স্ফুরণের সম্পূর্ণ অবকাশ এদেশে আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। উদ্যোগী পুরুষ-সিংহগণই দেশে দেশে লক্ষ্মী আনিয়াছেন। তাই আজ পৃথিবীর এত উন্নতি। আটলান্টিকের ওপারে সংবাদ-প্রেরণ পূর্বে অসাধ্য ছিল। আজ তাহা সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ত। কয়েকটি ডলার ব্যয়ে যে-কোন লোক ইহা পাঠাইতে পারেন। আজ আমেরিকার দীনতম লোক যে সুযোগ ও সুখ-সুবিধার অধিকারী, পূর্বে তাহা রাজারাজড়ারও

অপ্রাপ্য ছিল। ইহা সমস্তই স্বাধীন ব্যক্তিগত উদ্যমের ফল। কাজেই তিনি ব্যক্তিগত উদ্যমের ইকনমিক্স্ পড়াইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদ প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু টাকা দান করিতে যাইতেছেন।

আমি—ইহা প্রশংসাব বিষয সন্দেহ নাই। কিন্তু ধনী আমেরিকার সঙ্গে দরিদ্র ভারতেব তুলনা সাবধানে করা উচিত। ইহাও অবশ্য সত্য যে বর্তমানে ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে দানের উৎস যেন শুকাইয়া যাইতেছে। কেন এমন হইতেছে? শুধু দারিদ্র্যই ইহার কারণ নাও হইতে পাবে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাও হয়তো ইহাব জন্য অনেকাংশে দায়ী। যে জন্য দান করিলাম সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কিনা সে সন্দেহও হয়তো লোকের মনে আজ উঠিতেছে। সাম্প্রদায়িক বিষে আজ দেশ জর্জরিত।

ভারতীয় সংবাদপত্রের কথা উঠিল। 'আনন্দবাজাব' প্রভৃতি বাংলা সংবাদপত্রের সৌষ্ঠব ও প্রচারের কথা শুনিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, "এরা তো দেশের অনেক কাজ করিতে পারে। এখানকার 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্' তো একটি সাম্রাজ্যবিশেষ। বাংলাদেশের এক একটি বড পত্রিকা দরিদ্র ছাত্রদের জন্য প্রতি জেলায় একটি করিয়া বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিতে পারে। ইহাতে শিক্ষার উন্নতি হয়, খরচও বেশী নয়, পত্রিকারও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়"।

ভারত বিভাগের কথা উঠিতে বৃদ্ধ গর্জন করিয়া উঠিলেন।

তাঁহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সংক্ষেপে এবং দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "যাহারা ধ্যানে বা জ্ঞানে, জাগ্রতে বা স্বপ্নে ভারত-মাতার স্বাধীন মূর্তি একবারও দর্শন করিয়াছে তাহারা কিছুতেই ভারত বিভাগের কথা চিন্তা করিতে পারিবে না।"

বৃদ্ধ আমার সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত আসিয়া 'বন্দে মারতম্' শব্দে বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া ঘরে ফিরিলেন। ভাবিলাম, বৃদ্ধের বিশ্বাস কি সরল ও দৃঢ়! ভারতমাতার যে হাস্যমণ্ডিত অখণ্ড রূপ ইনি এখানে বসিয়া ধ্যান করেন তাহা যে আজ কত পরিবর্তিত, দূরে বসিয়া তাহা হয়তো ইহার অজ্ঞাত। আজ দেশে ফিরিলে অনশন-ক্লিষ্ট সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত ভাবতমাতাকে ইনি চিনিতে পারিবেন কি?

অষ্টম অধ্যায়

সমৃদ্ধ মার্কিন

সমৃদ্ধিতে আমেরিকা আজ শুধু অদ্বিতীয় নয়, অন্য যে-কোন দেশকে সে বহু পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে মাত্র ১৩টি রাষ্ট্র স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া একটি কনফেডারেশন গঠন করিয়াছিল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই নেতৃত্বে এই কনফেডারেশন

ফেডারেশনে পরিণত হয। তখন 'নূতন পৃথিবীতে' অল্পসংখ্যক শ্বেতকায মানুষ পুবাতন লোকালযের বহুদূরে নিজেদেব আবাস গড়িতে মনোযোগ দেন। দক্ষিণেব বাষ্ট্রগুলি ছিল কৃষিপ্রধান, আব আটলাণ্টিক বাষ্ট্রগুলি ছিল বাণিজ্যপ্রধান; কৃষি ছিল দাসপ্রথার উপর নির্ভরশীল।

স্থানীয় আদিম অধিবাসিগণ দাসরূপে আগন্তুক শ্বেতকায-গণের কৃষিকর্মে সহায়তা কবিত। কৃষিস্বার্থ ও বাণিজ্যস্বার্থে শীঘ্রই সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ দেশ-বিভাগেব দাবিরূপে আত্মপ্রকাশ কবিল। এব্রাহাম লিঙ্কন তখন যুক্তবাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট। তিনি দেশকে দ্বিখণ্ডিত কবিবার দাবি প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফলে গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হইল। লিঙ্কন জযী হইলেন। লিঙ্কনের নেতৃত্বে আমেবিকা সঙ্কটে উত্তীর্ণ হইযা জাতীয ঐক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। যুক্তবাষ্ট্র তখন স্ব-শক্তিতে দৃঢ বিশ্বাসী এবং বাজ্যবিস্তাবে মনোযোগী। ক্রয় চুক্তি প্রভৃতি দ্বারা বহুদেশ এক এক করিযা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইযা গেল। এইরূপে আজ ৪৮টি বাষ্ট্র লইযা যুক্তবাষ্ট্র গঠিত। ইহা ছাড়া আলাস্কা, হাওযাই প্রভৃতি কযেকটি অঞ্চলও তাহাব শাসনাধীন। যদি রুশ-মার্কিনে কখনও যুদ্ধ হয় তবে সে যুদ্ধে আলাস্কা হইবে আমেরিকাব এক মূল্যবান ঘাঁটি। আলাস্কা আযতনে ৫ লক্ষ ৮৬ হাজাব ৪ শত বর্গ মাইল। ১৯৪০ সালের আদমসুমারী অনুসাবে এখানে ৭২,৫০০ লোকেব বাস। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২০

লক্ষ টাকা মূল্যে আমেরিকা রুশিয়ার নিকট হইতে এই দেশটি ক্রয় করিয়াছিল।

বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ৩০ লক্ষ ২২ হাজার ৩ শত ৮৭ বর্গ মাইল, আলাস্কা, হাওয়াই প্রভৃতি অঞ্চল ধরিলে ৩৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬ শত ৬০ বর্গ মাইল। ইহার লোক-সংখ্যা ১৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ২ শত ৭৫ ; উপরোক্ত অঞ্চলসমূহের লোকসংখ্যা ধরিলে ১৫ কোটি ৬ লক্ষ ২১ হাজার ২ শত ৩১। ঐ অঞ্চলগুলির মধ্যে পুয়োর্টো রিকোর জন-সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৬৯ হাজার আর হাওয়াইয়ের জনসংখ্যা ৪ লক্ষ ২৩ হাজার।

রাষ্ট্রগুলির আয়তনের তারতম্য অনেক। ক্ষুদ্রতম নেভাডা রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ১ লক্ষ ১০ হাজার। বৃহত্তম নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার। জনবসতির গড়পড়তা হার প্রতিবর্গ মাইলে নেভাডায় ১, নিউ ইয়র্কে ২৮১·১, রোড দ্বীপে ৬৭৪·২, এবং সমগ্র দেশে ৪৪·২।

জনসংখ্যার শতকরা ৫৬·৫ শহরে এবং ৪৩·৬ গ্রামে বাস করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই অনুপাতের প্রভূত তারতম্য আছে। শহরবাসীর সংখ্যা রোড দ্বীপে শতকরা ৯১·৬, ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ রাষ্ট্রে ৮৯·৪, নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রে ৮২·৮ এবং মি সি সি পি রাষ্ট্রে মাত্র ১৯·৮।

সমগ্র দেশে ৩৪৬৪টি শহর। লক্ষাধিক লোকপূর্ণ শহরের সংখ্যা ১৯৯। ১০ লক্ষাধিক লোকপূর্ণ শহরের সংখ্যা ৫।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র দেশে শ্বেতকায় জনসংখ্যার অনুপাত ছিল শতকরা ৮৬·৫ ; ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ৮৯·৫-এ উঠিয়াছে।

পর্বতসঙ্কুল ওয়াইয়োমিং রাষ্ট্রের চেই-এন্ শহরের উচ্চতা ৬১৪৪ ফুট। সমুদ্রতীরবর্তী মায়ামী শহর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে মাত্র ২৫ ফুট উচ্চ।

নিউ ইয়র্কের তাপ জানুয়ারীতে ২৪° ডিগ্রী, জুলাইয়ে ৮২° ডিগ্রী। শীতে মায়ামীর দিনগুলি পরিষ্কার, তুষারপাতশূন্য। মায়ামীর শীত কলিকাতার শীতের মতই উপভোগ্য। মণ্টানা, মিন্নেসোটা প্রভৃতি অঞ্চলে শীতকালে তাপ শূন্যের ৪৯° ডিগ্রী নীচে পর্যন্ত নামিয়াছে, এবং ৫৫″ ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাত হইয়াছে। গ্রীষ্মে তাপ আলাবামায় ১১৮° ডিগ্রী পর্যন্ত এবং মিনিয়াপলিসে ১০৮° ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়াছে।

দেশের শিল্প ও বাণিজ্য পূর্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল কৃষিপ্রধান। কৃষিপ্রধান পশ্চিমে মজুরীর হার শিল্পপ্রধান পূর্বাঞ্চলকেও হার মানাইয়াছে। দক্ষিণাঞ্চলের টেনেসী প্রভৃতি স্থানের কৃষি নিম্নস্তরের।

এই বিশাল ও বিচিত্র দেশের কৃষি, শিল্প এবং খনিজ সম্পদ অতুলনীয়। এই দেশবাসীদের সংগঠনশক্তি অসাধারণ। ফলে এখানকার কলকারখানা সর্বোৎকৃষ্ট এবং বিরাট্ কোম্পানী-গুলি শিল্প ও বাণিজ্যে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

জর্জ ওয়াশিংটনের বাড়ীতে বা লিঙ্কনের গ্রামে যে সব যন্ত্রপাতি দেখা যায় তাহা খুব উন্নত যন্ত্রশক্তির ব্যবহারের

পরিচয় দেয় না। তার পর ধীরে ধীরে আমেরিকা উন্নতির পথে চলিয়াছে। মন্‌রো নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সে পুরাতন পৃথিবীর আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে নিজেকে লিপ্ত করে নাই। ফলে তাহার উন্নতি অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর দুইটি বিশ্বযুদ্ধের সংঘাতে তাহার উন্নতির গতি বিস্ময়কর রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। যে দুইটি যুদ্ধ ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক প্রথা ভাঙিয়া দিয়া তাহার অর্থনৈতিক কাঠামোকে চূর্ণপ্রায় করিয়া দিয়াছে সেই উভয় যুদ্ধই আমেরিকার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে বিপুল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতে অদ্বিতীয় করিয়া তুলিয়াছে। আমেরিকার উন্নতি কোনরূপ ঔপনিবেশিক প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইহার প্রতিষ্ঠা তাহার নিজস্ব কৃষি-শিল্প ও খনিজ সম্পদে। তাহার লোকবল ছিল কম। এখনও ভারতবর্ষের দ্বিগুণায়তন দেশে ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ লোক বাস করে। অতএব স্বতঃই সে যন্ত্রশক্তির সমধিক ব্যবহারে বাধ্য হইয়াছিল। আজ যন্ত্রশক্তিতে তাহার জুড়ি নাই। নব নব যন্ত্রের দ্রুত আবিষ্কারে তাহার সমকক্ষ নাই। যুদ্ধ দুইটিতে জড়িত হইয়া পড়ায় দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। সেই ধাক্কায় তাহার উৎপাদনশক্তি এত বাড়িয়া গেল যে যুদ্ধের মধ্যেই যুদ্ধের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়াও সে জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিয়া তুলিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের যে স্থায়ী উন্নতি হইয়াছিল,

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্যচক্রের মহাবেগে নিম্ন আবর্তনে তাহা কথঞ্চিৎ ব্যাহত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তখন ডিমোক্রেটিক দলের নেতা রুজভেল্ট তাঁহার 'নিউ ডিল' অবলম্বনে বাণিজ্যচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এবারও নানা পথে বিপদ আসিতে পারে। যুদ্ধকালে জনসাধারণের হাতে যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা এখন দ্রুত বাজারে আসিয়া মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিয়া বিপদ আনিতে পারে। যুদ্ধকালে যে মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নামিয়া আসিবার সময় বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। উৎপাদন-বৃদ্ধিতে বাধা হইলে বিপত্তির সৃষ্টি হইবে। জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান, উৎপাদনের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে না পারিলেও বিপদ অবশ্যম্ভাবী। পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে এবারে হয়তো সমস্ত সঙ্কট এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে, অনেকেই এরূপ আশা পোষণ করেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের "গ্রোস্ ন্যাশন্যাল প্রোডাক্ট" বা "সমগ্র জাতীয় উৎপাদনে"র মূল্য ছিল ৮৮·৬ বিলিয়ন ডলার; ১৯৪৫ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭·৩ বিলিয়ন ডলারে উঠিয়াছিল।(১) এত অল্প সময়ে এত বেশী বৃদ্ধি পূর্বে লোকের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আমেরিকার বহির্বাণিজ্য তাহার স্বকীয় উৎপাদনের তুলনায় নগণ্য। কয়েক বৎসরের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(১) টেবল নং ৩০২, ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাবস্ট্রাকট অব দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্, ১৯৪৬।

(সংখ্যাগুলি সহস্র ডলারের)

	রপ্তানী	আমদানী	বিয়োগ ফল
১৯৩৯	৩,১৭৭,১৭৬	২,৩১৮,০৮১	+ ৮৫৯,০৯৫
১৯৪০	৪,০২১,১৪৬	২,৬২৫,৩৭৯	+ ১,৩৯৫,৭৬৭
১৯৪১	৫,১৪৭,১৫৪	৩,৩৪৫,০০৫	+ ১,৮০২,১৪৯
১৯৪২	৮,০৭৯,৫১৭	২,৭৪৪,৮৬২	+ ৫,৩৩৪,৬৫৫
১৯৪৩	১২,৯৬৪,৯০৬	৩,৩৮১,৩৪৯	+ ৯,৫৮৩,৫৫৭
১৯৪৪	১৪,২৫৮,৭০২	৩,৯১৯,২৭০	+১০,৩৩৯,৪৩২
১৯৪৫	৯,৮০৫,৮৭৫	৪,১৩৫,৯৪০	+ ৫,৬৬৯,৯৩৫

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার নিজস্ব উৎপাদন ছিল ১৭৯ বিলিয়ন ডলার, বিদেশ হইতে আমদানী মাত্র ৪ বিলিয়ন ডলার এবং বিদেশে রপ্তানী মাল ৯·৮ বিলিয়ন ডলার। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে আমেরিকার অর্থনৈতিক শক্তি পরনিরপেক্ষ; এবং তাহার অর্থনৈতিক গঠন ইংলণ্ডের গত শতাব্দীর অর্থনৈতিক গঠন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

আমেরিকার বর্তমান সমৃদ্ধির প্রধান প্রমাণ তাহার মজুরীর হারে এবং মজুরগণের দৈনিক শ্রমকালে। ১৯৪৫ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল অঞ্চলে কৃষি-মজুরীর মাসিক হার ছিল ১৮৬ ডলার বা ৬২০ টাকা।

শিল্প-মজুরীর সাপ্তাহিক হারের গড় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৪৬·০৮ ডলার বা ১৫০ টাকার কিছু বেশী এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে

ছিল ৪৪'৪১ ডলার বা ১৫০ টাকার কিছু কম। সাপ্তাহিক শ্রমকালের গড় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৪৫'২ ঘণ্টা এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪৩'৪ ঘণ্টা। এত বেশী মজুরী এবং এত অল্প শ্রমকাল ইংলণ্ড রাশিয়া বা যে-কোন দেশে স্বপ্নেরও অগোচর। মজুরের স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে সে আমেরিকা।

সমস্ত পৃথিবীতে ডলারের দুষ্প্রাপ্যতার কারণও আমেরিকার অর্থনৈতিক গঠনের মধ্যে নিহিত। আমেরিকা দুনিয়ার নিকট খুব কম জিনিষই চায় বা পায়। অথচ দুনিয়া আমেরিকার কাছে চায় নানা প্রকারের মাল—এমন কি খাদ্যশস্য পর্যন্ত। কিন্তু তাহার বিনিময়ে আমেরিকার চাহিদা-মত তুল্য-মূল্য মাল সরবরাহ করিবার সামর্থ পৃথিবীর নাই। ডলারের দুষ্প্রাপ্যতা এই মৌলিক অসামঞ্জস্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমেরিকার মাল কিনিতে চাই ডলার। আমেরিকায় মাল বেচিতে না পারিলে ডলার পাওয়া যায় না। আমেরিকায় আমরা কম মালই বিক্রী করিতে পারিতেছি; কিন্তু কিনিতে চাহিতেছি তদপেক্ষা অনেক বেশী। কাজেই যত ডলার পাইতেছি তদপেক্ষা বহু বেশী ডলারের প্রয়োজন বোধ করিতেছি। ফলে আমাদের নিকট ডলার দুর্লভ হইয়াছে। চাহিদার তুলনায় কম পাওয়া যাইতেছে বলিয়াই সব দেশে ডলার রেশনিং চলিতেছে। ডলারের দুষ্প্রাপ্যতা কমাইতে হইলে আমাদের প্রথমতঃ খাদ্য বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইয়া আমেরিকা হইতে খাদ্যশস্য আমদানী বন্ধ করিতে হইবে;

দ্বিতীয়তঃ আমেরিকার বাজারে আমাদের মাল যাহাতে বেশী কাটে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমেরিকা বাহির হইতে যত মাল আমদানী করে তন্মধ্যে পাট-জাত দ্রব্যের স্থান বেশ উচ্চে। আমেরিকায় পাটজাত দ্রব্য বেচিয়া আমরা কম ডলার পাই না।

আমেরিকার সমৃদ্ধি-সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে ডিমোক্রেসি ও ব্যক্তি-উদ্যোগের ভিত্তিতে। সাধারণ মানুষেরাই এ সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছে। ষ্ট্যালিন বা হিটলারের মত কোন ডিক্টেটর তাহাদিগকে জবরদস্তি করিয়া একাজে লাগায় নাই। তাহারা নিজের স্বাধীন এবং সহজ বুদ্ধিতেই এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সাধারণ লোকের মধ্য হইতেই উদ্যোগী পুরুষ-সিংহগণ আবির্ভূত হইয়া দেশে লক্ষ্মী আনিয়াছেন। ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যেই লোকে এখানে কাজ করে। অথচ লক্ষ্মী এখানে ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের করায়ত্ত হন নাই, ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন। ফলে এদেশের দীনতম মজুর মাসিক ৬০০ টাকা উপার্জন করে এবং সপ্তাহে ৪০।৪৫ ঘণ্টার বেশী পরিশ্রম করে না। ডিক্টেটরশিপ ও দারিদ্র্যনিপীড়িত পৃথিবীতে আমেরিকা ডিমোক্রেসি ও স্বাধীন ব্যক্তি-উদ্যোগের আকাশচুম্বী বিজয়-নিশান স্বরূপ।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আমেরিকায় ব্যক্তি-উদ্যোগের এক সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়। আবর্তমান বাণিজ্য-চক্রের প্রচণ্ড সঙ্ঘাতে ব্যক্তি-উদ্যমের কক্ষচ্যুত হইবার

উপক্রম হয়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তখন তাঁহার 'নিউ ডিল' নীতি অনুসারে বহুমুখী রাষ্ট্র-উদ্যমের আয়োজন করেন। এই নীতিতে রাষ্ট্র-উদ্যমকে ব্যক্তি-উদ্যমের প্রতিযোগীরূপে ব্যবহার করা হয় নাই—ক্ষণ-বিভ্রান্ত ব্যক্তি-উদ্যমকে গণ-তন্ত্রোচিত উপায়ে স্ব-মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই প্রয়োগ করা হইয়াছিল।

আমেরিকায় ব্যক্তি-উদ্যমের প্রসার দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। টেলিগ্রাফ লাইন পর্যন্ত এখানে কোম্পানীর হাতে। রাষ্ট্র ব্যক্তির ক্ষমতাকে অভিব্যক্ত করিবার জন্যই—ব্যক্তিকে খর্ব করিবার জন্য নয়। এখানকার ডাকবিভাগের খরচ স্বকীয় আয়ে নির্বাহিত হয় না। ডাকমাশুল সস্তা করিয়া ব্যক্তি-উদ্যমকে সহায়তা করা সরকারের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য।

ডিমোক্রেসি সাধারণ মানুষের শক্তিতে আস্থাশীল। সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিলে সাধারণ মানুষ সত্য ও মঙ্গলের পথই বাছিয়া লইবে। স্বাধীন উদ্যম এবং স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ এই অবস্থাগুলির মধ্যে প্রধান। যুক্তিদ্বারা অপরকে স্বমতে আনিবার অবাধ সুযোগ ডিমোক্রেসির অচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সমস্ত বিষয়ে সুযোগ-সাম্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে চাই সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, পুস্তক প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমিতিতে অবাধে মিলিত হইবার স্বাধীনতা, এবং স্বমত প্রতিষ্ঠাকল্পে নিরঙ্কুশ বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতা। গবর্ণমেণ্টকেও সমস্ত

বিষয় যথাসম্ভব সাধারণের গোচরীভূত করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। গোপনতা ও রহস্যসৃষ্টি ডিমোক্রেসিতে যথাসম্ভব পরিহার্য। এইরূপ স্বাধীনতা ও সুযোগ-সাম্যের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া জনসমুদ্র মন্থন করিতে পারিলেই কল্যাণ-লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে।

গবর্ণমেণ্ট নির্বাচন-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই ডিমোক্রেসি হয় না। সাধারণ মানুষকে নিগড়বদ্ধ করিয়া বা তাহাকে উপযুক্ত সুযোগ না দিয়া নির্বাচন নিরর্থক। নির্বাচনেব পিছনে স্বাধীনতা ও সুযোগ-সাম্য থাকা চাই। তদ্রূপ মেজরিটি শাসনও ডিক্টেটরি শাসন হইতে পারে, যদি মাইনরিটির কখনও মেজরিটি হইবার সম্ভাবনা বা সুযোগ না থাকে। ডিমোক্রেসিব আসন এই সমস্ত নাম ও রূপের মধ্যে নয়। নাম ও রূপের বহু পিছনে ডিমোক্রেসির সন্ধান করিতে হইবে।

মেজরিটির আনুকূল্য লাভ করিলেও পেসিস্ট্রেটাস-এব গবর্ণমেণ্টকে কেহ ডিমোক্রেসি বলে নাই। সিজারেব শক্তি নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত এবং রিপাবলিকান্ গবর্ণমেণ্ট রূপে প্রকাশিত হইলেও তাঁহার গবর্ণমেণ্ট ডিমোক্রেসি নামের অযোগ্য ছিল। ষ্টালিন বা হিটলারের গবর্ণমেণ্টের কদাপি ভোটের অভাব হয় নাই। অবিভক্ত বঙ্গে মুস্লিম লীগ গবর্ণ-মেণ্টেরও ভোটের অভাব হয় নাই। তথাপি ইহারা কেহই ডিমোক্রেসি নয়। ইহারা সকলেই ডিমোক্রেসির ছদ্মবেশে ডিক্টেটরশিপ।

সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধিতে আস্থা ডিমোক্রেসির প্রথম প্রতিজ্ঞা। ডিমোক্রেসির দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা—মানুষ যুক্তিবাদী এবং তৃতীয় প্রতিজ্ঞা—মানুষ পরস্পর সদিচ্ছাপরায়ণ ও সহযোগিতামূলক মনোবৃত্তিসম্পন্ন। সামাজিক জীবনের মধ্যে নানা প্রকার বিরোধ নিহিত আছে। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থের সংঘাত সেখানে উপস্থিত হইবেই। ডিমোক্রেসির বিশ্বাস এই সমস্ত বিরোধের উভয় দিক বুঝিবার মত বুদ্ধি সাধারণ মানুষের আছে এবং তাহারা পরস্পরের প্রতি এইরূপ সদিচ্ছাপরায়ণ ও সহযোগিতার মনোভাবসম্পন্ন যে অপর পক্ষের স্বার্থ বুঝিয়া একটি গ্রহণযোগ্য আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হইবার মত সুবুদ্ধিও তাহাদের আছে।

আলোচনা দ্বারা মীমাংসায় পৌঁছিবার ক্ষমতা আমেরিকাবাসিগণের স্বভাবসিদ্ধ। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে যেখানেই আইন প্রণয়নে দুইটি স্বতন্ত্র সভার ঐকমত্য প্রয়োজন সেখানেই দেখা যাইবে যে, অন্ততঃ টাকাকড়ির বিষয়ে একটি সভাকে সম্পূর্ণ ক্ষমতাশূন্য করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের লর্ড সভার এ বিষয়ে প্রায় কিছুই ক্ষমতা নাই। এরূপ ব্যবস্থার কারণ এই যে সভা দুইটি আলোচনা দ্বারা সর্বদা ঐকমত্যে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; এবং টাকাপয়সাঘটিত প্রস্তাব ঐকমত্যের অভাবে গৃহীত না হইলে রাষ্ট্রব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে। আমেরিকায় কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। এখানে হাউস অব্ রিপ্রেজেন্টেটিভ ও কংগ্রেসের সর্ববিষয়ে তুল্য

শক্তি—বাজেট, ট্যাক্স প্রভৃতি সমস্ত জরুরী বিষয়ে আলোচনা দ্বারা প্রতি বৎসর ঐকমত্যে উপনীত হওয়া ইহাদের নিকট এখন পর্যন্ত অসম্ভব হয় নাই। আমি অবাক হইয়া সবাইকে প্রশ্ন করিয়াছি—"ইহা কিরূপে সম্ভব হয়।" সহজভাবে জবাব আসিয়াছে "কোনরূপে হইয়া যায়।"

শ্রমিক-বিরোধও এখানে আলোচনাদ্বারা মীমাংসা হয়। যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা চালাইতে সবাই অভ্যস্ত। শ্রমিকগণ এখানে যন্ত্রব্যবহারের বিরোধিতা করে না। ট্রেড ইউনিয়নসমূহ নিয়মিতরূপে অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌দের নিযুক্ত করিয়া উৎপাদনের অগ্রগতির হিসাব রাখে এবং বর্দ্ধিত উৎপাদনের ন্যায্য অংশ দাবী করে। ধর্মঘট করার স্বাধীনতা সকল শ্রমিকেরই আছে। আলোচনাদ্বারা যাহাতে যাবতীয় বিরোধের মীমাংসা হয় তাহার অনুকূল অবস্থার পোষণ করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এইরূপে উৎপাদনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবনযাত্রার মানও বাড়িয়া চলে।

আইন-আদালত যুক্তিদ্বারা বিরোধ মীমাংসারই একটি উপায়। এইজন্য গণতান্ত্রিক দেশ মাত্রেই আইন-আদালতের বিশেষ প্রাধান্য।

পারস্পরিক সদিচ্ছা ও যুক্তিপ্রবণতা ইহাদের জীবনযাত্রার সর্বত্র সুপরিস্ফুট। ডিমোক্রেসি ইহাদিগকে আলোচনাপরায়ণ করিয়াছে; আলোচনাপরায়ণতা ইহাদিগকে যুক্তিপ্রবণ করিয়াছে এবং যুক্তিপ্রবণতা ইহাদিগকে প্রত্যেকটি বিষয়ের সুনিপুণ

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে উদ্যোগী করিয়াছে। ইহাদের উন্নতির মূলে এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-প্রবৃত্তি। কাজ সম্বন্ধে ইহাদের ঢাক-ঢাক গুড়গুড় ভাব নাই। প্রত্যেকটি কাজ ইহারা এরূপভাবে নিষ্পন্ন করিবে যে তাহার সম্পাদন-চাতুর্য এবং ফলোৎকর্ষ সম্বন্ধে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশ না থাকে। সরকার তাঁহাব কার্যাবলী ও সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অনাবশ্যক গোপনতা অবলম্বন করেন না—সরকারের সমস্যা জনসাধারণেরই সমস্যা। তাহার সমাধান চিন্তায় সকলেরই তুল্য অধিকার।

এদেশে সুযোগ-সমতা অতুলনীয়। ন্যূনতম শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নয়নমূলক ব্যবস্থা সকলেরই করায়ত্ত। দীনতম মার্কিন শ্রমিক যে আয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী তাহা অন্য দেশের শ্রমিকদের আশাতীত। সাধারণ সামাজিক ব্যবহারে ছোট বড় ভেদ নাই। প্রভু ভৃত্যেব সঙ্গে বিনা দ্বিধায় একত্র বসিয়া আহার করেন।

মনুষ্যজাতিব পাঁচ-ছয় হাজার বৎসরের ইতিহাস প্রায় ডিক্টেটরশিপেরই ইতিহাস। পৃথিবীতে ডিক্টেটরশিপ নানা সময়ে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; নানা মতবাদের উপর স্বীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, কম্যুনিজম প্রভৃতি ডিক্টেটরশিপের রূপভেদ মাত্র। ইহাদের মধ্যে কেহ নির্জলা শক্তিবাদের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে; কেহ ঈশ্বরদত্ত অধিকার দাবি করিয়াছে; কেহ

সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রাদর্শের কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বলি দিয়াছে, আবার কেহ বা ইতিহাসের অনিবার্য স্রোতোবেগের মুখে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ভাসাইয়া দিয়াছে।

সাধারণ মানুষে অনাস্থা ডিক্টেটরশিপ মাত্রেরই প্রথম প্রতিজ্ঞা। ইহারা সকলেই অতিমানবে বিশ্বাসী। সাধারণ মানুষ ভ্রান্তবুদ্ধি। অতিমানবের বুদ্ধি অভ্রান্ত। অতএব সাধারণ মানুষকে পরিচালিত করিবার অধিকার তাঁহার জন্মগত।

ডিক্টেটরশিপ মাত্রই শক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যুক্তিবাদে ইহাদের আস্থা নাই। সাধারণ মানুষের বিচার-বুদ্ধি ভ্রান্ত। যুক্তিদ্বারা তাহাদিগকে কাজ করান সব সময় সম্ভব নয়। অতএব নিয়ন্ত্রণ ও জবরদস্তির বিশেষ প্রয়োজন।

কম্যুনিষ্টদের মতে শক্তিবাদী ডিক্টেটরশিপ আরও দুইটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি শ্রেণীবিদ্বেষ, অপরটি ইতিহাসের এক অনিবার্য গতির ধারণা। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম অনিবার্য। শ্রেণী প্রধানতঃ দুইটি ; শোষক ও শোষিত। এই সংগ্রামে পরিণামে শোষিতের জয় সুনিশ্চিত। ইতিহাসের গতি এই সুনিশ্চিত পরিণামের দিকে দুর্বার বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই দুর্বার গতি ডিক্টেটর বা মহানায়করূপে আমাদের সমক্ষে প্রকট। তাহার কাছে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই ; ব্যক্তি এই দুর্বার নিয়তির ক্রীড়নক মাত্র।

ডিমোক্রেসি ও কম্যুনিজম আদর্শ হিসাবে সম্পূর্ণ বিরোধী। ডিমোক্রেসি সাধারণ মানুষে আস্থাবান ও যুক্তিপ্রতিষ্ঠ।

কম্যুনিজম সাধারণ মানুষে আস্থাহীন ও শক্তিপ্রতিষ্ঠ। ডিমো-ক্রেসি বলিতেছেন সংসারের ভিত্তি প্রেমে। পারস্পরিক সদিচ্ছাই মানুষ্য-সমাজের বিশেষত্ব। সদিচ্ছাপ্রণোদিত আলাপ-আলোচনা দ্বারা বিরোধী স্বার্থসমূহ বা বিরোধী ভাবসমূহ মীমাংসায় উপনীত হয়। এক মীমাংসা হইতে অন্য মীমাংসায় সংক্রমণ দ্বারাই ইতিহাসের অগ্রগতি সূচিত হয়। কম্যুনিষ্ট বলিতেছেন শোষক ও শোষিত লইয়াই সমাজ। হিংসা ও বিদ্বেষেই এই সমাজের প্রতিষ্ঠা। যুক্তি এখানে অচল। মীমাংসা এখানে অসম্ভব। সংগ্রাম সর্বত্র ধূমায়িত। দুর্বার নিয়তি তোমাকে এই সংগ্রামে লিপ্ত করিবেই এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণামের দিকে লইয়া যাইবে। শোষক ও শোষিতের সংগ্রামে শোষিতের জয় অনিবার্য। তাহাদের মধ্যে যে সংগ্রাম সর্বত্র প্রধূমিত অবস্থায় বর্তমান, তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়া উদ্দীপ্ত করিতে পারিলেই শোষিতের জয় অনিবার্য। সংগ্রাম হইতে সংগ্রামান্তরে গমনই ইতিহাসের অগ্রগতি সূচনা করে।

ডিমোক্রেসির একটি অর্থ নৈতিক ভিত্তির প্রয়োজন। যখন মানুষের ন্যূনতম আর্থিক প্রয়োজন সহজেই মিটিয়া যায় এবং মোটামুটি সুযোগ-সমতাও বিদ্যমান থাকে তখনই মানুষ সাধারণতঃ সদিচ্ছাপরায়ণ ও যুক্তিপ্রবণ হয়। যাহার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান নাই এবং সংস্থান করিবার সুযোগও নাই তাহার বিদ্বেষপ্রবণ ও যুক্তিবিমুখ হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই ডিমোক্রেসির জন্য কথঞ্চিৎ আর্থিক সমৃদ্ধি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

দারিদ্র্য কম্যুনিজমের প্রসূতি। বণ্টন-ব্যবস্থায় অসমতা বেশী দূর গড়াইলে শ্রেণীবিদ্বেষ দেখা দেয়। তখন উৎপাদন কমিয়া যায়। উৎপাদন কমিয়া গেলে ভাগ লইয়া টানাটানি আরও বাড়িয়া যায়। এইরূপে বিদ্বেষ হইতে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্য হইতে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। তখন সাধারণ মানুষকে তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বাবা একতাবদ্ধ ও সদিচ্ছাপরায়ণ রাখা দুরূহ হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায গণতন্ত্রোচিত মনোবৃত্তিসমূহ লোপ পায়। দারিদ্র্যক্লিষ্ট সাধারণ মানুষ সহজেই ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা নেতার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ইহাই ডিক্টেটরশিপের আবির্ভাবের চিরন্তন কারণ।

আমেরিকা, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেই আজ সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উচ্চতম এবং স্বাধীনতা সর্বতোমুখী। কাজেই ফলদ্বারা বিচারে ডিমোক্রেসির শ্রেষ্ঠতা সুপরিস্ফুট। কিন্তু শুধু শ্রেষ্ঠ বলিয়াই ডিমোক্রেসি আপনা আপনি আসিবে না, বা আসিলেও টিকিয়া থাকিবে না।

ডিমোক্রেসিকে জীয়াইয়া রাখিতে হইলে সাধারণ মানুষকে বিদ্বেষমুক্ত ও যুক্তিপ্রবণ রাখিতে হইবে। তজ্জন্য চাই ন্যূনতম সমৃদ্ধি ও সুযোগ-সমতা। যদি আমরা এবিষয়ে কৃতকার্য না হই, আমরা ডিমোক্রেসি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বজায় রাখিতে বিফল হইব। বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রেম ও সদিচ্ছার সহিত মিলিয়া মিশিয়া স্ব-স্ব কর্তব্য পালন করিতে হইবে। তবেই দারিদ্র্য

দূর হইবে ; ডিমোক্রেসি ও স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় এ কাজের দুরূহতার প্রমাণ মিলিবে।

মানুষ স্বরূপতঃ অনন্ত জ্ঞানৈশ্বর্যময় ! ব্যবহারে মানুষের অশেষ দোষ। স্বরূপই যদি তাহার আসল পরিচয় হয় তবে একথা অবশ্যই মানিতে হইবে যে পরিণামে ডিমোক্রেসিই মঙ্গলকর। কিন্তু স্বরূপ বা তত্ত্ব লইয়া তো লোক-ব্যবহার চলে না। বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান চলিতে পারে কিন্তু সমব্যবহার তো চলিতে পারে না। অতএব যদিও ডিমোক্রেসি মানুষের স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত তথাপি ব্যবহারিক জগতে মানুষের দোষ-গুলির নিয়ন্ত্রণের যথোচিত ব্যবস্থা ডিমোক্রেসিকে করিতে হইবে। আবার ব্যবহারের দ্বারা যদি স্বরূপই ব্যাহত হইয়া যায় তবে ফল অবশ্যই অশুভ হইবে, কাজেই স্বরূপকে ব্যাহত না করিয়া তাহাব দোষরাশিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

ডিক্টেটরশিপ মানুষের দোষগুলির উপরই নিবদ্ধদৃষ্টি হওয়ায় স্বরূপকে বিকৃত করিয়া দেখে। বস্তুতঃ ডিক্টেটরশিপ মানুষের প্রকৃত স্বরূপে অবিশ্বাসী।

তত্ত্ব এবং ব্যবহারের সামঞ্জস্যবিধানের উপরই ডিমোক্রেসির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে তত্ত্ব ও ব্যবহারের নব নব সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে হইবে। তবেই তো ডিমোক্রেসি টিকিবে। অবস্থা পরিবর্তিত হইলেই নূতন অসামঞ্জস্যের উদ্ভব হইবে, নূতন সমস্যার উদয় হইবে।

এই সমস্যার সমাধান করিয়া নূতন সামঞ্জস্যে উপনীত হইতে হইবে। ইতিহাসে সমস্যার সমাধান নাই, রূপান্তর মাত্র আছে। সমস্যার রূপান্তরের মধ্য দিয়াই ইতিহাস অগ্রসর হইতেছে। আর এই অগ্রগতিতে মানুষের একমাত্র সহায় তাহার বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি।

নবম অধ্যায়

ক্যানাডা

৮ই জানুয়ারী বুধবার নিউইয়র্ক ত্যাগ করিব। প্রত্যূষে প্রস্তুত হইয়া নীচে আসিয়া হোটেলের পাওনা চুকাইতেছি এমন সময় ওয়েবষ্টার আসিয়া বলিল, তাহার যাওয়া হইবে না। রাত্রে তাহাকে যে শ্রুতিলিখনের কাজ দিয়াছিলাম তাহা সে স্বীয় কক্ষে বসিয়া টাইপ করিয়া ভোজনের পর আমাকে দিয়া গিয়াছিল। তারপর তাহার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। সে বলিল, "আপনাকে কাগজগুলি দিয়া ঘরে ফিরিয়া দেখি টাইপ-রাইটার যন্ত্রটি নাই। ম্যানেজারকে ফোনে জানাইলাম। ম্যানেজার যন্ত্রহস্তে নিষ্ক্রমণকারী চোরকে ধরিয়া পুলিশে দিলেন। যন্ত্রটি পুলিশের কাছে আছে। বিচার শেষ হইবার পূর্বে পাওয়া যাইবে না। পুলিশের আদেশে আমাকে অদ্য

তাহাদের আপিসে যাইতে হইবে। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া বৈকালের প্লেনে রওনা হইব।" ওয়েবষ্টার বিমানের নগর-কার্য্যালয় পর্যন্ত আমার সঙ্গে গেল এবং আমাকে বিমানঘাটি-গামী বাসে উঠাইয়া দিয়া হোটেলে ফিরিল।

লাগার্ডিয়া বিমানঘাটি হইতে সকাল ৯টায় বিমান উড়িল। নিউইয়র্ক শহরের উপর দিয়া উড়িয়াছি।

আকাশ হইতে নিউইয়র্ক শহরের একটি বিশেষ রূপ দৃষ্ট হয়। ২৫।৩০ তলা বাড়ীর পঙ্‌ক্তি। মাঝে মাঝে এক একটি বাড়ী যেন আকাশ ছুঁইবার জন্য সহসা উঠিয়া পড়িয়াছে। শহরকে পিছনে ফেলিয়া দ্রুতবেগে ছুটিয়াছি। পরিষ্কার দিন। সুন্দর রৌদ্র উঠিয়াছে। নীচে দিগন্তবিস্তৃত বরফ রাশি তাপহীন উজ্জ্বল দিবালোকে রজত-সিকতার মত জ্বলিতেছে। মাঝে মাঝে হ্রদ। হ্রদের জল বরফ হইয়া গিয়া রূপার মত শোভা পাইতেছে। মাঝে মাঝে হিমকণা-স্তূপ বালিয়াড়ির মত দাঁড়াইয়া রজতগিরির মত মনোজ্ঞ দেখাইতেছে। আকাশ হইতে দেশের এই অদ্ভুত রূপ বড়ই অপরূপ মনে হইতেছে। কৈলাসবিহারী মহাদেব যেন বিশ্বম্ভর মূর্তিতে ধ্যানমগ্ন। আবনি, প্লাটস্‌বার্গ ও মাসেনা নামক তিনটি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া তুপুরে অটোয়ার বিমান ঘাটীতে নামিলাম। নিউইয়র্ক হইতে আকাশপথে অটোয়ার দূরত্ব ৩৯৮ মাইল। বিমানঘাটি হইতে অটোয়া

নগরী দশ মাইল। হোটেলে যখন পৌঁছিলাম তখন একটা পনর মিনিট।

হোটেলটির নাম লর্ড এলগিন হোটেল। এলগিন ষ্ট্রীটের উপর অবস্থিত। নূতন হোটেল। খুব বড়। বন্দোবস্ত সবই মার্কিনী ধরণের। অদূরেই অটোয়া নদীতীরে পার্লামেণ্ট ভবন ও তাহার দুই পার্শ্বে সরকারী মূল আপিসগুলি অবস্থিত।

অটোয়া নগরী অটোয়া নদীর দক্ষিণ তীরে। নদীটি ক্বিবেক ও অণ্টেরিও প্রদেশদ্বয়ের সীমানা নির্দেশ করিতেছে। অটোয়া নগরী অণ্টেরিও প্রদেশে। নদীর ওপারে হাল নগরী ক্বিবেক প্রদেশে।

নদীতীরবর্তী একটি টিলা বা ছোট পাহাড় নদীগর্ভে খানিকটা আগাইয়া গিয়াছে। এই টিলার উপর পার্লামেণ্ট ভবন। তাহার দুই হাতলে দুইটি বড় বড় বাড়ী। এই বাড়ী দুইটির মধ্যে সরকারী মূল আপিসগুলি অবস্থিত। বাড়ী দুইটি ঈষ্ট ব্লক ও ওয়েষ্ট ব্লক নামে পরিচিত। টিলাটির উপর হইতে অটোয়া নদীর এবং ওপারের হাল সহরের দৃশ্য পরম মনোজ্ঞ। পার্লামেণ্ট ভবনটি সুদৃশ্য, নিপুণ স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। ছাতের উপর উচুনীচু সুন্দর চূড়াশ্রেণী। ঘড়ির চূড়াটি সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

পার্লামেণ্ট পাহাড়ের পূর্ব পার্শ্ব দিয়া রিডো ক্যানাল অটোয়া নদী হইতে নির্গত হইয়াছে। খালের মুখে বিরাট লৌহ-দরজা। ইহাদ্বারা জলের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

খালটি অটোয়া নগরীকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বহুদূরে অণ্টেরিও হ্রদে মিলিত হইয়াছে।

পার্লামেণ্ট ভবনের নিকটে খালের ওপারে রেল-কোম্পানী পরিচালিত বিখ্যাত 'শ্যাটো লড়িয়ে' নামক সুদৃশ্য হোটেল। তাহারই সম্মুখে রেল-ষ্টেশন।

অটোয়া ছোট শহর। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস অনুসারে এখানে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৫১ জন লোকের বাস।

সমগ্র ক্যানাডার রাজধানী হিসাবেই এই শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া ইহার বিশেষ গুরুত্ব নাই।

নগরটি মার্কিন পদ্ধতিতে সমান ও সমান্তরাল পথশ্রেণীদ্বারা পরিশোভিত। কিন্তু রাস্তাগুলির নাম বিলিতী রীতিতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নামানুসারেই হইয়াছে। এখানে ইংরেজী ভাষায় মার্কিনী ইডিয়ম ব্যবহৃত হয়। বানান বিলিতী, কিন্তু উচ্চারণ মার্কিনী। ইহারা ট্রামকে ষ্ট্রীটকার, লিফ্‌টকে এলিভেটর এবং ফুটপাথকে সাইড ওয়াক্‌ বলে। ইহাদের জীবনযাত্রার মান মার্কিনী মান অপেক্ষা কিছু নীচু, কিন্তু প্রণালীটি সম্পূর্ণ মার্কিনী। ইহাদের খাদ্যতালিকা ও রন্ধন-প্রণালী সম্পূর্ণ মার্কিনী। হোটেলে আমেরিকার মতই রকমারি খাদ্য দেখিয়াছি। তবে মূল্য নিয়ন্ত্রিত বলিয়া আমেরিকা অপেক্ষা কম। খানা তিন পদে সীমাবদ্ধ। প্রতি পদের পরিমাণ আমেরিকা হইতে কম। ক্ষীর-সংযোগে ভাপে সিদ্ধ

বৃহদাকার এক একটি আপেল এখানকার একটি উপাদেয় খাদ্য। কোন কোন ফলের রস এখানে আমেরিকার চেয়েও স্বাদুতর। মাছের স্বাদ বাংলার মাছের মত না হইলেও আমেরিকার মাছ হইতে ভাল বলিয়া মনে হইত।

এখানকার শাসনব্যবস্থা মাকিন-প্রথায় চলিলেও, শাসন-যন্ত্রের কাঠামো বিলাতী পদ্ধতিতে প্রস্তুত। ইংলণ্ডের রাজার নামে সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। বিলাতী পার্লামেণ্টের যাবতীয় নীতি ও পদ্ধতি ইহারা নিজেদের পার্লামেণ্টে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুকরণ করে। আমেরিকায় দেখিয়াছি ইংলণ্ডের নজির কেহ জানেও না, স্মরণও করে না। এখানে সমস্ত আলোচনায় ইংলণ্ডের নজির প্রথমে উত্থাপিত হয়। বিলাতী সভ্যতার সঙ্গে নিজেদের যোগ রাখিবার জন্য ইহারা সর্বদা উদ্বিগ্ন। পাছে ধনী ও শক্তিশালী আমেরিকার চাপে ইহারা একেবারে মাকিন বনিয়া যায় এ ভয় ইহাদের মনে সতত জাগরূক। ইংলণ্ডকে ইহারা মুক্তহস্তে সাহায্য করিতে সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু ইংলণ্ডের এতটুকু হস্তক্ষেপও ইহারা সহ্য করিবে না।

গত যুদ্ধের পর ক্যানাডার এক নবজাগরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ব্রিটিশ জাতি দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। ক্রমবর্দ্ধমান ক্যানাডা অদূরভবিষ্যতে সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হইবে ইহা অনেকেই মনে করিতেছে। সেজন্য ক্যানাডা আজ

চাহিতেছে স্বতন্ত্র নাগরিক অধিকার, স্বতন্ত্র জাতীয় সঙ্গীত। সাম্রাজ্যের নাগরিকত্ব বজায় রাখিয়াও সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির স্বতন্ত্র নাগরিক অধিকারের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তজ্জন্য লণ্ডনে এক সম্মেলন হইয়া গেল। ক্যানাডার স্বতন্ত্র জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার জন্য স্থানীয় পার্লামেণ্টে একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে।

প্রতিবেশী আমেরিকার অনতিক্রমণীয় প্রভাব, ইংলণ্ডের সভ্যতার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ এবং নবজাগ্রত আত্মপ্রত্যয় ও স্বাতন্ত্র্যবোধ—এই ত্রিধারার সংমিশ্রণ আজ ক্যানাডার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বত্র পরিস্ফুট। ক্যানাডার জীবন-নদী আজ এই তিনটি ধারায় পরিপুষ্ট হইতেছে।

ক্যানাডায় অপর একটি লক্ষণীয় বিষয় ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা এবং কৃষ্টির যুগপৎ সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা। ফরাসী ভাষা ও সংস্কৃতি কিবেক প্রদেশেই সীমাবদ্ধ। সেখানকার সরকারী কার্য্য ও শিক্ষা ফরাসী ভাষায় চলে। স্থানীয় অধিবাসিগণের ধর্ম ও ব্যক্তিগত আইন ফরাসী কৃষ্টিকে অনুসরণ করে। অন্য সমস্ত প্রদেশে ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী কৃষ্টি অনুসৃত হয়। অটোয়া মিউনিসিপ্যালিটির কাজ চলে ইংরেজী ভাষায়। নদীর ওপারে হাল শহরে মিউনিসিপ্যালিটির কাজ চলে ফরাসী ভাষায়। জাতীয় পার্লামেণ্টে উভয় ভাষাই চলে। প্রত্যেকটি আইন দুই ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। পর্য্যায়ক্রমে ইংরেজী ভাষা-

ভাষী ও ফরাসী ভাষাভাষী স্পীকার নির্বাচিত হন। সরকারী দপ্তর হইতে প্রেসনোটগুলি উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। ষ্টেনোগ্রাফার বা শ্রুতিলেখকগণের উভয় ভাষায় দক্ষতা প্রয়োজন। প্রতিযোগিতায় ফরাসী ভাষাভাষিগণ স্পষ্টতঃই পিছাইযা পড়িতেছেন। ক্বিবেক প্রদেশের বাহিরে তাহাদেব কোন প্রভাব নাই।

ওকালতি, ডাক্তারী প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফরাসী ভাষাভাষিগণের বিশেষ খ্যাতি থাকিলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজী ভাষাভাষিগণই দ্রুত আগাইয়া যাইতেছেন। ক্বিবেক প্রদেশেও বড় বড় ব্যবসাক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষাভাষিগণেরই অনেক বিষয়ে প্রাধান্য। সেখানকার ফরাসী ভাষাভাষিগণের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজী শেখেন। ফরাসী ভাষাভাষিগণ তাঁহাদের ভাষা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ। তাঁহাদের শিক্ষাব্যবস্থা, ধর্ম এবং ব্যক্তিগত আইন বজায় বাখিবার জন্য তাঁহাবা বিশেষ ব্যগ্র। অনেকেব মতে এবিষয়ে অতিব্যগ্রতাই ফরাসী ভাষাভাষিগণের পিছাইয়া পডিবার কারণ। ফ্রান্সের ফরাসীগণ সপ্তদশ শতাব্দীর পর দ্রুত আগাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে যাঁহারা সুদূর ক্যানাডায় আসিলেন তাঁহাবা যে কৃষ্টিকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন তাহাকে এত দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া রহিলেন যে তাঁহাদের অগ্রগতি অসম্ভব হইয়া পড়িল।

ক্যানাডা আয়তনে ৩৬,৯০,৪১০ বর্গমাইল; অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রায় আড়াই গুণ। ক্যানাডার জনসংখ্যা ১ কোটি ২১

লক্ষ অর্থাৎ ভারতবর্ষের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাগের এক ভাগ। দেশের উত্তরাংশ জনশূন্য বলিলেই হয়। জনবসতি মার্কিন সীমান্তের কয়েক মাইলের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। শ্বেতকায় জাতি আটলান্টিক হইতে সেণ্ট লরেন্স নদী দিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিয়াছে। বিরাট্ হ্রদমালা অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে বসতি বিস্তার করিয়াছে। উত্তরাংশে এখনও শুধু আদিম অধিবাসিগণের বাস বলিলেই চলে। নয়টি প্রদেশ এবং দুইটি টেরিটরি লইয়া ক্যানাডা দেশ। ইহাদের আয়তন ও জনসংখ্যা এইরূপ ঃ

প্রদেশ বা টেরিটরির নাম	ভূমি ভাগের আয়তন (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা	প্রতি বর্গ-মাইলে জন-বসতির গাঢ়তা
প্রিন্স এডোয়ার্ড দ্বীপ	২,১৮৪	৯৫,০৪৭	৪৩·৫২
নোভা স্কটিয়া	২০,৭৪৩	৫,৭৭,৯৬২	২৭·৮৬
নিউ ব্রান্সউইক	২৭,৪৭৩	৪,৫৭,৪০১	১৬·৬৫
ক্বিবেক	৫,২৩,৮৬০	৩৩,৩১,৮৮২	৬·৩৬
অণ্টেরিও	৩,৬৩,২৮২	৩৭,৮৭,৬৫৫	১০·৪৩
মনিটোবা	২,১৯,৭২৩	৭,২৯,৭৪৪	৩·৩২
সাচ্ কাচেওয়ান	২,৩৭,৯৭৫	৮,৯৫,৯৯২	৩·৭৭
আলবার্টা	৩,৪৮,৮০০	৭,৯৬,১৬৯	৩·২০
ব্রিটিশ কলম্বিয়া	৩,৫৯,২৭৯	৮,১৭,৮৬১	২·২৮
প্রাদেশিক মোট	২০,০৩,৩১৯	১,১৪,৮৯,৭১৩	৫·৭৪

প্রদেশ বা টেরিটরির নাম	ভূমি ভাগের আয়তন (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা	প্রতি বর্গ-মাইলে জন-বসতির গাঢ়তা
ইয়কন টেরিটরি	২,০৫,৩৪৬	৪,৯১৪	০·০২
উত্তর-পশ্চিম	১২,৫৩,৪৩৮	১২,০২৮	০·০১
সমগ্র ক্যানাডা	৩৪,৬২,১০৩	১,১৫,০৬,৬৫৫	৩·৩১

জনসংখ্যার শতকরা ৫৪·৩৪ ভাগ শহরবাসী। ক্যানাডার সর্বাপেক্ষা বড় শহর মন্ট্রিয়লে ৯ লক্ষ লোকের বাস। দ্বিতীয় শহর টরণ্টোতে সাড়ে ৬ লক্ষের কিঞ্চিদধিক লোক বাস করে। ইহাদের পরেই ভ্যানকুবার শহর। সেখানকার অধিবাসির সংখ্যা পৌনে তিন লক্ষ। লক্ষাধিক লোকযুক্ত আরও ৫টি শহর আছে ; যথা উইনিপেগ, হ্যামিলটন, অটোয়া ক্বিবেক ও উইণ্ডসর। উইনিপেগ মনিটোবা প্রদেশে, ক্বিবেক ক্বিবেক প্রদেশে এবং অপর তিনটি অণ্টেরিও প্রদেশে অবস্থিত। এই সমস্ত জনসংখ্যা ১৯৪১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী। বর্তমানে সবগুলি শহরের জনসংখ্যাই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ক্যানাডার আদিম অধিবাসিগণ জনসংখ্যার মাত্র ১·২৮ শতাংশ, এশিয়াটিক জাতি ·৬৪ শতাংশ। বাকী ইউরোপীয় জাতি। তন্মধ্যে ব্রিটিশ বংশীয়গণের অনুপাত ৪৯·৬৮ শতাংশ এবং ফরাসী বংশীয়গণের অনুপাত ৩০·২৭ শতাংশ। ইহার পরেই জার্মান বংশীয়গণের স্থান, ইহাদের অনুপাত মাত্র ৪·০৪ শতাংশ।

গত যুদ্ধে ক্যানাডায় উৎপাদন দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৯ সনে দেশের উৎপাদনের গ্রস মূল্য ও নীট মূল্য যথাক্রমে—৫৬৩,০৪,৭৬,৭৪২ ডলার ও ৩১৪,৯১,৭২,৯১৩ ডলার ছিল। ১৯৪৩-এ উৎপাদনের গ্রস ও নীট মূল্য দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২০২,৩৯,৫২,৫০১ ও ৬৩২,৫৪,৫৮,৩৩৭ ডলার।

নীট মূল্যের ৩৯.২৩ শতাংশ ছিল কৃষি, বন, মৎস্য, খনিজ প্রভৃতি প্রাথমিক উৎপাদন এবং ৬৭.২৭ শতাংশ ছিল শিল্প প্রভৃতি মাধ্যমিক উৎপাদন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন প্রদেশের উৎপাদনের নীট মূল্যের অনুপাত ছিল এইরূপঃ—

অণ্টেরিও	৪১.২৫	শতাংশ
ক্বিবেক	২৯.২২	”
ব্রিটিশ কলম্বিয়া	৮.৯৩	”
সাচ্ কাচেওয়ান	৫.২৭	শতাংশ
আলবার্টা	৫.০৮	”
মনিটোবা	৪.৫২	”
নোভা স্কটিয়া	২.৯৭	”
নিউ ব্রান্সউইক	২.১২	”
প্রিন্স এডোয়ার্ড দ্বীপ	০.৩২	”
ইয়কন ও উত্তর-পশ্চিম টেরিটরি	০.১২	”
	১০০.০০	

ক্যানাডার বহির্বাণিজ্যে তাহার কৃষিজাত, জান্তব, বনজ এবং খনিজ দ্রব্যেরই প্রাধান্য। গম, বার্লি ও ওট প্রভৃতি কৃষিজাত বস্তু, মাংস, ডিম, মৎস্য, চিজ, ফার ও দুগ্ধ প্রভৃতি জান্তব বস্তু ; কাঠ, এস্‌বেষ্টস্‌, কাগজ ও কাগজের পাল্‌প প্রভৃতি বনজ বস্তু, নিকেল, এলুমিনিয়ম, তামা ও জিঙ্ক প্রভৃতি খনিজ বস্তু প্রভূত পরিমাণে এদেশ হইতে বিদেশে চালান যায়। যুদ্ধের সময় এই সমস্ত বস্তুর বাহিরের চাহিদা খুব বাড়িয়া যায়। অধিকন্তু অনেক যুদ্ধসরঞ্জামের কারখানা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে যুদ্ধকালে ইহাদের রপ্তানি পরিমাণে দ্বিগুণ এবং মূল্যে তিন গুণ বাড়িয়া যায়। আমেরিকার মত ইহাদেরও আমদানী অপেক্ষা রপ্তানি অনেক বেশী। ফলে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধোত্তর কালে ধারে মালসরবরাহ করিবার নানারূপ বন্দোবস্ত ইহা-দিগকে করিতে হইয়াছে।

ইহাদের বহির্বাণিজ্যে আমেরিকার স্থান সর্বোচ্চে। তার পরই ইংলণ্ডের স্থান। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা ইহাদের সমগ্র রপ্তানিদ্রব্যের ৭৫·৮ শতাংশ ক্রয় করিয়াছে এবং ইহারা নিজেদের সমগ্র আমদানীর ৩৭·২ শতাংশ আমেরিকার নিকট হইতে পাইয়াছে। ঐ বৎসর ইহারা ইংলণ্ডের নিকট হইতে পাইয়াছে নিজেদের সমগ্র আমদানীর ৮·৯ শতাংশ এবং ইংলণ্ডকে সরবরাহ করিয়াছে সমগ্র রপ্তানির ২৯·৯ শতাংশ।

ফার, ইণ্ডিয়ান ও এস্কিমো লইয়াই তুষারময় উত্তর ক্যানাডা। দক্ষিণ ক্যানাডার প্রদেশগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ

করা যায়। আটলান্টিক তীরবর্তী অঞ্চল, মধ্য ক্যানাডা, প্রেয়ারী অঞ্চল এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল।

নোভাস্কটিয়া, নিউব্রান্সউইক ও প্রিন্স এডোয়ার্ড দ্বীপ আটলান্টিকের তীরবর্তী। নোভাস্কটিয়া কয়লা, আপেল ও মাছের জন্য বিখ্যাত। হ্যালিফ্যাক্স ইহার প্রধান বন্দর। নিউব্রান্সউইক বনসম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে অনেক পাল্‌প তৈরির কারখানা আছে। চাষ ও পশু-পালন ক্ষুদ্র প্রিন্স এডোয়ার্ড দ্বীপের বড় ব্যবসা। ফারের জন্য শৃগাল পালনের একটি সুবৃহৎ ফার্ম এই দ্বীপে অবস্থিত। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করিল তখন আমেরিকার অনেক 'রাজভক্ত' নাগরিক আমেরিকার সংস্রব ত্যাগ করিয়া নোভাস্কটিয়া ও নিউব্রান্সউইকে বসতি স্থাপন করেন।

সেণ্ট লরেন্স উপত্যকার ক্বিবেক ও অণ্টেরিয়ো প্রদেশ লইয়া মধ্য-ক্যানাডা। শিল্পে ও বাণিজ্যে এই তুইটি প্রদেশ সর্বাপেক্ষা অগ্রণী। অণ্টেরিওর খনিজসম্পদ প্রসিদ্ধ। মধ্য-ক্যানাডাই পূর্বে ক্যানাডা নামে পরিচিত ছিল। এইখানেই ইংরেজ-ফরাসী প্রতিযোগিতা এক সময় তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। এখান হইতেই ইংরেজী ভাষাভাষিগণ ক্রমশঃ প্রেয়ারি অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। মনিটোবা সাচ্‌কাচেওয়ান ও আলবার্টা লইয়া প্রেয়ারি অঞ্চল। এই অঞ্চলে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে গম, বার্লি, ওট প্রভৃতি প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। সুপিরিয়র, মিশিগ্যান, হুরণ, ঈরী ও অণ্টেরিও নামে পাঁচটি বিরাট হ্রদ এই অঞ্চলে অবস্থিত।

তন্মধ্যে মিশিগ্যান হ্রদটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত। অপর চারিটি ক্যানাডায়। হ্রদগুলি পরস্পর সংযুক্ত এবং সেণ্ট লরেন্স নদীর সহিত মিলিত। সুপিরিয়রের তীরে পোর্ট আর্থার ও ফোর্ট উইলিয়ম নামক বন্দর দুইটি হইতে গম এই হ্রদমালা দিয়া ষ্টীমারযোগে পূর্বাভিমুখে চালান দেওয়া হয়। এই পথ বৎসরে আট মাস খোলা থাকে। প্রেয়ারি অঞ্চলের দিগন্ত প্রসারী প্রান্তর পর্য্যায়ক্রমে বরফে ও ফসলে ঢাকা থাকে। এখানে দুঃসহ শীতে বরফে সব একাকার হইয়া যায়। মার্চ মাসে বরফ গলিতে সুরু করে। গ্রীষ্মে সমস্ত প্রান্তর শস্যপূর্ণ হইয়া কৃষককুলের মনের সহিত আন্দোলিত হইতে থাকে। আগষ্ট মাসে হিমসমাগমের ভয়ে ফসল কাটিয়া দ্রুত ঘরে তুলিতে হয়। দাম ভাল থাকিলে শীতের প্রকোপ এড়াইবাব জন্য কৃষকগণ সপরিবারে দক্ষিণে বা পশ্চিমে যাইবার আশা পোষণ করে; নচেৎ তুষারের মধ্যে স্ব-গৃহেই তাহাদিগকে শীতঋতু যাপন করিতে হয়।

আলবার্টা প্রদেশে প্রচুর কয়লা ও পেট্রল উৎপন্ন হয়। আলবার্টায় দুইটি জাতীয় পার্ক আছে। শরৎকালে আমোদ-প্রমোদের জন্য এখানে বহু জনসমাগম হয়। হরিণ ও ভল্লুক এখানকার জঙ্গলে নির্ভয়ে বিচরণ করে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শতসহস্র হ্রদে মাছ ধরা খুব আনন্দদায়ক। এই প্রদেশেই ক্যানাডীয় 'রকি' বা পর্বতশ্রেণীর আরম্ভ। ইহার সৌন্দর্য বিশ্ববিখ্যাত।

ইহার পরেই প্রশান্ত মহাসাগব তীরবর্তী বৃটিশ কলম্বিয়া প্রদেশ। এখানকার দীর্ঘ ডগ্‌লাস্ ফার্ বৃক্ষমালা পরম রমণীয়। রকমারি খনিজ সম্পদে প্রদেশটি সমৃদ্ধ। এখানে শীত দুঃসহ নয়; প্রশান্ত মহাসাগরের শ্যামন মাছ বেশ সুস্বাদু। অভিজাত সম্প্রদায় বিলাতী আচার-ব্যবহারের সবিশেষ পক্ষপাতী। ব্রিটিশ কলম্বিয়া ক্যানাডার মধ্যে বিলাতী আদর্শ দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবিত প্রদেশ।

অটোয়া পৌঁছিয়া মধ্যাহ্নভোজনান্তে একটু বাহির হইলাম। তাপ শূন্যের নীচে। বাহিরে যাওয়া রীতিমত দুষ্কর। রাস্তা জনশূন্য। প্রয়োজন না থাকিলে কেহ বাহির হয় না। বাহির হইলে দ্রুত ট্রাম বা বাসে গিয়া চড়ে। চারিদিকে শুধু বরফ। নদী, খাল, লেক, পার্ক, রাস্তা, ঘাট, মাঠ সব গভীর বরফে ঢাকা। বৎসরে ১০৮ ইঞ্চি বরফ পড়ে। প্রায় সবটাই ৩।৪ মাসে পড়িয়া যায়। প্রায়ই বরফ পড়িতেছে। শহরের রাস্তা পরিষ্কার রাখা কঠিন। প্রশস্ত রাস্তাগুলির সবটা পরিষ্কার রাখা অসম্ভব। মোটর এবং মানুষ চলিবার মত একটু সরু পথ পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করা হয়। হাঁটিবার সময় দু'পাশে উঁচু বরফের স্তূপ। কোথাও হাঁটু সমান, কোথাও বা কাঁধসমান উঁচু। তাপ সাধারণতঃ ১০।১৫ ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠে; এবং শূন্যের ১০।১৫ ডিগ্রী নীচে পর্যন্ত নামে। ৩০ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিলেই বরফের বদলে বৃষ্টি পড়ে। এ সময় বৃষ্টি কদাচিৎ হয়। বৃষ্টি হইলে পথঘাট বড়

খারাপ হয়। সাধারণতঃ বরফ সাদা ধূলার মত বা উজ্জ্বল বোরিকের গুঁড়ার মত একদম শুক্‌না। কিন্তু তাহার উপর বৃষ্টির জল পড়িবামাত্র জমিয়া শক্ত ও পিচ্ছিল হইয়া যায়। একটা শক্ত ও পালিশ বরফের পাতে সকল স্থান আচ্ছাদিত হইয়া যায়। তাহার উপর দিয়া পা টিপিয়া হাঁটা বেশ বিপজ্জনক এরূপ জমাট বরফ সাফ করাও কষ্টকর। গুঁড়ি বরফ বৃহদাকার যান্ত্রিক পাখার হাওয়া দিয়া উড়াইয়া লরি বোঝাই করিয়া সরাইয়া ফেলা হয়। কিন্তু জমাট বরফ গাঁইতি দিয়া কাটিয়া সরাইতে হয়। ছাতে ও গাছে বৃষ্টির জল পড়িয়া গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে বরফ হইয়া যায়। গাছপালা যে এত নিঃস্ব হইতে পারে তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না। শরৎকালে ক্যানাডার পুষ্পপল্লবসমৃদ্ধ তরুরাজির অপার ঐশ্বর্যের কথা শুনিয়াছি ও চিত্রে দেখিয়াছি। কিন্তু এ যে নগ্ন নিঃস্ব কৃষ্ণকায় ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীর দল। সম্পূর্ণ স্পন্দহীন ও নিঃসঙ্গ। অনেক কষ্টে অল্প ভ্রমণ করিয়া হোটেলে ফিরিলাম। সন্ধ্যায় ওয়েবষ্টার আসিয়া পৌঁছিল।

পরদিন আমার আগমনবার্তা বিজ্ঞাপন করিয়া সকাল দশটায় অর্থ-বিভাগের ডেপুটি মিনিষ্টার ডাঃ ডব্লু, সি, ক্লার্কের সহিত মিলিত হইলাম। আমাদের পরিভাষায় ইনি অর্থ-বিভাগের সেক্রেটারী। ক্লার্ক তাঁহার দুই জন সহকর্মীর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। এক জন ডাঃ এ, কে, ইটন, ট্যাক্স বিষয়ে বিশেষজ্ঞ; অপর জন আর, বি, ব্রাইস,

বাজেট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডে ক্যানাডার প্রতিনিধি। ঐ বোর্ডে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি শ্রীযুত সুন্দরেশনের সঙ্গে ইঁহার বিশেষ পরিচয় আছে। ঐ দিনই পরে রাজস্ববিভাগের ডেভিড সিম ও ডি, সি নার্ডম্যানের সঙ্গে আলাপ হইল। এখানে অর্থ-বিভাগ কর নির্ধারণ করে; রাজস্ব বিভাগ কর আদায় করে।

ক্যানাডিয়ানগণের সৌহার্দ্য অতুলনীয়। ইঁহারা সদালাপী এবং বিদেশীকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করিতে উন্মুখ। ক্লার্ক আমাকে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া নিকটবর্তী রিডো ক্লাবে লইয়া গেলেন। এখানে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ মধ্যাহ্নভোজন উপলক্ষ্যে মিলিত হন। আমরা চারি জনে একসঙ্গে খাইলাম। ক্লার্ক, ইটন, এখানকার ন্যাশনাল হার্‌বার বোর্ডের অধ্যক্ষ বি, জে, রবার্ট এবং আমি। ভোজনান্তে বসিবার ঘরে অনেকের সঙ্গে পরিচিত হইলাম। তন্মধ্যে এক জন সপ্ততিবর্ষীয় বৃদ্ধ। ইনি এদেশের বিমানপথ-উন্নয়নের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; ৩০।৩৫ বৎসর পূর্বে কলিকাতায় বার্ণ কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন।

আমার নিকট কলিকাতার বিরাট হর্ম্যমালা ও উপভোগ্য শীতঋতুর কথা শ্রবণে ক্লার্ক যখন বিস্ময় প্রকাশ করিতেছিলেন তখন বৃদ্ধ আমাকে সমর্থন করিয়া এবং প্রশংসমান কণ্ঠে কলিকাতা নগরীর বিরাটত্ব এবং সৌন্দর্যের বর্ণনা করিয়া ক্লার্ককে বিস্মিততর করিয়া তুলিতেছিলেন। রবার্টস আগামী

সপ্তাহে ভ্যান্‌কুবার বন্দর পরিদর্শনে যাইবেন। আমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। তিনি ভোজনান্তে আমাকে পার্লামেণ্ট-ভবনে লইয়া গিয়া লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। লাইব্রেরিয়ান বৃদ্ধ। নাম হার্ডি। পরমোৎসাহে তন্ন তন্ন করিয়া সমগ্র লাইব্রেরি ও পার্লামেণ্ট-ভবনটি আমাকে দেখাইলেন ও পার্লামেণ্টের সমস্ত রীতিনীতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। নীচে তাঁহার নিজের ঘরে লইয়া গিয়া সেখান হইতে তুষারাবৃত অটোয়া নদী ও ওপারের হাল শহরের রমণীয় দৃশ্য দেখাইলেন। তাঁহার সঙ্গে ঘড়ির চূড়ার উপর গিয়া সেখান হইতে শহরের চারি দিকের সুন্দর রূপ দেখিলাম। অটোয়া নদীর পরপারে দূরে গাতিনো পর্বতমালা। সেখানে শীতে স্কি খেলার খুব ভাল ব্যবস্থা। তিন-চার হাত লম্বা সরু নৌকাকৃতি নীচে-চাকাযুক্ত স্কি-দ্বয়ের উপর পা বাঁধিয়া খেলোয়াড়গণ যখন পর্বতশীর্ষ হইতে খাড়া মসৃণ বরফের পথ দিয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া ঘণ্টায় ৪০।৫০ মাইল বেগে নিম্নে অবতরণ করে তখন দর্শকের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। স্কি-খেলায় ক্যানাডিয়ানগণের বড় নাম। ইউরোপে সুইজার-ল্যাণ্ড এবং নরওয়েতেও স্কি-খেলার বিশেষ খ্যাতি।

ঘড়ির চূড়ায় ঘড়ির নীচে একটি ঘরে একখানি বড় বই সুরক্ষিত দেখিলাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যত ক্যানাডাবাসী মারা

যায় তাহাদের নাম বইখানিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। রোজ এক পৃষ্ঠা করিয়া উল্টান হয়। কবে কোন্ পৃষ্ঠা উল্টানো হইবে তাহা ঠিক করিয়া দেওয়া আছে। ঐ পৃষ্ঠায় যাহাদের নাম আছে তাহাদের আত্মীয়গণ সেই দিন আসিয়া লেখা দেখিয়া দেশের জন্য মৃত প্রিয়জনকে স্মরণ করেন। বৃদ্ধ গদগদ ভাবে স্বীয় পিতার কথা বলিলেন। তাঁহার পিতা ব্রিটিশ আর্মিতে ছিলেন; বহু বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন। গীতার প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। তিন-চার বৎসর আগে প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি প্রত্যহ গীতা পড়িয়াছেন। বৃদ্ধের নিকট হইতে কয়েকখানা বই লইয়া তাঁহার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইয়া হোটেলে ফিরিলাম। তখন ঝুর ঝুর করিয়া বরফ পড়িতেছিল—শেফালিকা বৃক্ষ হইতে শরতের প্রভাতে যেরূপ শেফালি ফুল অবিরত ঝরিয়া পড়ে অনেকটা সেইরূপ। কোট ও টুপির উপর হইতে মাঝে মাঝে বরফ ঝাড়িতে ঝাড়িতে তুষারাস্তীর্ণ পথে পা টিপিয়া টিপিয়া হোটেলে পৌঁছিলাম।

আমেরিকায় যে হোটেলগুলিতে ছিলাম সেখানে খাবার ঘরে প্রত্যেককে বা প্রত্যেক দলকে আলাদা টেবিলে বসাইয়া দেয়। অন্য লোককে সে টেবিলে বসায় না। কাজেই খাবার টেবিলে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ হয় নাই। এ হোটেলে অপরিচিত লোকের সঙ্গে এক টেবিলে খাইতে হয়।

১১ই জানুয়ারী শনিবার প্রাতরাশের সময় ফ্লোরিডার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে ইঁহার জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। ইনি বলিলেন, "ভারতের প্রাচীন ইতিহাস কিঞ্চিৎ পড়িয়াছি। আধুনিক ইতিহাস জানি না। আপনাদের সঙ্গে ব্রিটিশের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানিবার খুব ইচ্ছা হয়।"

আমি বলিলাম, "আলেকজাণ্ডারের সময় হইতেই বিদেশীয়গণ ভারত আক্রমণ করিয়াছে।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "কিন্তু গ্রীকদের ত আপনারা দশ বৎসরের মধ্যেই বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তাই নয় কি ?"

আমি, "হাঁ, ঐ রূপই হইবে। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাস ভারত সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের হাতে পরাজিত হন।"

ভদ্রলোকটির প্রশ্ন আমার কাছে বড় নূতন ঠেকিল।

গ্রীকেরা দশ বৎসরের বেশী ভারতে থাকিতে পারিল না, ইংরেজ দেড় শত বৎসর থাকিল কিরূপে ? আমরা ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পড়ি তাহাতে এ প্রশ্নও নাই, তার উত্তরও নাই।

এ বরফের রাজ্যে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া বরফ ঠেলিতে ঠেলিতে পথ চলিতে হয়। বাহির হইলেই মনে হয় কতক্ষণে ঘরে ঢুকিব। গৃহমাত্রেই কেন্দ্রীয় তাপ-ব্যবস্থা থাকায় ঘরের মধ্যে বিশেষ অসুবিধা নাই। এই শীতে বড় বড় বাড়ী গরম রাখিতে যে ইঞ্জিন চালাইতে হয় তাহাতে মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ডও ঘটিয়া যায়। কাগজে দেখিতেছি

আমেরিকার কয়েকটি হোটেলে পর পর আগুন লাগিয়া লোক মারা গেল। তাহা লইয়া সে দেশে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। শিকাগোর যে হোটেলে আমি ছিলাম সেই ব্লাক্ষ্টোন হোটেলেও আগুন লাগিবার সংবাদ পাইলাম। তবে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। আমার ঘরে বসিয়া বসিয়া এলগিন রোডের তুষারাবৃত দৃশ্য দেখিতাম। ঝুর ঝুর করিয়া বরফ পড়িতেছে—হাওয়া আপিসের পূর্বাভাসেব অভ্রান্ততা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। কখন বরফ পড়িবে বা কখন বৃষ্টি হইবে কাগজে ও রেডিওতে তাহা ঠিক বলিয়া দিতেছে। চারি দিক বরফে একাকার। শরতের অটোয়ায় পুষ্পপল্লবমণ্ডিত প্রকৃতির রঙের খেলা নাকি অদ্ভুত। কিন্তু হিমাবৃত প্রকৃতির আভরণহীন সর্বশুক্ল রূপও অপরূপ।

১২ই জানুয়ারী রবিবার ইহাদের আর্ট গ্যালারী ও মিউ-জিয়ম দেখিতে যাই। আর্ট গ্যালারীতে বেশী ছবি নাই। ইউরোপীয় শিল্পিগণের ছবিই বেশী। জনৈক ক্যানাডিয়ান শিল্পী প্রকৃতির শারদীয় রূপ ও শীতের রূপ একত্র প্রদর্শনেচ্ছু হইয়া 'অক্টোবরে তুষারপাত' এই নাম দিয়া একটি সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন। চিত্রে বিচিত্র পুষ্পপল্লবশোভিত তরু-লতার মস্তকে শুভ্র তুষার সন্নিবেশ সুন্দর দেখাইতেছে। মিউজিয়মটি ছোট; কিন্তু অতীত যুগের প্রস্তরীভূত গাছ ও জানোয়ারের কঙ্কালগুলি দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। গাছ পাথর হইয়া গিয়া স্বকীয় রূপ বজায় রাখিয়া পাহাড়ের

মধ্যে কিরূপে অন্তর্নিহিত থাকে তাহা দেখিতে খুব ভাল লাগিল। গাছের গুঁড়িটি ঠিকই আছে, কিন্তু পাথর হইয়া গিয়াছে। গাছটি নাকি বিশ কোটি বৎসর পূর্বেকার। অনেক মাছের কাঁটা রহিয়াছে। সেগুলিও পাথর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আকারের কোন পরিবর্তন হয় নাই। এগুলির বয়স পনর-বিশ কোটি বৎসর।

পূর্বে পৃথিবীতে ডাইনোসার নামে এক জাতীয় অতিকায় সরীসৃপ বাস করিত। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে তন্মধ্যে উহাই নাকি বৃহত্তম ও হিংস্রতম। অন্ততঃ ৬ কোটি বৎসর হইল ইহা পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। কয়েকটি ডাইনোসারের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল এই মিউজিয়মে আছে। একটি কঙ্কাল লম্বায় ত্রিশ ফুট। এই সব প্রস্তরীভূত মাছ, গাছ ও জানোয়ার ক্যানাডার পাহাড় কাটিয়া পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি আধুনিক জানোয়ারের মৃতদেহও এখানে রক্ষিত আছে। উত্তর মেরুর ভল্লুক বা শিয়াল একদম সাদা ও খুব লোমশ। বন্য মহিষগুলি ভীষণ। এক রকম গরু দেখিলাম। নাম কস্তুরী গরু (musk ox), সেগুলি কাটিলে নাকি কস্তুরীর মত সুগন্ধ নির্গত হয়। একটি ঘরে নানা রকমের খনিজ পদার্থ সাজান আছে। একটা বেশ বড় হীরক দেখিলাম।

পরদিন ব্যাঙ্ক অব ক্যানাডায় যাইতে হইল। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, সম্পূর্ণ সরকারী। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক

সরকারের মধ্যে অর্থ ও করবিষয়ক সম্পর্ক লইয়া কিছুদিন যাবৎ খুব আলোচনা চলিতেছে। এ বিষয়ে অর্থবিভাগের একটি স্থায়ী শাখা আছে। ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত স্কেলটন এই শাখার কর্ণধার। আপিসটি ব্যাঙ্কের বাড়ীতে অবস্থিত। এই শাখার কার্য দেখিবার জন্যই আমাকে এই বাড়ীতে যাইতে হইত। প্রবেশকালে উপরে যাইয়া আমাকে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিতে হইল। সেখানে আগন্তুকদের অভ্যর্থনার্থ যে দীর্ঘকায় ভদ্রলোকটি উপবিষ্ট ছিলেন তিনি নানারূপ আলাপে আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি ডিউক অব কনটের অন্যতম খাস কর্মচারীরূপে ভারতবর্ষে গিয়াছিলাম। ভারতবর্ষ সুন্দর দেশ। সেখানকার রাজন্যবর্গের আর শিকারের তুলনা হয় না। দিল্লীতে অদ্ভুত জাঁকজমকপূর্ণ যে নাচ দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নয়। বিরাট হল। অনুপম তার সজ্জা। সহস্র স্থির বিদ্যুতালোকে গৃহটি সমুজ্জ্বল। রাজন্যবর্গের পোষাকের শোভা বর্ণনাতীত। বিচিত্র রঙ্, অসম্ভব চাকচিক্য, মাথায় বহুমূল্য মণিমাণিক্য-খচিত পাগড়ি। আলোক-রশ্মিসম্পাতে সেই মণিমাণিক্যসমূহ অদ্ভুত লাবণ্য বিকীরণ করিতেছে। উপরের ব্যালকনী হইতে দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতেছিলাম। মধ্য-প্রদেশের জঙ্গলে যে মহাসমারোহপূর্ণ শিকারের আয়োজন হইয়াছিল তাহা সত্যই অপূর্ব। ঐ যাত্রায় আমরা সিঙ্গাপুরেও গিয়াছিলাম। সেখানে আমি খুব বড় একটা সাপ মারি। চামড়াটি এখনও আমার কাছে আছে।"

পরের দিন আমি ব্যাঙ্কে যাইয়া দেখি ভদ্রলোক সযত্ন-রক্ষিত দীর্ঘ চামড়াটি আমাকে দেখাইবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছেন। ভদ্রলোকটি ভারতবর্ষের সুখ্যাতিতে মুখর। তাঁহার কাছে রাজন্যবর্গ ও শিকার লইয়াই ভারতবর্ষ।

সেদিন রাত্রে খাবার টেবিলে দুটি ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। একজন ভ্যান্‌কুবার নিবাসী, ধাতুবিদ্যায় সুপণ্ডিত। অপর জন মার্কিন; বহুদিন ক্যানাডার আটলান্টিক উপকূলে বাস করিয়াছেন। ভদ্রলোকদ্বয় পরস্পর পরিচিত। ক্যানাডিয়ান খনিবিদ্যা ও ধাতুবিদ্যা সংসদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রথমোক্ত ভদ্রলোকটি অটোয়ায় আসিয়াছেন। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি ব্যবসায় উপলক্ষে আগত। প্রথম ভদ্রলোকটি বেশ আলাপী। গান্ধীজীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার মুখে গান্ধীজীব বিপুল প্রভাবের কথা শুনিয়া প্রশ্ন করিলেন, "যন্ত্রশক্তির বিরোধী হইয়া আপনারা কিরূপে উন্নতি করিবেন? যন্ত্রশক্তির ব্যবহাব ছাড়া লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা অসম্ভব।"

জবাবে বলিলাম, "যন্ত্রশক্তির প্রতি গান্ধীজীর অবশ্য নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে। কিন্তু যন্ত্রশক্তির প্রতি গান্ধীজীর বিরোধিতা দ্বারা তাঁহার মহত্ত্বের পরিমাপ করা চলে না। গান্ধীজী ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত প্রতীক। সত্য ও অহিংসা তাঁহার নিকট নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ, সরল এবং প্রাণদায়ক। সম্পূর্ণ সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে ভারতের

মত এত বড় একটি আত্মবিস্মৃত জাতিকে তিনি স্বাধীনতা-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া সাফল্যের দ্বারদেশে লইয়া আসিয়াছেন। পৃথিবীতে ইহার তুলনা আছে কি ?”

ক্যানাডার তথা অটোয়ার কথা উঠিল। আমি অটোয়ার মিউজিয়মের কথা বলিলাম। এদেশের খনিজ ও বন-সম্পদের বিষয়ে আলোচনা চলিল। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বলিলেন, “এদেশের বনসম্পদের ধ্বংসসাধনই চলিতেছে ; সংরক্ষণের বন্দোবস্ত নাই। এদেশের কৃষিও প্রায় খনির মত। সেখান থেকে সম্পদ তুলিয়া লওয়া হইতেছে। সংরক্ষণের কোন চেষ্টা নাই।” ধাতুবিদ্ আমাকে ভারতবর্ষের খনির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দু-এক কথায়ই বুঝিলাম ভারতের খনি সম্বন্ধে ইনি আমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন। কোলাবের স্বর্ণ-খনি সম্বন্ধে ইনি অনেক কথা বলিলেন। নিজ বিষয়ে ইহার বিশেষ দখল। বলিলেন, “আমাদের খনিজ সম্পদ কিরূপ দ্রুতবেগে ক্ষয় পাইতেছে সেই সম্বন্ধে কাল সংসদে আমি একটি প্রবন্ধ পড়িব। কয়লা, লৌহ প্রভৃতি তো অফুরন্ত নয়। যদি নিঃশেষ হইয়া যায় ?”

আমি। “অপব্যয় অবশ্য পরিহার্য। তাই বলিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইবার পক্ষপাতী আমি নই। সব ফুরাইয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কায় এখনই হাত পা গুটাইবার বা নিজেদের উন্নতি-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিবার বুদ্ধিকে আমি সুবুদ্ধি বলিব না।” প্রথম। “কিন্তু যে ভাবে ব্যয় চলিতেছে তাহাতে

ধাতুগুলি ফুরাইয়া যাইবেই। নূতন খনি আবিষ্কারেরও তো একটা সীমা আছে। আপনি মিউজিয়মে যে বিরাটকায় ডাইনোসার দেখিয়াছেন তাহারা তো খাদ্যাভাবেই লুপ্ত হইয়াছে। আমাদেরও তো অনুরূপ গতি হইতে পারে।”

আমি। “বিজ্ঞান আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করিবে কেন? বিজ্ঞান দিবে সাহস। আমরা তো জ্ঞানের সীমানায় পৌঁছাই নাই। কোন কোন বৈজ্ঞানিক অঙ্ক কষিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে এতদিন বাদে সূর্যের আলো ফুরাইয়া যাইবে। তাই বলিয়া কি এখনই নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িব?” প্রথম (সোৎসাহে)—“যখন সূর্যের আলো ফুরাইবে তখন ধাতুবিদ্‌গণ ধাতুদ্বারা আলোক সৃষ্টি করিবে।”

আমি। “ইহাই তো বৈজ্ঞানিকের মত কথা। সেইরূপ যত দিনে আপনার কয়লা বা লৌহ ফুরাইবে তত দিনে আণবিক শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইলেক্‌ট্রনের সজ্জা বদলাইয়া এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করাও সম্ভব হইবে।” আমাদের খাওয়া অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গিয়াছিল, ভদ্রলোকটি বলিলেন, “আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আজ আমরা পৃথিবীর তিন দিকের তিনটি লোক একত্র আহার করিয়া ও নানাবিধ সদালাপ করিয়া পরম পরিতোষলাভ করিলাম। ভ্যান্‌কুবারে গ্রে পয়েণ্টে একটি খনিজ দ্রব্যের মিউজিয়ম আছে। আপনি ভ্যান্‌কুবারে গিয়া সেটি অবশ্য দেখিয়া যাইবেন।”

পরস্পর সম্ভাষণ জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

একদিন কাগজে আলাস্কায় আমেরিকার যুদ্ধবিষয়ক গবেষণার কথা পড়িলাম। আগামী যুদ্ধে আমেরিকা যে উত্তরমেরুর পথে ইউরোপ হইতে দ্রুত আক্রান্ত হইবে সে বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ। উত্তরমেরুতেই রাশিয়া ও আমেরিকার সংযোগ-স্থল। কত শীতে কিরূপ যুদ্ধ চালান যায় ইহাই গবেষণার বিষয়। গবেষণার ফলে নাকি দেখা গিয়াছে যে শূন্য ডিগ্রী পর্যন্ত তাপে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালান যায়। শূন্যের নীচে যখন তাপ নামিতে থাকে তখন প্রতি ডিগ্রীতে মানুষের দুই শতাংশ করিয়া পটুতা হানি হয়। এই হারে তাপ শূন্যের ৫০ ডিগ্রী নীচে নামিলে মানুষ একদম অকর্মণ্য হইবার কথা। কিন্তু শূন্যের ৬০ ডিগ্রী নীচে পর্যন্তও মানুষ কোনমতে যুদ্ধ চালাইতে পারে। তাপ তারও নীচে নামিলে মানুষের পক্ষে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ানও অসম্ভব হয়। সে তাপে নিঃশ্বাস লইলে ফুস্‌ফুস্ জমিয়া যায়। কাজেই তখন যুদ্ধ অসম্ভব।

সেদিন আর, বি, কুড়ির (R. B. Curry) আপিসে যাই। ইনি পারিবারিক ভাতার (Family Allowance) ডিরেক্টর। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশে পারিবারিক ভাতা আইন পাস হয়। এই আইন অনুসারে এ দেশের প্রত্যেক শিশু ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিম্নলিখিত হারে বৃত্তি পায়।

বয়স	মাসিক হার
৬ বছরের কম	৫ ডলার
৬ হইতে ৯	৬ ডলার

বয়স	মাসিক হার
১০ হইতে ১২	৭ ডলার
১৩ হইতে ১৫	৮ ডলার

চতুর্থ সন্তানের পর ভাতার হার কমিয়া যায়। পঞ্চম সন্তানের হার প্রতি স্তরে এক ডলার কম। ষষ্ঠ ও সপ্তম সন্তানের হার দুই ডলার কম। অষ্টম সন্তান ও তৎপরবর্তী সন্তানের হার তিন ডলার কম।

প্রতি মাসে শিশুর মাতার নামে ভাতা পাঠান হয়। ১৬ বৎসরের অনধিক বয়সের শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩৪ লক্ষ। ভাতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক ব্যয় ২৫ কোটি ডলার। ধনী-নির্ধন-নির্বিশেষে সমস্ত মাতাই বাড়ী বসিয়া এই ভাতা পান। সমস্ত শিশুর জীবনারম্ভে সুযোগ-সমতা প্রতিষ্ঠাই এই ভাতার উদ্দেশ্য। বর্তমানে এ দেশের বৃদ্ধ লোকের অনুপাত বাড়িয়া যাইতেছে, মৃত্যুর হার কমিয়া যাইতেছে। ১৯৩১ হইতে ৪১ পর্যন্ত দশকে যখন বাণিজ্যিক মন্দা চলিতেছিল তখন জন্ম-হার ও আগন্তুক সংখ্যা উভয়ই কমিয়া গিয়াছিল। ৬০ বৎসর এবং তদধিক বয়স্ক লোকেব অনুপাত ১৯২১ সালে ছিল হাজারে ৭৫·১, ১৯৩১ সালে হাজাবে ৮৩·৯ এবং ১৯৪১ সালে হাজারে ১০২·১। অনেকে মনে করেন এই দীর্ঘায়ু দেশে বৃদ্ধদের ভরণ-পোষণের জন্য সরকার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিতে-ছেন না।

একদিন বঙ্গীয় বয়স্কাউট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরূপে

নিউ ইয়র্কের বয়স্কাউট কর্তৃপক্ষের পরিচয়-পত্র লইয়া ক্যানাডার বয়স্কাউট আপিসে উপস্থিত হইলাম। কমিশনার মেজর জেনারেল স্প্রাই এবং তদীয় সহকারী ডব্লু, এল্, কুরিয়ে আমাকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিলেন। স্প্রাই যুবক, তাঁহার দেহ যেমনি উন্নত তেমনি সুশ্রী। তিনি নানারূপ সদালাপে আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। তিনি ইটালীব রণক্ষেত্রে ভারতীয়দের সঙ্গে পাশাপাশি যুদ্ধ করিয়াছেন—সে কথা সোৎসাহে বলিলেন। কুরিয়ে প্রৌঢ় বয়স্ক। মানচিত্রের দিকে তাকাইয়া কলিকাতা হইতে অটোয়া কত দূর তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি বলিলাম, জ্যামিতিব ভাষায় কলিকাতা ও অটোয়ার দূবত্ব ১৮০ ডিগ্রী। এখন এখানে অপরাহ্ণ ৩টা; কলিকাতায় এখন রাত ৩টা। আমাকে আপ্যায়িত করিতে উভয়েই ব্যস্ত। কি করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। নিজেদের কাজকর্মের কথা বলিলেন। শেষে বলিলেন, "এক দিকে ইংলণ্ডের রক্ষণশীলতা অপব দিকে আমেরিকার বৃহৎ বাণিজ্যিক ধরণ। আমরা এক মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছি।" ইহাদের সমস্ত পুস্তক ও পত্রিকাদি কলিকাতার বয়স্কাউট আপিসে পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমিও কলিকাতা বয়স্কাউটেব পুস্তকাদি এখানে নিয়মমত পাঠাইবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম।

অটোয়ায় অবস্থানকালে একদিন কাগজে পড়িলাম আমে-

রিকার জর্জিয়া রাষ্ট্রে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গবর্ণরের মধ্যে রীতিমত দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত। আর্নল জর্জিয়ার গবর্ণব। সাধারণ নির্বাচনে তালমাজের নিকট তিনি পরাজিত হন। কর্তব্যভার গ্রহণের তারিখের পূর্বেই তালমাজ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন জর্জিয়ার আইন-পরিষদ তালমাজের পুত্রকে গবর্ণর নির্বাচিত করেন। একটি আইন-ঘটিত কূট তর্ক লইয়া তখন মহা অনর্থ উপস্থিত হয়। আর্নল এই নির্বাচনকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা কবেন। তালমাজ-পুত্র গবর্ণরের বাড়ী চড়াও করিয়া আর্নলকে তাড়াইযা দিবার চেষ্টা কবেন, কিন্তু ফিরিয়া যান। পবদিন আর্নলের অনুপস্থিতিতে তালমাজ-পুত্র বাড়ীটি দখল করিয়া লন। আর্নল ফিরিয়া আসিয়া দেখেন বাডী বে-দখল। তখন একটা বাহিরের ঘরেই টেবিল পাতিয়া বসিয়া ঘোষণা করিলেন যে তিনিই গবর্ণর—তালমাজ নন। উভয় পক্ষই চেঁচাইয়া বাজী মাৎ করিবার চেষ্টা করিলেন। তালমাজ দখল করিয়া বসিয়াছেন। কাজেই প্রথম যুদ্ধে তাঁহারই জয় হইল। কয়েকজন নাগরিক তালমাজ-স্বাক্ষরিত আইনের বিরুদ্ধে পৃথকভাবে মামলা রুজু করিলেন। আদালতগুলির পরস্পব বিবোধী রায় বাহির হইল। তখন সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের হইল। সুপ্রীম কোর্টের রায় বাহির হইবার পূবেই আমি ক্যানাডা ত্যাগ করি। এই সময় আমেরিকার আরও একটি ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিলবো নামক জনৈক সেনেটরের নামে নালিশ

হয় যে তিনি যুদ্ধকালে কণ্ট্রাক্ট বিতরণ করিয়া নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। সেনেটের একটি কমিটি এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া ঘটনা সত্য বলিয়া রিপোর্ট পেশ করিল। তখন বিলবো সেনেটে বসিবার অযোগ্য এই বলিয়া একটি প্রস্তাব আলোচনার্থ উপস্থিত হইল। বিলবো ডিমোক্রেটিক পার্টির লোক। তাঁহার পার্টি তাঁহাকে সমর্থন করিবে কিনা এই বিষয়ে কয়েক দিন আলোচনা চলিল। সেনেটে তখন বিতর্ক চলিতে লাগিল। অবশেষে বিলবো নিজেই পদত্যাগ করিয়া আলোচনা পরিসমাপ্ত করিলেন।

ক্যানাডার অডিটর জেনারেল ওয়াটসন সেলার অমায়িক ব্যক্তি। তিনি একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন, "যুদ্ধের সময় কয়েকটি কাজ ক্যানাডা ও আমেরিকা একত্র সম্পাদন করে। হিসাব আমরাও রাখিয়াছিলাম, আমেরিকারও রাখিবার কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমেরিকা আমাদের হিসাবই গ্রহণ করিল।" ভদ্রলোক কথাগুলি বলিয়া কিঞ্চিৎ গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, "হয়ত হিসাব ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে ব্রিটিশ বা ক্যানাডীয়ান ষ্টাণ্ডার্ড উচ্চতর। কিন্তু তথাপি আমেরিকা কর্মসাফল্যে যে সর্ববিষয়েই সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে তাহাতে কোন সংশয় নাই ; কিরূপে এরূপ হয় তাহাই ত চিন্তার বিষয়।"

ডাঃ ক্লার্ক ও ডাঃ ঈটনের সহায়তায় আমার কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। ইঁহাদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইতে

হয়। ডাঃ ঈটন এক দিন তাঁহার ভারত-প্রবাসী ভগিনীর কথা উত্থাপন করিলেন। বলিলেন, "আমার ভগিনী মাদ্রাজে একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। তামিল ভাষা বলিতে ও লিখিতে পারে। স্কুলের মেয়েদের প্রতি তাহার অসীম স্নেহ। সেবার দেশে আসিয়াছিল। মেয়েরা তাহাদের সুখদুঃখের কথা তাহাকে লিখিয়া জানাইত। মেয়েদেব চিঠি হাতে করিয়া তাহাকে বহুবার অশ্রুবিসর্জন করিতে দেখিয়াছি।"

থামিয়া বলিলেন, "বাইবেলে একটি লাইন আছে, 'পৃথিবীর সবত্র আমাব কথা প্রচার কর।' এই লাইনটির উপরই যত মিশনারী প্রচেষ্টার প্রতিষ্ঠা। এই লাইনটি পড়িয়াই আমার ভগিনী মিশনারী জীবন বরণ কবিয়া লইয়াছে।"

নিউ ইয়র্কে একটি মহিলা বলিয়াছিলেন তাঁহার ভগিনী মৈমনসিংহের গারো পাহাড়ে মিশনারী জীবন যাপন করেন। অটোয়ার পারিবারিক ভাতা ডিরেক্টরের এক আত্মীয়াও নাকি মিশনারী ব্রত গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আছেন।

২৩শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অটোয়া ত্যাগ করি। সকাল পৌনে নয়টায় হোটেল ত্যাগ করিলাম। বেডিও হইতে সংবাদ প্রচারিত হইল, এখন তাপ শূন্যের ১৫ ডিগ্রী নীচে। সর্বশুক্লা রাজধানীর মধ্য দিয়া মোটরে চলিয়াছি। শহর ত্যাগ করিয়া প্রান্তরে পড়িলাম। দু'ধারে স্তূপাকার বরফ, পরিষ্কার আকাশ, তাপহীন উজ্জ্বল সূর্যালোক তাহার উপর প্রতিফলিত হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে।

সূর্যালোক চন্দ্রালোক অপেক্ষাও মৃদু ও শীতল, কিন্তু অত্যন্ত পবিষ্কার। চন্দ্রালোকে একটি রহস্য সৃষ্টি করে; রহস্যময়ী প্রকৃতিকে আরও রহস্যময়ী করিয়া তোলে। কিন্তু এ যেন মনে হইতেছে শুভ্রা প্রকৃতির অন্তস্তল পর্যন্ত পরিষ্কার দেখিতেছি। সন্ধ্যা নয়টায় বিমান-ঘাটিতে পৌঁছিলাম, বিমান তক্ষুনি উড়িল। ১০টায় মন্ট্রিয়ল বিমান-ঘাটিতে পৌঁছিলাম। হোটেলে পৌঁছিতে ১১টা বাজিল। হোটেলের নাম কুইন্‌স্‌ হোটেল। অটোয়া হইতে মন্ট্রিয়ল বিমান পথে ৯৪ মাইল। মন্ট্রিয়লে তখন তাপ শূন্যের পাঁচ ডিগ্রী নীচে।

মন্ট্রিয়ল সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরে অবস্থিত ক্যানাডার বৃহত্তম শহর, বন্দর ও পোতাশ্রয়। জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগর হইতে সেণ্ট লরেন্স নদী দিয়া এখানে আসে। নদী শীতকালে জমিয়া যায়। তখন ৪ মাস জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকে।

মন্ট্রিয়ল একটি দ্বীপ। লম্বায় ২৭ মাইল; পাশে ১২ মাইল। জনসংখ্যা বর্তমানে শহরে ১১ লক্ষ, বৃহত্তর মন্ট্রিয়লে ১৫ লক্ষ। শহরটি কিবেফ প্রদেশে অবস্থিত। কিবেক প্রদেশের প্রায় সমস্ত লোকই ফরাসী ভাষাভাষী। তবে মন্ট্রিয়লে ফরাসী না জানিয়া ইংরেজী জানিলে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। হোটেল, আপিস, দোকান, বাস প্রভৃতিতে সকলেই মোটামুটি ইংরেজী বলিতে পারে। শহরের জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ ফরাসী ভাষাভাষী, ৭৫ শতাংশ রোমান ক্যাথলিক এবং এক লক্ষ ইহুদি।

শহরটি সুন্দর। ফরাসী ইঞ্জিনীয়ারগণের শহরগঠন-নৈপুণ্য ও সুরুচি সর্বত্র পরিস্ফুট। মন্ট্রিয়ল পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম ফরাসী শহর বলিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণ গৌরব অনুভব করেন। রবিবার বাসে করিয়া শহর ঘুরিয়া আসিলাম। নবাগতগণকে শহর দেখাইবার জন্য এই বন্দোবস্ত। চালক যাত্রিগণকে সব দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিতেছে। শহরের মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়ের উপরে সুন্দর সুন্দর বাড়ী। একটি পাহাড়ের উপর হইতে সেণ্ট লরেন্স নদী ও শহরের হিমাবৃত দৃশ্য সুন্দব দেখাইতেছিল। এখানে লোকের ধর্মপ্রবণতা সহজেই চোখে পড়ে। অনেক গীর্জা। অনেক পাদ্রী। পাদ্রীদের শিক্ষাব জন্য প্রকাণ্ড একটি কলেজ আছে। একটি গীর্জার নাম 'নোত্‌রদাম'—প্যারিসের 'নোত্‌রদাম' গীর্জার অনুকরণে তৈরী। ভিতরে গিয়া কিছুক্ষণ বসিলাম। তখন একটি স্তবগান হইতেছিল। শুনিয়া পবিত্র বোধ করিলাম। গীর্জাটি নদীর তীরে। অদূরে যেখান হইতে জাহাজ ছাড়ে সেখানে খুব উঁচুতে মাতা মেরীর একটি মূর্তি আছে। মাতা মেরী হাত বাড়াইয়া সমুদ্র-গমনোন্মুখ নাবিকগণকে আশীর্বাদ করিতেছেন। ধার্মিকপ্রবর ভাই আন্দ্রের স্মৃতি শহরের সর্বত্র বিরাজমান। ইনি 'মন্ট্রিয়লের অলৌকিক পুরুষ' নামে পরিচিত।

নানা দিগ্‌দেশাগত আর্ত-নরনারীর রোগ ও শোক নিবারণে হনি সিদ্ধবাক্ ছিলেন। ইনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। অল্প

বয়সে মাতৃপিতৃহীন হইয়া মুচি, মিস্ত্রী, কৃষক প্রভৃতি নানা কাজে জীবনের ২৩ বৎসর যাপন করিয়া মন্ট্রিয়ল শহরে মাউণ্ট রয়্যাল পাহাড়ের নীচে 'নোত্‌রদাম' কলেজের দারোয়ান নিযুক্ত হন। এইখানে তাঁহার ধর্মজীবন আরম্ভ হয়। তিনি প্রেরণা অনুভব করেন যে তাঁহাকে এই পাহাড়ের উপর সেণ্ট জোসেফের একটি মন্দির নির্মাণ কবিতে হইবে। আজ উচ্চ গম্বুজযুক্ত প্রকাণ্ড ও সুদৃশ্য মন্দিব পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া উন্নত মস্তকে সেণ্ট জোসেফের ভক্ত ভাই আন্দ্রের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ৯২ বৎসর বয়সে ভাই আন্দ্রে দেহত্যাগ করেন।

মন্ট্রিয়লের মোমের পুতুলের মিউজিয়ম একটি বিশেষ দর্শনীয় বস্তু। যীশুর জীবনকাহিনী এবং খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রথমাবস্থার কাহিনী লইয়া নানা ঐতিহাসিক দৃশ্যাবলী মোমের পুতুল দিয়া তৈরি করিয়া সাজান রহিয়াছে। দৃশ্যগুলি জীবন্ত। ভাই আন্দ্রের একটি প্রতিমূর্তি এখানে আছে। বহু মন্ট্রিয়লবাসী তাঁহাদের প্রিয় আন্দ্রের জীবন্ত বিগ্রহ বলিয়া এই মূর্তিটিকে ভুল করিয়াছেন। রোমের পোপ, রাজা ষষ্ঠ জর্জ, সেনাপতি আইসেনহাওয়ার এবং মণ্টগোমারীর মূর্তি এখানে তৈরি করিয়া রাখা হইয়াছে। যীশু তাঁহার পিতার সহিত মিস্ত্রীর কাজ করিতেছেন; রোমান সার্কাসে খ্রীষ্টানগণকে হিংস্র জন্তুর সম্মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে; রোমান ক্যাটাকুম্বে অত্যাচার পীড়িত নবদীক্ষিত খ্রীষ্টানগণ তাহাদের প্রোজ্জ্বল

ধর্মবিশ্বাস লইয়া পরস্পর মিলিত হইতেছেন—এই সমস্ত জীবন্ত দৃশ্যাবলী যেমন চমকপ্রদ তেমনই সম্ভ্রম ও ভক্তির উদ্রেককর। নবাগত শ্বেতকায়গণের সহিত এদেশের আদিম অধিবাসিগণের প্রথম সঙ্ঘর্ষের কয়েকটি দৃশ্যও রহিয়াছে।

ক্বিবেক প্রদেশের রাজধানী ক্বিবেক শহর। ক্বিবেক শহর এখান হইতে পূর্বদিকে, সেণ্ট লরেন্স নদীর পারেই অবস্থিত। ইহাই ছিল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীদের প্রধান আড্ডা। পলাশী যুদ্ধের তুই বৎসর পরে ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি উল্‌ফ ফরাসীগণকে পরাজিত করিয়া ক্বিবেক দখল করেন। এই যুদ্ধে উল্‌ফ নিহত হন। কিন্তু ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই যুদ্ধের ফলেই ক্যানাডা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিজয়ী ইংরেজ ফরাসীদিগের আইন, আচার, ব্যবহার ও ধর্মগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিল না। ফলে ফরাসীগণ ক্রমশঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুগত হইল। তবে ইংরেজী ভাষাভাষী ও ফরাসী ভাষাভাষীগণের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রহিয়া গেল। আমেরিকার পণ্যসম্ভার বহন করিবার জন্য এক সময়ে হডসন ও সেণ্ট লরেন্স নদীর মধ্যে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হডসনেরই জয় হইল। নিউ ইয়র্ক উঠিয়া গেল। মন্ট্রিয়ল অনেক নীচে পড়িয়া রহিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ-ফরাসীর অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা রাজনৈতিক মীমাংসা হইল। সেই বৎসর ক্যানাডা 'ডোমিনিয়ন'

বলিয়া স্বীকৃত হইল। ইহাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের' সূত্রপাত। কতক দ্রুতবর্ধমান আমেরিকার ভয়ে, কতক ইংলণ্ডের নীতি পরিবর্তনের ফলে এবং কতক ক্যানাডার অর্থনৈতিক ঐক্যের তাগিদে এই ইংরেজ-ফরাসীর রাজনৈতিক মিলন ও 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস' সম্ভব হইয়াছিল। ক্রমশঃ ক্যানাডিয়ানগণ উভয় সমুদ্র পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়া নূতন নূতন প্রদেশ গঠন করিয়াছে। আটলান্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত রেল-লাইন প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐক্য ও উন্নতির পথ সুগম করিয়াছে। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়া ইহাদের শক্তি ও একতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফরাসীগণ আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতায় পিছাইয়া পড়িয়াছে এবং কিবেক প্রদেশেই সীমাবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে।

মন্ট্রিয়লের বিক্রয়-কর আপিসের অধ্যক্ষ মসিয়েঁ জে, আর, বুর্জোয়ার সাহায্যে আমার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইল। এক দিন কিবেক নগরী হইতে মসিয়েঁ শ্যাঙ্ক আমার তত্ত্বাবধান করিতে আসিলেন। ইহাদের আইন ও নিয়মাবলী ইংরেজী ও ফরাসী উভয় ভাষায়ই ছাপা হইতেছে। একই বইয়ের এক দিক দিয়া ইংরেজী, অপর দিক দিয়া ফরাসী। দরকার মত ঘুরাইয়া নিলেই হইল। আপিসের কর্মচারিবৃন্দ এখানে প্রায় সকলেই ফরাসী ভাষাভাষী।

আমার হোটেল ছিল শহরের কেন্দ্রস্থলে। সেণ্ট লরেন্স নদী অদূরে। ক্যানাডিয়ান ন্যাশন্যাল রেলের নূতন কেন্দ্রীয়

ষ্টেশনও নিকটে। এ শহরের ট্রামগুলি সুদৃশ্য। ছোট ছোট পাহাড়সমাকীর্ণ শহরের মধ্যে ট্রামে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বেশ লাগিত। শীত অটোয়া হইতে কিঞ্চিৎ কম। মাঝে মাঝে তাপ ২৫ কি ৩০ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে আবার শূন্যের নীচে নামিয়া যায়। ফলে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। তখন পথ চলা বিপৎ-সঙ্কুল হয়। হোটেলের লাউঞ্জে অনেক সময় বসিয়া থাকিতাম। লোক আসিয়া টুপি, কানঢাকনী, কোট, জুতাঢাকনী প্রভৃতি খুলিয়া, বরফ ঝাড়িয়া যথাস্থানে রাখিয়া খাইতে বসিতেছে। খাবার পর গল্পাদি করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ঘরের বাহিরে ও ভিতরে যেন পৃথক রাজ্য। বাহিরে মানুষের বর্মের মত পোষাক, জড়সড় আকৃতি। ঘরের ভিতরে আসিয়া তাহাদেরই চিক্কণ সজ্জা, তরল-লাস্য এবং হাস্য-প্রস্ফুটিত মুখপদ্ম। কথাবার্তা বেশীর ভাগই ফরাসী ভাষায়। কোন কোন রমণী তাহার বালক পুত্র কিরূপ ইংরেজী জানে তাহা সগৌরবে বলিতেছেন।

এই সময় আবহাওয়া অনিশ্চিত বলিয়া বিমানে যাতায়াতও কিঞ্চিৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। এই অনিশ্চয়তার ফল আমি দুইবার ভুগিয়াছি। একবার শিকাগো যাইবার সময়। দ্বিতীয় বার সেণ্ট পল হইতে নিউ ইয়র্ক যাইবার সময়। আমাকে ৭ই ফেব্রুয়ারী ভ্যানকুবারে অষ্ট্রেলিয়াগামী বিমানে উঠিতে হইবে। কাজেই আমাকে যথাসম্ভব অনিশ্চয়তা পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। রেল হইতে বিশ্ববিখ্যাত ‘ক্যানাডিয়ান রকি’ দেখিবার লোভও দুনিবার। এই উভয় কারণে মন্ট্রিয়ল

হইতে ভ্যানকুবার রেলেই যাইব মনঃস্থ করিলাম। ১লা ফেব্রুয়ারী শনিবার রাত্রি ৮॥টায় ওয়েবষ্টার ও আমি ক্যানা-ডিয়ান রেলওয়ের ভ্যানকুবারগামী ট্রেনে মন্ট্রিয়ল ত্যাগ করিলাম।

মন্ট্রিয়ল হইতে ভ্যানকুবার রেলপথে ২৯৩০ মাইল। যাইতে ৮৮ ঘণ্টা সময় লাগে। ১লা ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৮॥টায় মন্ট্রিয়ল ছাড়িয়া ৫ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৯॥টায় ভ্যানকুবার পৌছিবার কথা। পথে তিন বার ঘড়ির কাঁটা ১ ঘণ্টা করিয়া পিছাইয়া দিতে হয়। এইরূপে তিন ঘণ্টা সময় লাভ হয়। সেইজন্য স্থানীয় সময়ের হিসাবে যদিও এই সময়ের মাপ ৮৫ ঘণ্টা, বস্তুতঃ ইহা ৮৮ ঘণ্টা। পথে দুর্যোগ বশতঃ সেদিন গাড়ী ১১ ঘণ্টা বিলম্বে পৌছাইল। আমি ৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৮টা ৫ মিনিটে ভ্যানকুবার পৌঁছিলাম।

গাড়ীর মধ্যে বন্দোবস্ত বেশ ভাল। আমি যে কামরাটিতে ছিলাম, সেটার উপরে নীচে ২৪টি বার্থ। দিনে বার্থগুলি গুটাইয়া সোফায় পরিণত করা হয়। ক্লাব গাড়ী ও খাবার গাড়ী সুসজ্জিত। খাদ্য ভাল। এই দীর্ঘ রেলপথ তৈরি ক্যানাডার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। এই রেলপথই ক্যানাডাকে ঐক্য এবং উন্নতি দিয়াছে। এখনও বোধ হয় এই পথ লোকসানে চলে। গ্রীষ্মকালে মধ্য ক্যানাডায় বনে ও শতসহস্র হ্রদে ভ্রমণ, শিকার ও প্রমোদার্থ বহু জনসমাগম হয়। আলবার্টার জ্যাস্‌পারে ভ্রমণকারীদের স্বচ্ছন্দ বিহারের

জন্য এক বিরাট পার্ক আছে। 'ক্যানাডিয়ান রকি'র বহু-বিশ্রুত সৌন্দর্য দেখিতেও বিস্তর লোকসমাগম হয়। এই সমস্ত ভ্রমণকারীর জন্য রেল কোম্পানী সর্ববিধ সুবিধা দেন।

২রা ফেব্রুয়ারী রবিবার কেপ্রিয়ল ষ্টেশনের কাছাকাছি প্রভাত হইল। দিনমান অণ্টেরিও প্রদেশের মধ্য দিযাই চলিলাম। এই অঞ্চলের কাছাকাছি অনেক কাগজের কল। অণ্টেরিয়োর উত্তর সীমানায় সোনা, নিকেল ও তামাব খনি আছে। গাড়ী দ্রুতবেগে চলিয়াছে। পাহাড় আর বন আর তার মধ্যে শত শত হ্রদ। গাছের মধ্যে স্প্রুস্, পাইন, পপলার ও বার্চই প্রধান। স্প্রুস ও পাইনের পাতা পড়ে নাই। ইহারা চিরসবুজ। হিমস্তবকে সজ্জিত। যেন স্বাভাবিক খ্রীষ্টমাস তরুশ্রেণী। অন্যান্য বৃক্ষ নিঃস্ব, নগ্ন। হ্রদগুলি বরফে ঢাকা। মাঝে মাঝে বরফের ফাঁকে ফাঁকে স্বচ্ছ জল দেখা যাইতেছে। ষ্টেশনগুলিতে লোকজন নাই। দেশ জনশূন্য। মাঝে মাঝে বনবিভাগের আপিস। কোন পশু-পক্ষীও দৃষ্টিগোচর হয় না। সব বরফে ঢাকা।

৩রা সোমবার সকালে উইনিপেগের নিকটবর্তী হইতেছি। উইনিপেগে পৌঁছিলাম বেলা পৌনে বারটায়। রৌদ্র উঠে নাই। বরফ পড়িতেছে। ঝড়ে বরফ উড়িয়া যাইতেছে। এই ষ্টেশনে ক্রু বদল হইবে। অনেক যাত্রী এই ষ্টেশনে নামিয়া গেল। আমরা মাত্র ৫ জন যাত্রী এক কামরায় রহিলাম। নূতন কণ্ডাক্টর আসিয়া বলিলেন, বাহিরে আব-

হাওয়া খুব খারাপ। অনির্দিষ্টকালের জন্য গাড়ী এখানে থাকিবে। বাহিরে তাপ শূন্যের ২৮ ডিগ্রী নীচে। প্লাটফর্মে নামিয়া দেখি বাহিরে দাঁড়ান অসম্ভব। বেশ জোর ব্লিজার্ড চলিতেছে। ইঞ্জিনের উপর বরফ পড়িয়া গলিয়া আবার জমিয়া যাইতেছে। এইরূপে ইঞ্জিন শুভ্র জটাজুটমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলাম। ৭ তারিখে আমার ভ্যানকুবার ত্যাগ করিবার কথা। ৬ তারিখে বিমান আপিসে আমার বুকিং পাকা করিতে হইবে। কাজেই গাড়ীর ভ্যানকুবার পৌঁছাইতে ২৪ ঘণ্টার বেশী দেরী হইলে আমার বিমান ধরাই হইবে না। পরবর্তী বিমান ১৫ দিন পরে ছাড়িবে। তাহাতেও স্থান জুটিবে কিনা সন্দেহ। আবহাওয়ার হাত এড়াইবার জন্য বিমানে না আসিয়া রেলে আসিলাম। রেলেও আবহাওয়ার হাতে রক্ষা নাই। পূর্ব দিন নাকি ইয়কন টেরিটরীর একটি বিমান-ঘাটিতে তাপ শূন্যের ৮৩ ডিগ্রী নীচে নামিয়াছিল। একটি যুবক সাংবাদিক আমাদের কামরায় আসিয়া উঠিলেন। আবহাওয়ার নানাবিধ খবর দিলেন। আমাকে দেখিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খুব ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। আমি বিলাতে বা আমেরিকায় শিক্ষিত নই, অথচ বিশুদ্ধ ইংরেজী বলিতেছি দেখিয়া প্রশংসমান কণ্ঠে বলিলেন, "আমাদের ইংরেজী শিখিতে কলিকাতা যাওয়া উচিত।" তিনি আশ্বাস দিলেন যে গাড়ীর কিছুতেই ২৪ ঘণ্টার বেশী বিলম্ব হইবে না!

বৈকাল ৬টা ১৫ মিনিটে গাড়ী ছাড়িল। টরেণ্টো হইতে একটি গাড়ী ভ্যানকুবার যাইতেছিল। আর একটি প্যাসেঞ্জার গাড়ীরও উইনিপেগ হইতে এডমণ্টন যাইবার কথা। তিনটি গাড়ী একত্র জুড়িয়া দিল। হিমাবৃত পথে সন্তর্পণে গাড়ী চলিতে লাগিল।

দুই দিকে সমতল দেশ। দিগন্ত বিস্তৃত ও বরফাচ্ছন্ন শূন্য প্রান্তর। কদাচিৎ দুই-চারিটা গাছ দেখা যায়। মাঝে মাঝে বালিয়াড়ির মত বরফ স্তূপ। আকাশ পরিষ্কার হইয়া জ্যোৎস্না উঠিল। জ্যোৎস্নালোকে হিমাবৃত প্রান্তর বেশ দেখাইতেছিল। রাত্রি ১০টায় ঘুমাইলাম।

পরদিন ৪ঠা মঙ্গলবার। সুন্দর রোদ উঠিল। সর্ব্বশুক্লা প্রকৃতি রৌদ্রে চকচক করিতেছে; শুধু জনশূন্য প্রান্তর। দুই-একটা ঘোড়া কোথাও দেখা যায়। দূরে দূরে দুই-একটা ছোট বস্তি চোখে পড়ে। গমের দেশ অতিক্রম করিতেছি, এখানে গমের ঋতু খুব ছোট, অক্টোবর হইতে মার্চ পর্যন্ত জমি বরফে ঢাকা থাকে, বাকী কয়েক মাসের মধ্যে সব কাজ শেষ করিতে হইবে। শীতে চাষার কোন কাজ নাই, শুধু গরু বাছুর রক্ষা করে ও প্রচুর মাখন তৈরি করে। যুদ্ধের সময় ইহারা ইংরেজকে বহু মাখন ও চীজ দিয়াছে, এখনও দিতেছে। বেলা ১০টার পর সাস্‌কাটুন ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। নদীর পারে শহর। নদী জমিয়া গিয়াছে। রাত্রে এডমনটন শহর অতিক্রম করিবার পর ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাতে ‘রকি’ অঞ্চলে চলিয়া আসিয়াছি।

৫ই বুধবার প্রত্যূষে জাগ্রত হইয়া এক অদ্ভূত দৃশ্য দেখিলাম, দুই পাশে উঁচু পাহাড়, মাঝে গাড়ীর পথ। সব বরফে ঢাকা; চিরসবুজ বৃক্ষমালা শ্রেণীবদ্ধভাবে হিমস্তবক হস্তে দণ্ডায়মান। বল্কল-সর্বস্ব বৃক্ষগুলি করজোড়ে ঊর্ধ্বনেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদের সংখ্যা অল্প। একটি ছোট গিরিনদী বরফ ঠেলিয়া ছুটিতেছে। সূর্য সর্বোচ্চ পাহাড়গুলির মাথায় স্বর্ণ কিরণ ঢালিতেছে। উপরে সুন্দর নীলাকাশ; তাহাতে দেববালাগণ দুই-একখানা সাদা মেঘের ভেলা ভাসাইয়াছেন। চারিদিকে এক অদ্ভূত রহস্য ও শোভা। তাহার মধ্য দিয়া গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। ক্রমে সব সূর্যালোকে প্লাবিত হইল। এত আলো, তবু রহস্য যায় না। মন সমস্ত পারিপার্শ্বিকেব সঙ্গে অদ্ভুত অন্তরঙ্গতা ও একাত্মতা বোধ করিতেছে। ক্লিয়ার ওয়াটার ষ্টেশন হইতে একটি নদী আমার সঙ্গী হইল। নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া পাহাড়ের ভিতর দিয়া পথ করিয়া চলিয়াছে। হিমাবৃত নদীর ফাঁকে ফাঁকে স্বচ্ছ সলিল—তরুণীর প্রসন্ন নয়নের মত দেখাচ্ছে। কোথাও প্রশস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে মন উদারতা ও প্রসন্নতা লাভ করিতেছে। আবার কোথাও নিবিড় বনাবৃত সঙ্কীর্ণ গিরিপথের মধ্যে মন যেন প্রকৃতির বক্ষস্পন্দন অনুভব করিতেছে। কোথাও তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মত পাহাড়-সন্নিবেশ। কোথাও পাহাড় সোজা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। পিছনে কিছুই দেখা যায় না। কোথাও পাহাড়-গাত্র খুব ঢালু হইয়া ক্রমশঃ যেন আকাশের সঙ্গে

মিশিয়া গিয়াছে। কোন কোন পাহাড়ের গায়ে কোন গাছ না থাকায় বরফে রূপার পাহাড়ের মত দেখাইতেছে। এইরূপে রজতগিরিপরিবেষ্টিত প্রকৃতির লীলাকুঞ্জের মধ্য দিয়া লীলাময়ীর কবোষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিতে করিতে চলিয়াছি।

কাম্‌লুপ্‌স্‌ ষ্টেশন হইতে পাহাড় নীচু হইতে সুরু হইল। তখন বেলা ১১টা। বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার, তাপ শূন্যের উপরে ১০ ডিগ্রী হইবে মনে হইতেছে। দুই দিকে উঁচু পাহাড়, বৃক্ষশূন্য, অতএব হিমাবৃত ও রজতশুভ্র। মাঝখান দিয়া নদী ছুটিয়াছে, আমরাও ছুটিয়াছি। নদী কখনও বামে, কখনও ডাইনে যাইতেছে। নদী এখন প্রশস্ত ও হিমমুক্ত। মহাসাগর নিকটে, তাই নদী কৃশতা ত্যাগ করিয়া হিমবাধা ঠেলিয়া দ্রুত পদ-সঞ্চারে ছুটিতেছে। আমরাও নষ্ট সময় পুনরুদ্ধার মানসে অভিসারিণীর অনুগামী হইয়াছি। প্রায় পৌনে তিনটায় ভ্যানকুবার হইতে ১৪৭ মাইল দূরবর্তী ফল্‌স্‌ ক্রীক ষ্টেশনের নিকট শোভা নবতর রূপ পরিগ্রহ করিল। ডাইনে দূরে একটি আকাশচুম্বী পর্বতশিখরের হিমশীর্ষ অস্তগামী সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করিয়া ক্ষণতরে গ্রীষ্মকালীন কাঞ্চনজঙ্ঘার আভাস দিতেছিল। দুই ধারে উচ্চ রজতশুভ্র গিরিশ্রেণী। নদীকে তখন আমরা অন্ততঃ নয় বার অতিক্রম করিয়াছি এবং নদী আমাদের ডাহিনে। রেল আঁকিয়া-বাঁকিয়া সাগর-গামিনী নদীর অনুগামী হইয়াছে। রজতশুভ্র গিরিগাত্রে চির-সবুজ বৃক্ষশ্রেণী রৌপ্যভূষণে মরকতমণিমালার মত দেখাইতেছিল।

দিনমান সৌন্দর্যপানবিভোর চক্ষুদ্বয়ের উপর ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। বাহিরের অপরিমেয় সৌন্দর্যরাশি সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে অন্তরে মুদ্রিত হইয়া গেল। প্রায় পৌনে ছয়টায় সন্ধ্যা হইল। তখন নদী প্রশস্ত এবং মন্দগতি হইয়াছে। নদীর পার দুইটিও ক্রমশঃ প্রশস্ত হইতেছে। পাহাড় নদী হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। রাত্রি ৮টা ৫ মিনিটে প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী ভ্যানকুবার ষ্টেশনে নামিলাম।

পথে মন্ট্রিয়ল হইতে ২৪১৭ মাইল দূরবর্তী লুসার্ণ ষ্টেশন সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতম। ইহার উচ্চতা ৩৬৫০ ফুট। জ্যাস্-পারের উচ্চতা ৩৪৭০ ফুট। জ্যাস্পারের উত্তরে মাউণ্ট রবসনই 'রকির' উচ্চতম শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ১২৯৭২ ফুট। ডাইনোসার ও অন্যান্য জীবজন্তুর যে প্রস্তরীভূত কঙ্কাল অটোয়ার মিউজিয়মে দেখিয়াছি তাহা এই 'রকি' পর্বতমালার মধ্যেই প্রাপ্ত।

দক্ষিণে ফ্রেজার নদী ও উত্তরে বুরার্ড ইন্‌লেটের মধ্যে ভ্যানকুবার শহরের বড ও প্রধান অংশ অবস্থিত। বুবার্ড ইন্‌লেটের উত্তরে উত্তর-ভ্যানকুবার এবং তাহার পশ্চিমাংশের নাম পশ্চিম-ভ্যানকুবার। শহরের পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। বুরার্ড ইন্‌লেট মহাসাগরের একটি বড় খাড়ি। বুবার্ড ইন্‌লেটের দক্ষিণ তীবে পোতাশ্রয়। ইন্‌লেটের মুখে একটি স্থলাংশ দক্ষিণ-ভ্যানকুবারের উপর অনেকটা বাংলা ৫-এর মত খাড়া হইয়া প্রায় উত্তর-ভ্যানকুবারের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। অন্তর-টুকু অপ্রশস্ত ; তাহার উপর সেতুদ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ-ভ্যান-

কুবার সংযুক্ত হইয়াছে। এই সেতুটি সু-উচ্চ। নাম লায়ন্‌স্ গেট সেতু। সমস্ত জাহাজ এই সেতুর নীচে দিয়া ইন্‌লেটে প্রবেশ করিয়া পোতাশ্রয়ে যায়। এই বাংলার ৫-আকৃতি অংশে সেতু পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট ষ্ট্যানলী পার্ক। দক্ষিণ-ভ্যানকুবার ক্রমশীর্ণায়মান হইয়া পশ্চিমে মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই ত্রিভুজাকৃতি অংশের সমুদ্রতীরবর্তী শীর্ষ-বিন্দুর নাম গ্রে পয়েণ্ট। এই স্থানে ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। বাংলার ৫-আকৃতি অংশের দক্ষিণ-ভ্যানকুবারস্থ ভূমির কাছে একটি ছোট খাড়ির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার নাম ফল্‌স্ ক্রীক। ইহার উপর একাধিক সেতু আছে। আমি যে হোটেলে উঠিলাম উহার নাম হোটেল ভ্যানকুবার। হোটেলটি রেলওয়ে-পরিচালিত। খুব বড় হোটেল। ক্যানাডার মধ্যে এই হোটেলটিই নাকি সবচেয়ে ভাল। এখানে ভাল কাঁকড়ার সালাদ খাইয়াছিলাম।

ষ্টেশন হইতে হোটেলে আসিবার পথে বরফশূন্য পথ দেখিয়া বিশেষ স্বস্তি বোধ করিলাম। বহু দিন এরূপ হিমমুক্ত প্রশস্ত পথ দেখি নাই। শীতও এখানে অনেক কম। মানুষকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলে না।

৬ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমেই মাল লইয়া অষ্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজের আপিসে উপস্থিত হইলাম। মাল ওজন করাইয়া জমা দিলাম। টিকিট কিনিয়া বুকিং পাকা করিয়া ব্যাঙ্কে গিয়া কিছু অষ্ট্রেলিয়ার টাকা কিনিলাম।

ইন্‌লেটের তীরবর্তী নগরাংশে খানিকটা ঘুরিলাম। ইহাই শহরের বাণিজ্যপ্রধান অংশ। হোটেল ভ্যানকুবার এই অংশেই অবস্থিত।

বৈকালে ট্যাক্সিযোগে দ্রুত শহরটি দেখিয়া লইবার মানসে বাহির হইয়া পড়িলাম। পোতাশ্রয়ের ধার দিয়া চলিয়াছি। বামে লষ্টলেগুন ও ডাইনে বাইচক্লাব রাখিয়া ষ্ট্যান্‌লী পার্কে উপনীত হইলাম। পার্কটি বিরাট, তরুরাজিসন্নিবেশে সুশোভন। বহু দিন এত পাতাযুক্ত গাছ দেখি নাই। এখানে একটি খুব বড় গাছ শুধু বাকলের উপর দাঁড়াইয়া আছে। গাছটির পরিধি ৬৫ ফুট। পুরীধামের সিদ্ধবকুলের কথা মনে পড়িল। তবে এ গাছটি কিছুদিন হইল মরিয়া গিয়াছে। পার্কের প্রান্তে লায়ন্স গেট সেতুর গোড়ায় উপনীত হইলাম। সেতুটি সু-উচ্চ ও সুদৃশ্য। তাহারই পার্শ্বে প্রস্‌পেক্ট পয়েন্ট। ওপারে পর্বত-সঙ্কুল পশ্চিম-ভ্যানকুবার। বামে ইনলেটের মধ্য দিয়া দিগন্ত-প্রসারী প্রশান্ত মহাসাগর দেখা যাইতেছে। দৃশ্যটি রমণীয়। তার পর সাগরপার দিয়া ৫-আকৃতি অংশ প্রদক্ষিণ করিয়া ফল্‌স্ ক্রীক পার হইয়া মেরিন ড্রাইভ ধরিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়া গ্রে পয়েণ্টে উপনীত হইলাম। সম্মুখে অকূল প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তরে পশ্চিম-ভ্যানকুবারের হিমকিরীটিনী গিরিশ্রেণী অস্তগামী সূর্যকিরণে চকচক করিতেছে। সীমা এখানে বাঁধন ছাড়াইয়া অসীমে মিশিয়াছে। দেহবদ্ধ মন এখানে অনন্তের আভাসে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। দিগন্ত

মেঘাচ্ছন্ন। সূর্যাস্ত দেখিবার আশা নাই। হোটেলে ফিরিলাম। পাহাড় ও সমুদ্রে ঘিরিয়া শহরটিকে পরম রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

এ শহরে কয়েক জন ভারতীয় (পাঞ্জাবী) স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। কাগজে দেখিলাম ভারত-সরকার ক্যানাডিয়ান সরকারের নিকট ইহাদিগকে পূর্ণ ক্যানাডিয়ান সিটিজেন রূপে মানিয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছেন। খবরের কাগজগুলি অনুরোধটিকে মোটামুটি সমর্থন করিয়াছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে বিমান কোম্পানীর গাড়ী যাত্রীদের লইতে হোটেলে আসিল। ওয়েবষ্টারের সঙ্গে অনেক দিন ঘুরিয়াছি, আজ বিদায়ের পালা। ওয়েবষ্টার বলিল, "আপনি কাল প্রশান্ত মহাসাগরের উপর উড়িবেন আর আমি আবার সেই পুরাতন ট্রেনে পুরাতন ওয়াশিংটনে ফিরিব।" আমি বিদায় লইয়া বলিলাম, "ওয়েবষ্টার, এতদিন তোমার কাছে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। পথে তোমার অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিব।" সোয়া আটটায় হোটেল ত্যাগ করিয়া ৮টা ৪০ মিনিটে বিমান-ঘাটিতে পৌছিলাম। ১০টা ১৫ মিনিটে বিমান উড়িল।

দশম অধ্যায়

প্রশান্ত মহাসাগর

৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বেলা ১০টা ১৫ মিনিটে অষ্ট্রেলিয়ান ন্যাশন্যাল এয়ারওয়েজের বিমানযোগে প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী মনোরম ভ্যানকুবার নগরী ত্যাগ করিলাম। বিমানটি ডি, সি, ৪—স্কাই মাষ্টার শ্রেণীর। নাম "আমানা"। আমরা ২৫ জন যাত্রী। প্লেন যখন উড়িল তখন কিঞ্চিৎ কুয়াশা আছে। সূর্য কিরণ কতকটা আচ্ছন্ন। আকাশে উঠিয়াই ডাইনে মহাসমুদ্রেব একটি অপ্রশস্ত খাড়ি। তাহার পরপারে হিমকিরিটিনী গিরিশ্রেণী সূর্যকিরণে স্বর্ণাভ। বেলা ১১টা পর্যন্ত গিরিশ্রেণী পাশে পাশে বহিল, পরে পেছনে পড়িল। দূর হইতে গিরিশ্রেণীর শোভা অপরূপ। মুখ বাঁকাইয়া জানালা দিয়া তাহার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ বাখিয়া চলিয়াছি। দূর হইতে স্বর্ণাভ হিমকিরীটিনী গিরিশ্রেণী দেখিয়া মনে হইতেছে যেন তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভা দিগঙ্গনাগণের মেলা বসিয়াছে। তাঁহারা যেন আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছেন। কিন্তু আমার ফিরিবার সাধ্য নাই। ক্রমশঃ সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। তখন সম্মুখে শুধু মসীবর্ণ পর্বত সমাবেশ। মাঝে মাঝে সাদা মেঘের ক্ষেত। এক একটি পাহাড়ের মাথায় সামান্য বরফ। দেখিয়া মনে হইতেছে যেন হংসমালা বিশ্রাম করিতেছে।

একটি নদী কাল পাহাড়ের মধ্য দিয়া তরতর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। প্রায় ১টার সময় আবার ঘনসন্নিবিষ্ট উচ্চ পর্বত-সমূহ দেখা গেল। তাহাদের হিমশীর্ষ সূর্যালোকে উজ্জ্বল। পাহাড়গুলির সন্নিবেশ চক্রাকার। মনে হইল যেন নীলাকাশের চন্দ্রাতপের তলে রাজচক্রবর্তিগণের সভা বসিয়াছে। তাহাদের মণিমাণিক্যখচিত মুকুট ও পোষাক যেন দিগন্ত আলোকিত করিয়াছে। তারপর আবার কালো পাহাড়ের সারি, মাঝে মাঝে দূরে ফাঁক দিয়া প্রশান্ত মহাসাগর দেখা যাইতেছে। কোথাও বা দিগন্তবিস্তৃত মেঘের ক্ষেতকে মহাসাগর বলিয়া ভ্রম হইতেছে। কোথাও মেঘের ক্ষেত মহাসাগরে মিশিয়া গিয়াছে। পাহাড়, মেঘ, সমুদ্র, হিম ও নীলাকাশের অপরূপ শোভা দেখিতে দেখিতে সহরের সুসজ্জিত হর্ম্যাবলী নয়ন-পথে পতিত হইল। বেলা ২॥টায় প্রশান্ত মহাসাগর তীববর্তী সানফ্রান্ সিস্‌কো বিমান ঘাটিতে অবতরণ করিলাম। এই স্থান হইতে মহাসাগর অতিক্রম সুরু হইবে।

বিমানের এখানে ছ'ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার কথা। যাত্রিগণ অনেকেই নগর-দর্শনেচ্ছু। কিন্তু কাপ্তেন যাত্রিগণকে ঘাটি ত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "হাওয়া আপিসের ছাড়পত্র এখনও পাই নাই। আশা করিতেছি শীঘ্রই পাইব। তাহা হইলে ৪টাব পরই আপনাদের নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা হইবে। কারণ কুয়াশা এড়াইবার জন্য আমরা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই উড়িতে চাই।" নগর দর্শনেচ্ছা কষ্টে দমন করিয়া

উদার নীলাকাশতলে মহাসাগর তীরবর্তী বিস্তৃত বিমানাবতরণ ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া সময় কাটাইলাম। সুস্বাদু খাদ্য-সমন্বিত নৈশ ভোজন সমাপনান্তে বিমানে উঠিলাম।

সন্ধ্যা ৭টায় বিমান উড়িল। আলোক-মালা-মণ্ডিত ওক্-ল্যাণ্ড নগরীর রূপ দর্শনান্তর মহাসাগরে পড়িলাম। তখন অন্ধকার-মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগরকে গ্রাস করিয়াছে। কাপ্তেন প্রত্যেক যাত্রীর নিকটে আসিয়া বিপৎকালীন কর্তব্য-সমূহ উপদেশ করিলেন। বিপদের সময় কসিয়া বেল্ট বাঁধিয়া সামনের আসনের পশ্চাতে মাথা রাখিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। বিমান যখন সবেগে সাগর বক্ষে নিপতিত হইবে তখনকার ধাক্কা এইরূপে বসিয়া সামলাইয়া লইতে হইবে। সামনের আসনের পেছনে পকেটের মধ্যে একটি কোট আছে। পরে সেই কোটটি বাহির করিয়া গায়ে দিয়া পেছনের দরজা দিয়া ডিঙ্গিতে নামিতে হইবে। চারিখানা ডিঙ্গি আছে। তিনখানা ছোট ; প্রত্যেকখানায় ১০ জন করিয়া যাত্রী ধরে। বড়খানায় ২০ জন ধরে। যাত্রীগণের পক্ষে যথেষ্ট। আর আমাদের গতিবার্তা অনবরতই নিকটবর্তী বিমান-ঘাটিসমূহে জানান হইতেছে। অতএব মাভৈঃ। মহাসাগরের উপর দিয়া সূচীভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিমান সগর্জনে ছুটিয়াছে। যাত্রীগণ তন্দ্রামগ্ন। রাত ২টায় দেখি চাঁদ উঠিয়াছে। কিন্তু ঝাপসা জ্যোৎস্নায় কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। মনে হইল উপরে নীচে দশ দিকেই নীলাকাশ। উপরের আকাশে দুচারটা তারা।

আর সব শূন্য। ঝাপ্‌সা জ্যোৎস্নায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নীলাকাশরূপ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বিমানের মধ্যেও অন্ধকার। যাত্রীগণ তন্দ্রাচ্ছন্ন। অশরীরী শব্দ ভিন্ন আর কোথাও কিছু নাই। নামরূপের সমস্ত পার্থক্য লুপ্তপ্রায়। মনে হইল কান পাতিয়া থাকিলে অনাদিনিধন ধ্বনি হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হইবে। কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে জানি না। বামে তাকাইয়া দেখি একটি মাত্র তারা দিগন্তে সমুদ্রের মধ্যে নামিতে উদ্যত। ডাইনে পূর্বদিগন্ত রক্তিম। সমুদ্র অকলঙ্ক-দিগন্তনেমি অয়শ্চক্রের মত পড়িয়া আছে। ক্রমশঃ বালসূর্যের স্নিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ হইল। মহাসমুদ্রের উপর সুন্দর মেঘসজ্জা। মেঘগুলি যেন সদ্যস্নাতা সুকোমল কুমারীর পুঞ্জীভূত মূর্তিমতী শুভ্র শুচিতা। সূর্য সহস্রকরচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেই শুচিতাকে অবাক বিস্ময়ে পান করিতেছেন। বিমান গর্জন করিয়া ছুটিয়াছে। সহসা মনে হইল দূরে দিগন্তে সমুদ্রের মধ্য হইতে মেঘরাশি উঠিতেছে। তারপর যেন মেঘ মাথায় করিয়া একটি পাহাড় সমুদ্র ভেদ করিয়া উঠিল। অচিরে নীলাম্বুমেখলা পর্বত-প্রাচীর পরিবক্ষিত শ্যামল হনুলুলু সহরের বিমান-ঘাটিতে অবতরণ করিলাম। তখন স্থানীয় সময় সকাল ৭॥ টা। হনুলুলুর স্থানীয় সময় সানফ্রানসিস্‌কোর সময় হইতে ২॥ ঘণ্টা পেছনে। পুরা ১৫ ঘণ্টা উড়িয়াছি। স্থানদ্বয়ের দূরত্ব ১৪২৮ মাইল।

হনুলুলু সহর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ওয়াহু দ্বীপের

দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ সুবিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের কেন্দ্রস্থলে। পূর্বে আমেরিকা, উত্তরে আলস্কা তথা এশিয়া ও য়ুরোপের সংযোগস্থল, পশ্চিমে জাপান ও চীন, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া। এরূপ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপপুঞ্জ প্রশান্ত মহাসাগরে আর নাই।

সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ আয়তনে ৬,৪৩৫ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে আটটি দ্বীপে জনবসতি আছে। হাওয়াই দ্বীপ আয়তনে বৃহত্তম—৪০৩০ বর্গ মাইল। কিন্তু জনসংখ্যা ১৯৪১ সালের আদমসুমারি অনুসারে মাত্র ৬৮,৩৯৮। ওয়াহু দ্বীপ আয়তনে তৃতীয়, মাত্র ৬০৪ বর্গ মাইল; কিন্তু জনসংখ্যায় প্রথম। ইহার জনসংখ্যা ৩,১০,৫০৩। ওয়াহু দ্বীপে হনুলুলু সহর ও প্রসিদ্ধ মার্কিন নৌ-ঘাটি পার্ল হারবার। গত বিশ্বযুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রথমেই পার্ল হারবার বিধ্বস্ত করে। ইহার ফলেই প্রথমে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওয়াহু দ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিম উপকুলদ্বয় ব্যাপিয়া দুইটি দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী। মধ্যে বিস্তৃত মালভূমি। এই মালভূমিতে বিশাল ইক্ষুক্ষেত্র ও আনারস ক্ষেত্র। দক্ষিণ উপকুলে পার্ল-হারবার ও হনুলুলু সহর। উভয় স্থানের দূরত্ব সাত মাইল। হনুলুলু সহর দৈর্ঘ্যে ১৫ মাইল। বিস্তার ৩ হইতে ৪ মাইল। সহরটি পূর্ব উপকূলের পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত। পাহাড়ের উপরের বসতিগুলি দেখিতে মনোজ্ঞ।

ওয়াহু দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য পরম রমণীয়। চারিদিকে প্রশান্ত মহাসাগর। উভয় উপকূলে পর্বতমালা। সর্বত্র চিরবসন্ত বিরাজিত। মাসিক তাপের গড় ৭৬ ডিগ্রি হইতে ৮৪ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠানামা করে। বার্ষিক বারিপাত ৩০ ইঞ্চি। দ্বীপটি চির-শ্যামল। বহু মার্কিন ধনী হনুলুলুতে শীত যাপন করেন। দুইটি কারণে হনুলুলু আমার নিকট বিশেষরূপে ভাল লাগিয়াছিল। আমেরিকায় ও পরে ক্যানাডায় শীতে প্রকৃতির শুধু নিঃস্ব রূপই দেখিয়াছি। গাছে পাতা বা ফুল দেখি নাই। পাখী দেখি নাই বা পাখীর কণ্ঠ শুনি নাই। প্রকৃতি হিমের আক্রমণে আত্মরক্ষার্থ তাহার সমস্ত রস ও সমস্ত শোভা যেন গুটাইয়া লইয়াছেন। মানুষও সেইরূপ। তাহার সমস্ত চেষ্টা হিমের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ নিঃশেষিত। এ অবস্থায় মানুষ ও প্রকৃতিতে মিলন নাই—উভয়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য বিরহ-প্রাচীর। ভ্যানকুবারে বহুদিন পর সর্বপ্রথম বরফশূন্য রাস্তা ও কিঞ্চিৎ পত্রযুক্ত বৃক্ষ দেখিয়া বিশেষ স্বস্তি বোধ করিয়াছিলাম। হনুলুলুতে প্রকৃতি প্রচুর পুষ্পপল্লবে সুসজ্জিত। 'প্রিয়েষু সৌভাগ্য ফলা—চারুতা বিকশিত করিয়া প্রকৃতি দেবী মানুষের মনকে সমুৎসুক করিয়া তুলিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ এখানে প্রকৃতি বিদেশিনী হইলেও ইহার মধ্যে পূর্ব পরিচয়ের আভাস পাই। ইহার সজ্জা, রূপ ও স্পর্শ যেন চেনা। চারিদিকে অনেক পরিচিত বৃক্ষ, পরিচিত পুষ্প, পরিচিত পশুপক্ষী।

মহাসাগরাগত পবন সংস্পর্শে শ্যামল নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর সস্নেহ শিরঃসঞ্চালন সত্যই হৃদয়স্পর্শী।

৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার প্রাতঃকালে যখন বিমান হনুলুলুর বিমান-ঘাটিতে নামিতেছিল, তখন স্থানটিকে শহর বলিয়া মনেই হয় নাই। বাড়ী অপেক্ষা সবুজ বৃক্ষশ্রেণীই বেশী চোখে পড়িল। কোম্পানীর বাসে বিমান-ঘাটি হইতে বাহির হইয়া বহুদিন পর বৃক্ষস্থ প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখিয়া মন আহ্লাদিত হইল। পরেই দেখি পল্লবিত নারিকেল বৃক্ষ। কোন গাছই পাতাশূন্য নয়। পাখীর কলধ্বনি কানে গেল। দুচারটি পাখী দৃষ্টিগোচর হইল। নগর মধ্যে আলেকজাণ্ডার ইয়ং নামক হোটেলের সাত তলায় ঘর পাইলাম। ঘরে বসিয়া মহাসাগর দেখা যায়। পোষাক এখানে বেশী মনে হইতেছে। গায়ের অর্দ্ধেক জামা খুলিয়া ফেলিলাম। বাতাস ও শীতল জল বহুদিন পরে সুখস্পর্শ বলিয়া মনে হইল। গরম জল এখানে বেশী ভাল লাগে না।

বৈকালে বিখ্যাত ওয়াইকিকি তটাভিমুখে রওনা হইলাম। ওয়াইকিকি তট হোটেল হইতে বেশী দূরে নয়। তটগামী ওয়াইকিকি ওয়ে পরম রমণীয়। দুধারে ঘনসন্নিবিষ্ট নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী সমুদ্র বায়ু সংস্পর্শে আন্দোলিত হইয়া সবুজের মায়া ছড়াইতেছে। এত অদ্ভুত সবুজ যেন জীবনে দেখি নাই। পথটি বাহিয়া আসিতে সম্মুখে মহাসাগর দৃষ্টিগোচর হইল। হর্ষে হৃদয় উদ্বেল ও চরণ চঞ্চল হইল। এখানে উপকূল

পর্বতসঙ্কুল। সেজন্য সর্বত্রই তীর প্রস্তরময় ও খাড়া। শুনিলাম ক্যালিফোর্ণিয়া উপকুল হইতে জাহাজ বোঝাই বালি আনাইয়া ওয়াইকিকি তট তৈরী করা হইয়াছে। সিকতাময় ঢালু তটটি অর্ধচন্দ্রাকার। দৈর্ঘ্যে অল্প কিন্তু পরম রমণীয়। স্নানার্থিগণের বড় ভিড়। নরনারীর সৈকত অবলুণ্ঠন, সমুদ্রস্নান, ডোঙ্গা লইয়া সমুদ্র-বক্ষে ভাসিয়া থাকা প্রভৃতি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম। সমুদ্র এখানে বহু দূরে পর্যন্ত অগভীর। ঢেউ খুব কম। সুন্দর বাতাস। তটের এক পার্শ্বে একটি কাঠের ঘরে পাহারা মোতায়েন। সন্তরণকারিগণকে অপলক নয়নে লক্ষ্য করিতেছে; বিপদ আসিলে সাহায্য পাইতে যেন একটুও বিলম্ব না হয়। অদূরে সমুদ্রকূলে রয়্যাল হাওয়াইয়ান হোটেলের উন্নতশীর্ষ বাড়ী সগর্বে দাঁড়াইয়া আছে। ইতস্ততঃ পায়চারি করিতে করিতে তটের অপর প্রান্তে উপস্থিত হইলাম। অদূরে একটি পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইল। পাহাড়ের গোড়ায় সুসজ্জিত পার্ক। তন্মধ্যে বট, কর্ণিকার, আফ্রিকান্ টুলি প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ। বটবৃক্ষ তিনটি দেখিলাম। আয়তনে আমাদের শিবপুরের গাছের মত না হইলেও মন্দ নয়। আফ্রিকান টুলি বড় গাছ। ফুলে ঢাকা। আফ্রিকান টুলির রক্ত বর্ণে ও কর্ণিকারের সোনালি রঙে বাগান আলোকিত। পাহাড়ের গোড়ায় খেজুর ও নারিকেল গাছের শ্রেণী। পার্কের মধ্যে একটি পাখীর ঘর আছে। তন্মধ্যে ময়ূর, সারস প্রভৃতি নানা বর্ণের সুদৃশ্য ও কুজনরত পক্ষিগণ। মহাসাগরের গাঢ়

নীলবর্ণ, পার্শ্বে গাঢ় সবুজ বর্ণ; মাঝে আফ্রিকান টুলির গাঢ় লালবর্ণ; আকাশে সামান্য মেঘ; অদূরে পাহাড়। পাহাড়, মেঘ, সবুজ, নীল ও লালের এক অদ্ভুত খেলা। সকলে মিলিয়া এক অদ্ভুত মায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। বহুদিন পর বহু পরিচিত গাছ, ফুল, পাখী প্রভৃতি দেখিয়া অদ্ভুত আনন্দ বোধ করিতেছি। পার্কটি ঘুরিয়া সমুদ্রের ধারে ফিরিয়া দেখি এক ছোকরা সানন্দে কাঠি বরফ খাইতেছে। পরিধানে অর্দ্ধমলিন সূতির হাফ্‌প্যাণ্ট ও সার্ট। ইহা কলিকাতার রাস্তার বহু পরিচিত দৃশ্য। সামনে মহাসাগর। দিগন্তে অস্তগামী সূর্য। দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। সূর্য সমস্ত আকাশ হইতে তাঁহার রশ্মিরাজি গুটাইয়া লইয়া পশ্চিম আকাশের খানিকটা জায়গাকে নানা রঙে রঞ্জিত করিলেন। বিদায়কালীন মিলনক্ষণে আকাশের অদ্ভুত সজ্জা। ছোট একখণ্ড মেঘ আসিল। কিন্তু সূর্যকে ঢাকিতে পারিল না। নানা বর্ণমণ্ডিত কিঞ্চিৎ মেঘাবৃত আকাশ স্বীয় দেহকে যেন মণি-মুক্তা-প্রবাল-মরকতাদি খচিত সোপান শ্রেণীতে পরিণত করিল। সূর্য সেই সোপানশ্রেণী বাহিয়া ধীরে ধীরে নামিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ নামিয়া জল স্পর্শ করিলেন। তখন সূর্যকে উপুড়করা কলসীর মত দেখাইতে লাগিল। সূর্য মন্থর গমনে জলে নামিতে লাগিলেন। যেন দুর্গা প্রতিমাকে আস্তে আস্তে জলে নামাইয়া দেওয়া হইতেছে। সমস্তটা ডুবিতে ৩ মিনিট সময় লাগিল। জলের নীচে হইতেও সূর্য আকাশকে রাগরক্ত দৃষ্টিতে রঞ্জিত করিতে লাগিলেন।

হনুলুলুতে আমাদের ৩৬ ঘণ্টা থাকিতে হইবে। ৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার সকালে এখানে পৌঁছিয়াছি। ৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সন্ধ্যার পর এস্থান ত্যাগ করিব। বিশাল প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিতে তিনটি ঘাটিতে বিশ্রাম করিতে হইবে। তন্মধ্যে হনুলুলু প্রথম ঘাটি। ইহা পরম রমণীয় স্থান। কাজেই যাত্রীগণের ক্লান্তি দূর ও চিত্তবিনোদনেব জন্য দুইদিন ও এক রাত্রি এ স্থানে বিশ্রামের ব্যবস্থা।

এখানে খাদ্যদ্রব্য প্রচুর ও সুস্বাদু। চিনির প্রাচুর্য প্রথমেই চোখে পড়ে। বিলাতে তো সব জিনিসেরই টানাটানি; চিনিরও। আমেরিকা ও ক্যানাডায় চিনির অভাব না হইলেও বস্তুটা অতিরিক্ত নয়। এখানে কিন্তু সর্বদাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত চিনি পরিবেশিত হইতেছে। ইচ্ছামত ফেলাইয়া ছড়াইয়া খাওয়া চলে। ঠিক যেন যুদ্ধের পূর্বের অবস্থা। এখানকার আনারস ও পেপে খুব সুস্বাদু। খাবার সময় পেপে চাহিলে বেশ বড় একটা পেপের অর্দ্ধেকটা পরিবেশিত হয়। দাম খুব বেশী নয়। প্রশান্ত মহাসাগরের কাঁকড়ার সালাদ আমার বেশ ভাল লাগিতেছে। এখানকার ইক্ষুক্ষেত ও আনারসের ক্ষেত বিখ্যাত। একটি বড় চিনির কারখানা এবং একটা আনারস টিনে ভরিবার কারখানা আছে। ফল টিনে ভরিবার এতবড় কারখানা পৃথিবীতে না কি আর নাই। চিনির কারখানায় লাল চিনি উৎপন্ন হয়। পরে ক্যালিফোর্ণিয়ায় নিয়া রিফাইন করিয়া সাদা করা হয়।

ওয়াহু দ্বীপ প্রশান্ত মহাসাগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় ইহার সামরিক গুরুত্ব ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব সমান। প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমস্ত জাহাজ-পথ ও বিমান-পথ হনলুলুতে মিলিত হইয়াছে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার একটি টেরীটরী-রূপে শাসিত হয়। শাসনকার্যে, নৌবিভাগে ও বাণিজ্যে মার্কিনগণই প্রধান। স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে নানা জাতি। পলিনেশিয়গণই সংখ্যায় বেশী। চীনা, জাপানী ও নিগ্রোও যথেষ্ট। ইহাদের জীবনযাত্রার মান খুব উচ্চ। প্রায় মার্কিন জীবনযাত্রার সমকক্ষ। জনবিরল সম্পদশালী দ্বীপটিতে দারিদ্র্যের চিহ্ন নাই। স্থানীয় অধিবাসিগণের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য ধরনের। দেশীয় ভাষা প্রায় সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে। সকলেই মার্কিনী ঢংএর ইংরাজী বলে।

যাত্রীগণের মধ্যে তিন জনের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়ান; ভিক্টোরিয়া রাষ্ট্রের সরকারী কর্মচারী। ইহারা সকলেই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার; কর্মস্থল মেলবোর্ণ। বিলাত ও আমেরিকার বড় বড় কারখানাগুলির কার্য দেখিতে সরকার কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। বর্ষাধিক কাল বিদেশে কাটাইয়া কর্ম সমাপনান্তে স্বদেশে ফিরিতেছেন। ইহাদের নাম যথাক্রমে ফিণ্ডিসেন, লরিমার এবং রিগ্‌বি। ফিণ্ডিসেন ইহাদের নেতা; বয়স আমার চেয়ে কিছু বেশী অর্থাৎ ৪৩ বৎসরের কিঞ্চিদধিক। লরিমার ও রিগ্‌বি আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট হইবেন। শনিবার সন্ধ্যায় একটা

ট্যাক্সি ঠিক করা হইল। পরদিন আমরা ট্যাক্সি যোগে দ্বীপ পরিক্রমায় নির্গত হইব।

৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সকালে প্রাতরাশের পর অষ্ট্রেলিয়ান বন্ধুত্রয় সমভিব্যাহারে দ্বীপ পরিক্রমায় বাহির হইলাম। দক্ষিণ উপকূল ধরিয়া পশ্চিমে চলিয়া সত্বর পার্ল হারবারে উপনীত হইলাম। ইহাই আমেরিকাব বৃহত্তম প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌঘাটি। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর যুদ্ধ সুরু করিয়াই জাপান এই নৌঘাটিটি বিধ্বস্ত করে। ভীষণ বোমা বর্ষণের ফলে জাহাজগুলি নোঙ্গর-বদ্ধ অবস্থায়ই ডুবিয়া গিয়াছিল এবং ঘাটিটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ কোথাও ধ্বংসের চিহ্ন দেখি না। ঘাটিটি সম্পূর্ণ নূতন করিয়া দৃঢ়তররূপে পুনর্নির্মিত হইয়াছে। এত সত্বর এত বড় ঘাটি পুনর্নির্মাণ একমাত্র সম্পদশালী আমেরিকার পক্ষেই সম্ভব। আমাদেব প্রশ্নের উত্তরে নিগ্রো ড্রাইভার বলিল, "সহরে বোমার ক্ষতি কিছুই হয় নাই। একটি মাত্র জাপানী বোমা সহরে পড়িয়াছিল। তাহাতে একটি জাপানীরই বাড়ী বিধ্বস্ত হইয়াছিল।" আমাদের মধ্যে একজনের প্রশ্নের উত্তরে ড্রাইভার বলিল, "যুদ্ধের সময় এখানকার জাপানী বাসিন্দারা সম্পূর্ণ আমাদের পক্ষে ছিল। এখানে নানা জাতীয় লোকের বাস। পলিনেশিয়, জাপানী, চীনা। আমরা সকলেই মিলিয়া মিশিয়া আছি। আমাদের মধ্যে কোনরূপ জাতিগত বিরোধ নাই।"

পার্ল হারবার অঞ্চল অতিক্রম করিয়া আমরা পূর্ব এবং

পশ্চিম উপকূলীয় পর্বতমালার অন্তর্বর্তী মালভূমি ধরিয়া উত্তর অভিমুখে চলিলাম। প্রথমেই বিস্তীর্ণ ইক্ষুক্ষেত্র। তারপর দিগন্তব্যাপী আনারসের ক্ষেত সুরু হইল। এত বড় আনারসের ক্ষেত আমরা কেহই পূর্বে দেখি নাই। তখন ক্ষেতে আনারস নাই। অষ্ট্রেলিয়ান বন্ধুগণ গাছে আনারস দেখিবার জন্য উৎসুক। সহসা আমাদের ড্রাইভার গাড়ী থামাইয়া নামিয়া পড়িল। সে দুইটি পাকা আনারস লক্ষ্য করিয়াছে। মুহূর্তের মধ্যে আনারস দুইটি ভাঙ্গিয়া আনিয়া আমাদের উপহার দিল। বেশ বড় আনারস। রং হলুদ হয় নাই। কিন্তু সুপক্ক বলিয়াই মনে হইল। আমরা আনারস দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। বিস্তীর্ণ আনারস ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আবার গাড়ী ছুটিল। ড্রাইভারকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতে করিতে চলিলাম। ড্রাইভার বলিল, ৫ জন পান্ত্রী এখানকার সমস্ত জমি ও শিল্পের অধিকারী। তাহারা মহাপঞ্চক (big five) নামে পরিচিত। সাধারণ লোকের কথা উঠিতে ড্রাইভার বলিল, "এখানে সর্ব-নিম্ন মজুরের হার সপ্তাহে ৫০ ডলার (১৬৭ টাকা)।" মটর গাড়ীর বড় ভীড় দেখিলাম। ড্রাইভার বলিল, "এ দ্বীপে মটর সংখ্যা জন সংখ্যার চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রতি চার জন লোক পিছু একখানা মটর আছে। অনেকের নিজস্ব বিমানও আছে। যাইতে যাইতে একটি ছোট মাঠে কয়েকখানি ছোট ছোট বিমান দৃষ্টিগোচর হইল। এগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ক্রমশঃ মালভূমি অতিক্রম করিয়া উত্তর উপকূলে উপস্থিত হইলাম।

তখন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হইয়াছে। ওয়াইআলুয়া উপসাগরের কূলে একটি সুন্দর ছোট হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিলাম। লরিমার বলিলেন, "এখানে দেখিতেছি প্রাচ্য পরিবেশে প্রতীচ্য সভ্যতা। গাছ, ফুল, আবহাওয়া, মানুষ, পশুপক্ষী সব প্রাচ্য। কিন্তু খাদ্য, পোষাক, আচার ব্যবহার সব প্রতীচ্য। ভাষাও ইংরাজি।" বলিতে বলিতে তাহার চোখে তৃপ্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। পথে আমার প্রশ্নের উত্তরে ড্রাইভার বলিল, "স্থানীয় ভাষা লোকে প্রায় সম্পূর্ণ ই বিস্মৃত হইয়াছে। দু'চার জন বৃদ্ধ এখনও স্থানীয় ভাষা বলেন। কিন্তু যুবক ও বালকগণ স্থানীয় ভাষা জানেই না। সবাই ইংরাজি বলে।" হোটেলে খাইতে খাইতে মহাসাগরের সুন্দর রূপ উপভোগ করিলাম। নিকট দিয়া একটি ছোট রেল লাইন গিয়াছে। তাহার উপর দিয়া একখানি যাত্রী গাড়ী চলিয়া গেল। নানারূপ ফুলের বাগান। বাগানে নানারকমের জবাই বেশী। এখন আমরা উত্তর উপকূল ধরিয়া পূর্বাভিমুখে চলিয়াছি। বামে মহাসাগর, ডাইনে নানাবিধ তরুশ্রেণী। রকমারী রঙীন ফুল। তন্মধ্যে আফ্রিকান টুলি, পয়েণ্টসেথিয়া, বেগনবেলিয়া, নানা প্রকারের জবা, কৃষ্ণচূড়া, কর্ণিকার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গাছের মধ্যে আনারস, কলা, নারিকেল, খেজুর, নানাবিধ তাল, বট, শিরীষ, ঝাউ, পাল্টে মান্দার প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক। একটি কচুর ক্ষেত দেখিলাম। ইহারা কচুকে টেজো (Tejo) বলে। টেম্পল ভাইন নামক গাঢ় হলুদ

ফুলসমাচ্ছন্ন লতামণ্ডপগুলি বেশ মনোরম। বালিকাগণ এখানে অনেক সময় ওহু গাছের ছালের ঘাঘরা পড়ে। ঘাঘরাগুলি বেশ। ছালগুলি দেখিতে অনেকটা পাটের মত। উত্তর উপকূলে ওয়াইমিয়া ও ওয়াইলি বেলাভূমিই সব চেয়ে ভাল লাগিল। এখানে সমুদ্র-তট সর্বত্রই পর্বতসঙ্কুল। একমাত্র ওয়াইকিকি বেলাই সিকতাময়। ওয়াইলি বেলা উত্তর উপকূলের সর্বাপেক্ষা উত্তরে। তারপর দক্ষিণমুখী হইয়া পূর্ব উপকূল ধরিয়া চলিতেছি। লাই উপসাগর ও হাউলা পার্ক অতিক্রম করিয়া কাহানা উপসাগরের তীরে উপনীত হইলাম। এখানে পর্বতশ্রেণী খানিকটা সমুদ্রের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। যাইতে যাইতে সামনে, পেছনে ও ডাইনে পাহাড়—মাঝে সমুদ্র। দৃশ্যটি পরম মনোজ্ঞ। নিকটে মার্মনদের মন্দির। সকলে মিলিয়া মন্দিরে ঢুকিলাম। মন্দিরটি সুন্দর। সুন্দর হর্ম্যমালা, উদ্যান ও বৃক্ষশ্রেণী পরস্পরের শোভা বর্ধন করিতেছে। এই দ্বীপে কিরূপে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার হইল সেই সম্বন্ধে কতিপয় চিত্র ও পুস্তিকা দেখিলাম। মন্দির ত্যাগ করিয়া আমরা পূর্ব উপকূল ধরিয়া দক্ষিণে চলিয়াছি। ক্রমশঃ পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থান হইতে মহাসাগরের দৃশ্য এতই রমণীয় যে গাড়ী থামাইয়া নামিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। হু হু করিয়া মধুর বাতাস বহিতেছে। সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। সু-উচ্চ পর্বত শীর্ষে দাঁড়াইয়া দৃশ্যটি উপভোগ করিলাম। এখন অবরোহণের

পালা। দুপাশে নিবিড় বনানী। মধ্য দিয়া মটরের রাস্তা অদ্ভুত সুন্দর মনে হইতেছে। এখানে একটি ছোট জল-প্রপাত আছে। ইহার নাম আপ্সাইড ডাউন ফল্‌স্। যখন উপযুক্ত বেগে বৃষ্টি ও উপযুক্ত দিক্ আগত বায়ুর মিলন হয় তখন এই জলপ্রপাতের অংশ বিশেষ ঊর্ধ্বগামী হয়। বাতাসের চাপে পর্বত গাত্রবাহী পতনশীল জলপ্রবাহ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আবার নীচে পড়ে। নামিতে নামিতে ক্রমশঃ নগর প্রান্তে উপনীত হইলাম। সুন্দর গল্‌ফ কোর্টের পরে উত্তম গৃহরাজি দৃষ্টিগোচর হইল। এখানে ধনিগণের বসতি। একটি স্কুল দেখিলাম। ড্রাইভার বলিল, সান্‌ইয়াৎসেন বাল্য-কালে এই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। মোট ৯০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে হোটেলে ফিরিলাম। নৈশ ভোজন সমাপনান্তে বিমান-ঘাটিগামী বাসে উঠিলাম। ভোজনকালে রিগ্‌বি আহৃত আনারসদ্বয়ের একটি কাটাইয়া সকলকে পরিবেশন করিলেন। সুমিষ্ট আনারসটি সানন্দে ভক্ষণ করিলাম।

৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সন্ধ্যা ৭॥টায় হোটেল ত্যাগ করিলাম। রাত্রি ৯টায় বিমান উড়িল। উপর হইতে পর্বত-বন্ধুর আলোকিত হনুলুলু নগরী ছবির মত সুন্দর দেখাচ্ছিল। ক্রমশঃ সুন্দর নগরী চক্ষুর অন্তরাল হইল। প্রশান্ত মহা-সাগরের উপর বিমান সগর্জনে ছুটিল। আমরা কিঞ্চিৎ পশ্চিমে হেলিয়া দক্ষিণে চলিয়াছি। শেষরাত্রে উত্তর গোলার্ধের

সীমানায় আসিয়া উপনীত হইলাম। ক্যাপ্তেন আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে এইবার আমরা ভূবিষুবরেখা অতিক্রম করিব। রাত্রি সাড়ে চারিটার সময় আমরা ভূবিষুবরেখা অতিক্রম করিলাম। আমাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া হইল। সার্টিফিকেটগুলি শক্ত সুদৃশ্য নানা রঙে চিত্রিত কাগজে ছাপান। আমি যেটি পাইলাম তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ ঃ—

> এতদ্বারা সার্টিফিকেট দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীবিনয় ভূষণ দাশগুপ্ত ১৯৪৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে চারিটায় দশ হাজার ফুট ঊর্ধ্বে উড্ডীয়মান "আমানা" নামক বিমানে আরোহণ করিয়া ভূবিষুবরেখা অতিক্রম করিলেন।
>
> স্বাঃ—অস্পষ্ট
> কম্যাণ্ডার

জনৈক যাত্রী সার্টিফিকেটখানি দেখাইয়া কাপ্তেনকে প্রশ্ন করিলেন, "এটি কি?" ক্যাপ্টেন সবিনয়ে বলিলেন, "ইহা আমাদের প্রচারকার্যের অঙ্গমাত্র।" বিমান সগর্জনে ছুটিয়াছে। যাত্রীগণ তন্দ্রাচ্ছন্ন। ১০ই ফেব্রুয়ারী সোমবার প্রত্যূষে আমরা ক্যাণ্টন দ্বীপে অবতরণ করিলাম। হনুলুলু হইতে ক্যাণ্টন ১৯১১ মাইল।

ভূবিষুবরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে যুগপৎ বিপরীত ঋতুর অধিকার। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য থাকে উত্তরে। তখন উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল। পৌষ মাসে সূর্য দক্ষিণে গেলে দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মের এবং উত্তর গোলার্ধে শীতের আবির্ভাব হয়। সুতরাং এইবার আমরা শীত ঋতুর অধিকার হইতে গ্রীষ্ম ঋতুর অধিকারে পড়িলাম। শুক্রবার ভ্যানকুবারে শীতে কাঁপিয়াছি। শনি ও রবিবার হনুলুলুতে বসন্ত সুখ উপভোগ করিয়াছি। সোমবার সকালে ক্যাণ্টনে গ্রীষ্ম ঋতুর অধিকারে আসিলাম। শীত-গ্রীষ্মের এ দ্রুত আবর্তনে বিস্মিত বোধ করিতেছি। বিমান স্থান ও কাল উভয়ের উপরই তুল্য প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে।

ক্যাণ্টন একটি অঙ্গুরীয়াকার প্রবাল দ্বীপ। চারিদিকের প্রবাল প্রাচীরকে রোলার দিয়া সমান করা হইয়াছে। মধ্যস্থলে অগভীর জল। তন্মধ্যে দুই একটি ছোট প্রবাল পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চিম দিকে কিঞ্চিৎ ফাঁক দিয়া মধ্যবর্তী অগভীর জলাংশ মহাসাগরে মিশিয়াছে। দ্বীপে জনবসতি নাই। একটি বিমান-ঘাটি আছে। তাহারই লোক-লস্কর এবং কর্মচারিগণ এখানে বাস করে। তাহাদের একটি মেস আছে। সেই মেসেই আমাদেব প্রাতরাশের ব্যবস্থা। দ্বীপের যে অংশে বিমান নামিল সেখান হইতে একটি ট্রাকে করিয়া আমাদিগকে মধ্যবর্তী জলাংশের প্রান্তে নেওয়া হইল। নৌকায় জলাংশ অতিক্রম করিয়া দ্বীপের অপর অংশস্থিত মেসে

পৌঁছিলাম। ট্রাকে ১৫ মিনিট এবং নৌকায় ১৫ মিনিট সময় লাগিল। তখনও সুর্যোদয় হয় নাই। সূর্যদেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আকাশে যে আয়োজন চলিতেছিল তাহা নৌকা হইতে দেখিতেছিলাম। মনে হইল দ্বীপটিতে বেশী দিন জন-সমাগম হয় নাই। হয়তো যুদ্ধের সময় বিমান-ঘাটির প্রয়োজনে ইহার উপর মনুষ্যের পদার্পণ হইয়াছে। দ্বীপে পশুপক্ষী নাই। প্রবাল পাহাড়কে সমতল করিয়া স্থানটি প্রস্তুত। কাজেই মাটি নাই। মাটির অভাবে কোন উদ্ভিদ এমন কি তৃণ পর্যন্ত এখানে জন্মে না। দেখিলাম মেসের সম্মুখে কয়েকটি ঝাউ, নারিকেল এবং অন্য এক প্রকারের অজ্ঞাতনামা গাছ বসান হইয়াছে। কিন্তু মাটির অভাবে একটিও বাড়ে নাই। ইহাদের অবয়ব বালকোচিত; অথচ বার্দ্ধক্যের সমস্ত লক্ষণ তাহাতে প্রকট। মধ্যবর্তী অগভীর জলাংশের ছোট ছোট নানাবিধ সামুদ্রিক মাছ খেলিয়া বেড়াইতেছে। এই জীবহীন দেশে শুধু ইহাদের মধ্যেই জীবনের পূর্ণ স্পন্দন ও পূর্ণ আনন্দ প্রকট। টিনে রক্ষিত খাদ্য দ্বারা প্রাতরাশ সমাপন করিয়া তীরে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ মাছের খেলা দেখিলাম। পরে কিছু প্রবালের বাসা কুড়ান গেল। প্রবাল কীটের বাসা রচনার নৈপুণ্য সত্যই অদ্ভুত। কোনটি গাছের আকারে শাখা-প্রশাখায় সুসজ্জিত, কোনটি মৎস্যাকৃতি। ইহাদের বাসা নির্মাণের ডিজাইন অনন্ত। কাজের সূক্ষ্মতাও চমৎকার। কীট মরিয়া গিয়াছে। কঠিন অথচ ভঙ্গুর বাসাগুলি পড়িয়া

আছে। একটু জোরে পিষিলেই গুঁড়াইয়া যায়। কয়েকটি কুড়াইয়া পকেটে রাখিলাম।

সেদিন ১০ই ফেব্রুয়ারী সোমবার। ভোর ৫টায় ক্যাণ্টনে নামিয়াছি। ৩ ঘণ্টা পর অর্থাৎ ৮টায় বিমান আবার প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া উড়িল। নিকটেই আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা। এখানে সম্পূর্ণ একটি দিন বিসর্জন দিতে হইবে। কলিকাতা হইতে ক্রমাগত পশ্চিমে চলিয়াছি এবং সময় লাভ করিয়াছি। লণ্ডন আসিয়া ৫॥ ঘণ্টা সময় ফেরত পাইয়াছি। লণ্ডন হইতে নিউ ইয়র্ক আসিয়া ৫ ঘণ্টা সময় ফিরিয়া পাইয়াছি। নিউ ইয়র্ক হইতে ভ্যানকুবার আসিতে ঘড়ির কাঁটা ৩ ঘণ্টা পিছাইয়াছি। ভ্যানকুবাব হইতে হনুলুলু পর্যন্ত আসিতে ঘড়ির কাঁটা ২॥ ঘণ্টা পিছাইতে হইয়াছে। যত পশ্চিমে যাইব তত ঘড়ির কাঁটা আরও পিছাইতে হইবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক তারিখ রেখায় একটি গোটা দিন হারাইতে হইল। ১০ই ফেব্রুয়ারী সোমবার প্রায় ৯টাব সময় যেমনি তারিখ রেখাটি পার হইলাম অমনি ১১ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বেলা ৯টা বলিয়া গণ্য হইল। এখানে ঘড়ি ঠিক রহিল কিন্তু পাঁজি একদিন লাফাইয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে পুরা একদিন বয়স বাড়িয়া গেল। একদিনের জীবনসুখ উপভোগে বঞ্চিত হইলাম।

কলিকাতা ত্যাগ করিবাব পর এ পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটা পিছাইতে পিছাইতে সময় লাভ করিয়াছি প্রায় ১৭ ঘণ্টা। এখানে একসঙ্গে ২৪ ঘণ্টা সময় হারাইলাম। এখান হইতে

কলিকাতা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সাত ঘণ্টা সময় লাভ করিব। কাজেই মোট লাভে লোকসানে সমান হইয়া যাইবে।

এই ক্রমবর্ধমান লাভ এবং এককালীন লোকসানের হিসাব এইরূপ ঃ

	লাভ ঘণ্টা	লোকসান ঘণ্টা
কলিকাতা	—০	+০
লণ্ডন	—৫½	
আমেরিকা (নিউ ইয়র্ক)	—৫	
,, (প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল)	—৩	
হনলুলু	—২½	
ক্যাণ্টন	—১	+১২
আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা		
ফিজি	—১	
সিড্‌নি	—[illegible]	
ডারউইন	—[illegible]	
রেঙ্গুন	—৩	
কলিকাতা (ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়)	—১	
	—২৪	+২৪=০

যদি কেহ কলিকাতা হইতে পূর্বাভিমুখে রওয়ানা হইয়া

ক্রমাগত পূর্বে চলিয়া পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন তাঁহার অবস্থা হইবে ইহার বিপরীত। তিনি সময় হারাইতে হারাইতে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা আগাইতে আগাইতে চলিবেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক তারিখ রেখায় গোটা একটি দিন লাভ করিবেন। যদি ১১ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি বারটায় উক্ত রেখায় উপস্থিত হন তবে সে সময় ১০ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি বারটা বলিয়া গণ্য হইবে। ঐ বৎসর ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখটি তিনি পর পর দুই দিন পাইবেন। পুরা ৪৮ ঘণ্টা জীবন-সুখ উপভোগ করিয়াও তাহার বয়স মাত্র এক দিন বাড়িবে। কিন্তু তিনি যখন আবার কলিকাতায় ফিরিবেন তখন তাহার লাভ লোকসান সমান হইয়া যাইবে। পশ্চিমগামীর অনবরতই লাভ কিন্তু আন্তর্জাতিক তারিখ রেখায় গোটা দিন লোকসান। পূর্বগামীর অনবরতই লোকসান, কিন্তু আন্তর্জাতিক তারিখ রেখায় গোটা দিন লাভ। মহাকালের হিসাব নির্ভুল।

বিমান ভ্রমণে তারিখ বার ও সময়ের জ্ঞানে বিপর্যয় উপস্থিত হয়। ইহাদিগকে আমরা যত পাকা মনে করি ইহারা আসলে তত পাকা নয়। প্রকৃতপক্ষে কালের কোন পৃথক সত্তা নাই। কাল বিপরিণামশীল জগতের এক প্রকার মাপকাঠি মাত্র। স্বর্গে পরিবর্তন কম। কাজেই কালের মাপ বড়। ব্রহ্মার বর্ষ সেইজন্য আমাদের বর্ষ অপেক্ষা অনেক বড়। মহাসাগরের কোন পরিবর্তন নাই। তাই কবি বলিয়াছেন, "মহাকাল থেমে গেছে তোমার চরণ তলে।"

বিমান পাখা মেলিয়া সগর্জনে উড়িতেছে। উপরে পরিষ্কার নীলাকাশ। খুব রৌদ্র উঠিয়াছে। কোথাও মহাসাগর পাতের মত পড়িয়া আছে। অন্যত্র মহাসাগর বক্ষে মেঘরাশির নানারূপ খেলা চলিতেছে। কোথাও সাদা মেঘ জলের উপর ভেলার মত ভাসিতেছে। কোথাও মেঘমালা দিগন্তব্যাপী পর্বতশ্রেণীর ন্যায় দণ্ডায়মান। কোথাও মেঘকুল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও যেন অপরিমিত তূলারাশি রৌদ্রে বিছান হইয়াছে। প্রখর রৌদ্র কিরণে নীল গম্বুজে ঢাকা নীল মহাসাগর বক্ষে মেঘের খেলা বড়ই মনোজ্ঞ। এত সৌন্দর্য, কিন্তু কোন রহস্য নাই। কারণ আলো প্রচুর।

ছুপুর প্রায় ১টায় ফিজি দ্বীপে অবতরণ করিলাম। ক্যাণ্টন হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী ৮টায় রওয়ানা হইয়া মাত্র ৪½ ঘণ্টা উড়িয়া ফিজি পৌঁছিলাম। কিন্তু এখানকার পাঁজিতে আজ ১১ই ফেব্রুয়ারী, সময় ১২টা। উভয় স্থানের স্থানীয় সময়ের পার্থক্য ½ ঘণ্টা। এখানে বিমান-ঘাটির মধ্যেই আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা। বেশ গরম বোধ হইতেছে। শীতল বাতাস এবং শীতল জল বড়ই ভাল লাগে। স্নানগৃহে গিয়া যাত্রীগণ ঠাণ্ডা জলেই স্নান করিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনে জলের বদলে ফলের রস পরিবেশন করা হইল। গ্রীষ্মে সুমিষ্ট সরবতী লেবুর রস প্রাণ ভরিয়া পান করিলাম।

ফিজি দ্বীপের যে নগরে আমরা অবতরণ করিয়াছি তাহার

নাম ভিটিলেবু। বিমান-ঘাটিটির নাম নান্দী বিমান-ঘাটি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহের মধ্যে ফিজি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইহার রাজধানী "সুভা"। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিজিয়ান সর্দারগণ ফিজি দ্বীপ ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করেন। তদবধি ইহা ইংরাজের প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রধান ঘাটি। ইক্ষু এখানে প্রধান ফসল। ইক্ষুক্ষেত্রে বহু ভারতীয় কাজ করে। ভারতীয়-গণই এদেশে ইক্ষুর চাষ আরম্ভ করিয়া সফল করিয়াছে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অষ্ট্রেলিয়ান বন্ধুদ্বয় সমভিব্যাহারে ট্যাক্সি যোগে দ্বীপ পরিভ্রমণে বাহির হইলাম। ড্রাইভার স্থান-সমূহের পরিচয় বলিতে বলিতে মোটর চালাইতেছে। বিমান-ঘাটির নিকটেই পাহাড়। পাহাড়ের নীচু দিয়া রাস্তা। রাস্তার দুই পার্শ্বে বিশাল শিরীষ বৃক্ষশ্রেণী আমাকে দেশের কথা মনে করাইয়া দিতেছিল। একটি ছোট ধানের ক্ষেত দেখিলাম। গাছগুলি ছোট, ফাঁকা ফাঁকা; বেশী দিন লাগান হয় নাই। দেখিয়া বড় ভাল লাগিল। মোটরে পায়ের নীচে একটি মেদিনীপুরের মাদুর বিছান রহিয়াছে। ড্রাইভার বলিল, মাদুরটি ভারতবর্ষ হইতে আমদানী। লরিমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এখানে এইরূপ মাদুর করিতে পার না?" ড্রাইভার বলিল, "ভারতবর্ষে মাদুর নির্মাণে যন্ত্র ব্যবহার হয়। কাজেই আমরা পারিয়া উঠি না।" লরিমার আমার দিকে তাকাইলেন। আমি বলিলাম, "মেদিনীপুরের মাদুর হাতেই তৈরী হয়।" মহাসাগরের পার দিয়া খানিকক্ষণ চলিলাম। তারপর একটি

নারিকেল কুঞ্জের পার্শ্বে উপনীত হইলাম। সুন্দর নারিকেল কুঞ্জ দেখিয়া অষ্ট্রেলিয়ান বন্ধুগণ নামিয়া পড়িলেন। ড্রাইভার ও আমি মোটরে রহিলাম। ড্রাইভার বরাবর ইংরাজিতে কথা বলিতেছিল। সহসা আমাকে হিন্দুস্থানীতে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "আপ্ অষ্ট্রেলিয়া যানে বালে হ্যায়।" আমি যেন কানকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। বহুদিন কোন ভারতীয় ভাষা শুনি নাই। কথা কয়টি যেন কানে মধু ঢালিল। আমি কি উত্তর দিব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। ড্রাইভার তখন ইংরাজিতে আবার প্রশ্ন করিল, "আপনি হিন্দুস্থানী জানেন না?" আমি বলিলাম, "তুমি হিন্দুস্থানী শিখিলে কি করিয়া?"

ড্রাইভার—আমি ভারতীয়। শুনিয়াছি আমার পিতামহ কলিকাতার অধিবাসী ছিলেন। আমাদের বংশে তিনিই প্রথমে এদেশে আসেন।

আমি—আমিও কলিকাতার অধিবাসী। তোমার নাম কি?

ড্রাইভার—মহম্মদ আলি।

সেদিন এই অপরিচিত মহম্মদ আলিকে পরমাত্মীয় বলিয়া মনে হইতেছিল।

মহম্মদ আলি বলিল—"আমি কখনও ভারতবর্ষে যাই নাই। এদেশে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার ভারতবাসী আছেন। ভারতীয়গণই এদেশে সংখ্যায় বেশী। ফিজিয়ানগণের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার। এদেশে প্রায় ১৫ কি ২০ হাজার

ইংরাজ আছে। শাসনকার্য্য একজন দেশপালের হাতে। তাহার একটি পরামর্শদাতা সভা আছে। তাহাতে ভারতবাসী, ফিজিয়ান ও ইংরাজের প্রায় সমসংখ্যক প্রতিনিধি আছে। ভারতীয়গণের মধ্যে কয়েকটি আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত। ভারতীয়গণ এখানে বেশ মিলিয়া মিশিয়া আছে। আমরা সকলেই হিন্দুস্থানীতে কথাবার্তা বলি। ভারতবর্ষে বর্তমানে হিন্দু মুসলমানে যে দাঙ্গা চলিতেছে তাহাতে আমরা বড়ই লজ্জিত। আমি আপনাকে একটি ভারতীয় পাড়ায় লইয়া যাইব।”

অষ্ট্রেলিয়ানগণ নারিকেলকুঞ্জের শোভায় মুগ্ধ হইয়াছেন। রিগবির হাতে ক্যামেরা; ফটো তুলিবেন। মহম্মদ আলি ও আমি নামিয়া আসিলাম। মহম্মদ আলিকে ভারতীয় বলিয়া তাহাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলাম। কয়েকটি ফিজিয়ান নরনারী ঐ স্থানে বাতাবি ফলের মত একটি ফল আগুনে সেঁকিতেছিল। মহম্মদ আলি বলিল, ফিজিয়ানগণ চাল বা গম খায় না। প্রায়ই ফল খাইয়া থাকে। তন্মধ্যে এই ফলই প্রধান। ইহার নাম রুটি ফল। সেঁকিয়া কাটিলে ইহার মধ্যের অংশ খাইতে নরম হাতে সেঁকা রুটির মত লাগে। আমাদের ফিজিয়ান বন্ধুগণ ফলটি সেঁকিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ভিতরটি বেশ সাদা ও নরম। ফিজিয়ান বন্ধুগণ তাহাদের সহিত রুটি ফল ভক্ষণে আমাদিগকে আহ্বান করিলেন। ফিণ্ডেসন, লরিমার ও রিগবি প্রত্যেক্যেই স্বহস্তে কিঞ্চিৎ উঠাইয়া লইয়া

মুখে ফেলিলেন। আমিও তাহাদিগকে অনুসরণ করিলাম। নরম ও গরম রুটির মতই লাগিল। মহম্মদ আলি ফিজিয়ান ভাষায় উহাদিগকে কি বলিল। একটি যুবক দা হাতে নারিকেল গাছে উঠিয়া নারিকেল পাড়িয়া আনিল। আমরা প্রত্যেকেই ডাবের জল পান করিয়া ও লেওয়া খাইয়া তৃপ্ত হইলাম। অষ্ট্রেলিয়ানগণের ডাব ভক্ষণ নূতন ব্যাপার। আমরা ডাবের মুখ মুখে রাখিয়া যখন জল পান করিতেছিলাম তখন রিগবি ছবি তুলিয়া লইলেন। রিগবির ছবি তুলিলেন ফিণ্ডেসন। এইরূপে কিছুক্ষণ নারিকেলকুঞ্জে সানন্দে বিচরণ করিয়া মটরে আরোহণ করিলাম। মহম্মদ আলি বলিল, "ফিজিয়ানগণ নাকি আফ্রিকার ধীবর। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মহাসাগরে মাছ ধরিতে গিয়া পথ ভুলিয়া ভাসিতে ভাসিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়।" চলিতে চলিতে মহম্মদ আলি গাড়ী থামাইয়া বলিল, "পাশেই একটি ফিজিয়ান সর্দারের বাড়ী। দেখিবেন কি?" আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গণটি বেশ বড়। চারিপাশে কয়েকখানি চৌ-চালা ঘর। প্রাঙ্গণের কোণে দু-একটি রুটি ফলের গাছ। ঠিক বাতাবি ফলের গাছের মত। গাছে বাতাবি ফলের মত রুটি ফল ঝুলিয়া আছে। আবার গাড়ীতে উঠিয়া চলিতেছি। দু-একটি ফিজিয়ান যুবকের চুলের পরিপাটি দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। মাথায় লম্বা লম্বা চুল খাড়া হইয়া আছে। ঘনবিন্যস্ত দীর্ঘ অথচ খাড়া চলে মাথাটিকে

কদম ফুলের মত দেখাইতেছে। অত বড় লম্বা চুলকে কি করিয়া অত খাড়া রাখা সম্ভব তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এতাদৃশ কেশরাশি-সংযুক্ত মস্তকে অর্ধনগ্নদেহ দৃঢ়কায় ফিজিয়ান যুবক যখন দৃঢ় মুষ্টিতে বর্ষা ধরিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়া সমুদ্র মধ্যস্থ মৎস্য লক্ষ্য করে তখন তাহার সমগ্র দেহটি মূর্তিমান পৌরুষরূপে প্রতিভাত হয়। নিরাভরণা ফিজিয়ান রমণীর সর্বাঙ্গে যৌবন ফুলের মত বিকশিত। চলিতে চলিতে মহম্মদ আলি বলিল, "এদেশের জমি সমস্তই ফিজিয়ানগণের। কিন্তু ফিজিয়ানগণ বড় অলস। ভারতীয়-গণই জমি চাষ করে। ফিজিয়ানগণ খাজনা পায়। এই খাজনা দ্বারাই ইহারা জীবিকানির্বাহ করে। ইহারা ফলমূল খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। জীবনযাত্রার মান খুব নীচু। মাছ ধরিয়া খাজনা আদায় করিয়া মনের সুখে ঘুরিয়া বেড়ায়।" কথা বলিতে বলিতে চলিতেছি। মহম্মদ আলি বলিল, "এদেশের চিনির কারখানা 'অষ্ট্রেলিয়ান সুগার কোম্পানী' নামক একটি কোম্পানীর হাতে। দ্বীপের সমস্ত আখ তাহারাই মাড়াই করিয়া চিনি প্রস্তুত করে। অষ্ট্রেলিয়ার সাবান এবং অন্যান্য অনেক অষ্ট্রেলিয়ান জিনিষ এখানে চলে। নানা দিক ঘুরাইয়া মহম্মদ আলি আমাদিগকে একটি বাজারে উপস্থিত করিল। বাজারের দোকান সবই ভারতীয়গণের। কয়েকজন ভারতীয় আসিয়া আমাকে এবং আমার সঙ্গীগণকে চা-পানে অনুরোধ করিলেন। চেষ্টা করিয়াও ইহাদের অনুরোধ

এড়াইতে পারিলাম না। লরিমার আমাকে বলিলেন, “ইহারা তোমার সঙ্গে একটু নিবিড়ভাবে মিশিতে চাহেন। তুমি চা পান করিয়া এস। আমরা ততক্ষণ বাজারে একটু ঘুরি।” “শীঘ্রই আসিতেছি” বলিয়া আমি ভিতরে গেলাম। একটি ঘরের বারান্দায় আমাকে বসান হইল। অনেক ভারতীয় ভদ্রলোক সেখানে আসিলেন। আমাকে নানারূপে আপ্যায়িত করিতে সকলে ব্যস্ত। চা ও তৎসহ বিস্কুট প্রভৃতি পরিবেশন করা হইল। ইহারা সকলেই গুজরাটী। সকলেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষে কেন এত দাঙ্গা হইতেছে। কেহ কেহ বঙ্গ দেশের প্রধান মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নীতির তীব্র সমালোচনা করিলেন। ফিজি দ্বীপে হিন্দু মুসলমান কিরূপে সম্প্রীতির সহিত বাস করিতেছেন তাহার উল্লেখ করিলেন। দশ মিনিটের মধ্যে চা পান সমাধা করিয়া দোকানের দিকে আসিলাম। দোকানসমূহে নানারূপ ছবি, ঝিনুক, শঙ্খ, প্রবাল কীটের নানাবিধ সুদৃশ্য বাসা বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে। কিছু ছবি কিনিয়া পাশের পোষ্ট আফিস হইতে আমার পুত্রের নামে দেশে পাঠাইলাম। ইহারা নিজেদের সুখদুঃখের কথাও আমাকে কিছু বলিলেন। বলিলেন, “এখানে একজন চক্ষু চিকিৎসকের বড় অভাব। ভারতবর্ষ হইতে যদি কোন চক্ষু চিকিৎসক এখানে আসেন তবে প্রথম হইতেই তাহার রোজগার মাসে অন্ততঃ এক হাজার টাকা হইতে পারে। বর্তমানে এখানকার ইংরাজ

কর্তৃপক্ষ ভারতীয়গণের প্রতি পূর্বের মত অনুকূল নহেন। ভারতীয়গণের অধিক সংখ্যায় আগমন আর ইহারা পছন্দ করিতেছেন না। যাহারা আছেন তাহাদের পরিবারবর্গ ভিন্ন আর কাহাকে বড় আসিতে দিতে চাহেন না। আমাদের মধ্যে অনেকেরই দেশের সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে। কয়েক বৎসর এখানে কাজ করিয়া যখন দেশে ফিরি তখন অন্য কেহ দোকানের ভাব লইয়া এখানে থাকে। আজকাল যাতায়াতেরও অসুবিধা। কয়েক দিন পূর্বে অষ্ট্রেলিয়াস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার পরাঞ্জপে মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন। আমাদের অনেক অসুবিধার কথা তাঁহাকে বলিয়াছি। আপনার সঙ্গে যদি তাঁহার দেখা হয় তবে আপনিও বলিবেন।" ইহাদের পরমাত্মীয়বৎ ব্যবহারে আনন্দিত হইয়া অষ্ট্রেলিয়ান বন্ধুগণের সঙ্গে মটরে আসিয়া উঠিলাম। এবার বিমান-ঘাটিতে ফিরিতে হইবে। লরিমার বলিলেন, "এখানকার ভারতীয়গণ কি ভারতীয় আচারব্যবহার ঠিক ঠিক বজায় রাখিয়াছেন?"

আমি "হাঁ। তাইতো দেখিলাম।"

লরিমার—ইহাদের ভাষায়ও কি কোন প্রভেদ হয় নাই? অষ্ট্রেলিয়ান ইংরাজি যেমন বিলাতী ইংরাজি হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক, সেইরূপ?

আমি—মনে তো হইল না। ইহারা যে হিন্দুস্থানী বলিল ভারতে তো ঠিক তাহাই কথিত হয়।

লরিমার যেন চিন্তাবিষ্ট হইলেন। ওয়াহু পরিক্রমা কালে প্রাচ্য পরিবেশে প্রতীচ্য সভ্যতার সম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া লরিমারের মুখমণ্ডল কিরূপ প্রফুল্ল হইয়াছিল তাহা আমার মনে পড়িল।

সন্ধ্যার পূর্বে বিমান-ঘাটিতে ফিরিলাম। হাত-পা ধুইয়া প্রস্তুত হইয়া নিকটে পায়চারি করিতেছি। অদূরে মহাসাগর। ফিজি ও হাওয়াই-এর অবস্থার তারতম্যের কথা মনে হইতেছে। মার্কিন অধিকৃত হাওয়াই দ্বীপে দারিদ্র্য নাই। প্রতীচ্য সভ্যতা অধিবাসিগণকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে সম্প্রদায়গত কোন বিরোধ নাই। ইংরাজ অধিকৃত ফিজি দ্বীপে ফিজিয়ানগণ এখনও সভ্যতার আদিম অবস্থায় বর্তমান। ভারতীয়-ফিজিয়ান সাম্প্রদায়িক বিরোধ মাথা উচাইতেছে, ইংরাজ দুর্বল পক্ষের অনুকূল; কাহারও অভাব নাই, কিন্তু জীবনযাত্রার মান নিম্ন। চিন্তা করিতে করিতে ঘুরিতেছি। এমন সময় একটি পাঞ্জাবী আসিয়া ভারতীয় কায়দায় সেলাম করিয়া বলিল, "আমার গ্রামের অমুকের ভাই বিশ বছর পূর্বে ব্যবসা করিতে অষ্ট্রেলিয়া গিয়াছিল। তারপর তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। শুনিলাম আপনি অষ্ট্রেলিয়া যাইতেছেন। যদি কোন খোঁজ পান তবে অমুক ঠিকানায় জানাইয়া দিবেন।" সরলমতি পাঞ্জাবীকে বুঝান সম্ভবপর নয় যে শুধু নামমাত্র পরিচয়ে একজন নিখোঁজ নগণ্য ভারতীয়কে আমার পক্ষে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব নয়।

নৈশ ভোজন সমাপন করিয়া স্থানীয় অফিসারগণ বিলিয়ার্ড খেলিতে সুরু করিলেন। আমাদের দু-একজন সহযাত্রী খেলায় যোগদান করিলেন। আমরা দর্শক। সময় মত আমাদের ডাক পড়িল। বিমানে গিয়া উঠিলাম। রাত্রি ১০টায় বিমান উড়িল।

হে মহাসাগর, বাল্যকালে মানচিত্রে তোমার পৃথিবীর অর্ধাংশব্যাপী সুবিশাল রূপ দেখিয়া অভিভূত হইয়াছি। তুমি মহাসাগরের রাজা অথচ প্রশান্ত। তোমার আদর্শ দেখাইয়া শিক্ষকগণ আমাদের চপল ও গর্বিত মনকে প্রশান্ত করিবার কতই না বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। আজ তোমার উপর দিয়া উড়িতেছি। তোমাকে নমস্কার। দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে আশ্রয় দিয়া তুমি আমাদের পথ সুগম করিয়া দিতেছ। রমণীয় শোভা, সুস্বাদু খাদ্য ও উত্তম পানীয় পরিবেশনে তুমি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেছ। তোমার আতিথ্য অতুলনীয়। তোমাকে নমস্কার। তুমি আজ আমার ঋতুচক্রের জ্ঞানে ধোঁকা ধরাইয়া দিয়াছ, বার তারিখ ও সময়ের জ্ঞান বিপর্যস্ত করিয়াছ। তোমার বিশাল দেহে ভূবিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে শীত ও গ্রীষ্ম যুগপৎ বিদ্যমান ; আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার উভয় পার্শ্বে একই সময়ে ভিন্ন তারিখ ও ভিন্ন বার। তুমি অদ্ভুত। তোমাকে নমস্কার। তুমি মহাকালের উপর জয়ী। "মহাকাল থেমে গেছে তোমার চরণ তলে।" তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

বিমান সগর্জনে ছুটিয়াছে। যাত্রীগণ তন্দ্রাচুম্বিত নেত্রে আসনে উপবিষ্ট। ক্রমশঃ সূর্যোদয় হইল। আকাশ ও মহাসাগর তাহাদের বিরাট রূপ লইয়া প্রকাশিত হইল। সিডনী বন্দরের অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়িল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তরুলতা সতেজ ও সবুজ। সুদৃশ্য বন্দর ও সবুজ সহর দেখিতে দেখিতে সকাল সাড়ে ছয়টায় সিডনীর বিমান-ঘাটিতে অবতরণ করিলাম। সেদিন ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার।

এ-যাত্রায় পাঁচ লম্ফে মোট ৮৩৮৩ মাইল পথ উড়িয়াছি।

ভ্যানকুবার হইতে সানফ্রান্‌সিস্‌কো	... ৭৯২ মাইল
সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো হইতে হনলুলু	...২৪২৮ মাইল
হনলুলু হইতে ক্যান্টন	...১৯১১ মাইল
ক্যান্টন হইতে ফিজি	...১২৭২ মাইল
ফিজি হইতে সিডনী	...১৯৮০ মাইল
মোট	৮৩৮৩ মাইল

একাদশ অধ্যায়

অষ্ট্রেলিয়া

১৯৪৭-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার সকাল সাড়ে ছ'টায় সিডনি বিমান-ঘাটিতে নামিলাম।

ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় দূতাবাস হইতে আমার আগমন-সংবাদ জানাইয়া অষ্ট্রেলিয়াস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারকে একটি তার করা হইয়াছিল। সেই তারের একটি নকল আমি ভ্যানকুবারে পাইয়াছিলাম। তারে লেখা ছিল যে, আমি একদিন সিডনিতে বিশ্রাম করিয়া পরদিন ক্যানবেরা যাইব। দূতাবাসের কর্তৃপক্ষ মনে করিয়াছিলেন যে, এত বড় লম্বা ভ্রমণের পর আমি একদিন বিশ্রাম করিতে চাহিব। তারে হাই কমিশনারের ঠিকানা দেওয়া ছিল সিডনি। কিন্তু তিনি থাকেন ক্যানবেরায়। মনে সন্দেহ হইল, ঠিকানায় যখন ভুল আছে তখন হাই কমিশনার মহাশয় সময়মত তারটি নাও পাইতে পারেন। বিমান-ঘাটিতে নামিয়া খোঁজ লইয়া জানিলাম, আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কেহ ঘাটিতে আসে নাই অথবা আমার জন্য কোন সংবাদও নাই। আমার অনুরোধে ঘাটির কর্মচারিগণ টেলিফোন যোগে তাঁহাদের নগরস্থিত কার্যালয়ে খবর দিলেন। খবর আসিল সেখানেও আমার

জন্য কোন সংবাদ বা কোন ভদ্রলোক উপস্থিত নাই। ঘাটির কর্মচারিগণ বলিলেন, "শীঘ্রই ক্যানবেরাগামী একটি বিমান সিডনি ত্যাগ করিবে। সে বিমানে আপনি স্থান পাইতে পারেন।" তৎক্ষণাৎ টিকিট কিনিয়া হাই কমিশনারকে আমার আগমনবার্তা জানাইয়া তার করিয়া দিলাম। এই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া মালের খোঁজ লইতে লাউঞ্জে গেলাম। ততক্ষণ মাল শুল্ক বিভাগের হেফাজতে আসিয়াছে। সেখানে কয়েকজন সাংবাদিকের পাল্লায় পড়িলাম। অন্যান্য দেশ হইতে এখানকার সাংবাদিকগণ অধিকতর উৎসাহী। 'আমার কিছু বলিবার নাই।'—একথা বলিলেই অন্যত্র সাংবাদিকগণ চলিয়া গিয়াছেন। করাচীতে যাইবার পূর্বে এক জন সাংবাদিককে আমি কথা দিয়াছিলাম যে আমি অন্য কোন সাংবাদিককেও কিছু বলিব না। কিন্তু এখানে সাংবাদিকগণ আমাকে রীতি-মত জেরা করিতে সুরু করিলেন এবং আমার ছবি না তুলিয়া ছাড়িলেন না। পরদিন যথারীতি 'সিডনি সান' পত্রিকায় আমার ও আমার দুই জন সহযাত্রীর ছবি দেখিলাম। অপর দুই জনের মধ্যে এক জনের নাম "টেডপুল" এবং দ্বিতীয়ের নাম "জন ক্রেলিন"। 'টেডপুল' মোটর-দৌড়ে খ্যাতিমান। 'জন ক্রেলিন' চৌদ্দ বৎসরের বালক, ইউরোপে পর্বতভ্রমণ কালে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ডাক্তার আলেকজাণ্ডার মিন্‌কাউস্কির জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

৮টায় সিডনি বিমান-ঘাটি হইতে বিমান উড়িল। মুষল-

ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। মেঘ ও বৃষ্টি ভেদ করিয়া বিমান পরিষ্কার আকাশে উঠিল। ১২০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নয়টায় ক্যানবেরা বিমান-ঘাটিতে নামিলাম। নামিবার সময় পাহাড়ে-ঘেরা বিমান-ঘাটির দৃশ্য বেশ ভাল লাগিতেছিল। অদূরে মেষপাল স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বিমান-ঘাটি হইতে সিধা হাই কমিশনারের আপিসে পৌছিলাম। যে বাড়ীতে বিমানের নাগরিক কার্যালয় তাহারই দোতলায় হাই কমিশনারের আপিস।

শহরেব এই জায়গাটির নাম সিভিক সেণ্টার বা নগরকেন্দ্র। এখানে দুইটি সমান্তরাল বাড়ীর লাইন। প্রত্যেক লাইনে দুইটি করিয়া মোট চারিটি বাড়ী। বাড়ীগুলি দোতলা। প্রায় সব ঘবেই দোকান। কোন কোন ঘবে নানা প্রকারের আপিস— জায়গাটি ছোট। দোকানগুলিও খুব ছোট ছোট। মানুষও কম। ইহাই ক্যানবেরা সহরের কেন্দ্রস্থল।

হাই কমিশনারের আপিসে যাইতে তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দাম্‌লের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি মিনিট দশেক পূবে আমার তার পাইয়া হোটেল ক্যানবেরায় আমার জন্য স্থান সংগ্রহ করিয়াছেন। দাম্‌লে মহাশয় বলিলেন যে, ওয়াশিংটনের তার পাইয়া তিনি আমার জন্য সিডনিতে এক দিনের মত হোটেল ঠিক করিবার জন্য তাঁহাদের সিডনিস্থ প্রতিনিধি শ্রীযুত সান্ন্যালকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। বলিতে বলিতে টেলিফোন বাজিল। শ্রীযুত সান্ন্যাল সিডনি হইতে

ডাকিতেছেন। তিনি সিডনিতে বিমানের নগবস্থিত কার্যালযে গিযা আমাকে না পাইযা ফিবিযা আসিযাছেন। শ্রীযুত দাম্‌লেব নিকট আমাব সরাসরি ক্যানবেবা আগমনের সংবাদ পাইযা দুঃখ প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুত দাম্‌লে ট্যাক্সি ডাকিযা আমাকে হোটেল ক্যানবেরায পাঠাইযা দিলেন।

ক্যানবেবা সুন্দব শহব। ইহাকে শহব না বলিযা উদ্যান বলিলেই ঠিক হয। এখানে মাত্র চৌদ্দ হাজার লোকের বাস। শহবে মানুষ অপেক্ষা বৃক্ষেব সংখ্যা বেশী। বৃক্ষশ্রেণী সুসজ্জিত। নানা প্রকারেব নযনমনোহাবী বৃক্ষ। তন্মধ্যে 'উইপিং উইলো' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার শাখাশ্রেণী হইতে কোমল পত্রবহুল দীর্ঘ প্রশাখাগুলি নীচে লুটাইযা পড়িযাছে। শহরের উত্তরে 'সিভিক সেণ্টাব'। দক্ষিণে পার্লামেণ্ট ভবন ও তৎপার্শ্ববর্তী সরকাবী আপিসসমূহ। সিভিক সেণ্টাব ও পার্লামেণ্ট ভবনের মধ্যে প্রায দেড় মাইল ব্যবধান। একটি জনবিবল সুন্দব বাস্তা সিভিক সেণ্টাব ও পালামেণ্ট ভবনকে সংযুক্ত করিযাছে। প্রায মধ্যপথে ক্ষীণকা । মলোংলো নদী। ইহাই শহবের প্রধান অংশ। ইহাব আশে পাশে মাঝে মাঝে সাজান বাড়ীঘব। 'হোটেল ক্যানবেবা' পার্লামেণ্ট ভবনের কাছে। হোটেলে গিযা নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিলাম। একতলা বাড়ী। মধ্যস্থলে বড় চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ। হোটেলটি প্রাঙ্গণকে ঘিরিযা রহিযাছে। ঘবগুলিব সামনে ঘুবানো প্রশস্ত বারান্দা। বাবান্দাব উপবে টালির

ছাত। হোটেলের চারিদিকেও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। তাহাতে সুসজ্জিত তরুশ্রেণী। বহুদিন পরে এইরূপ একতলা বাড়ীতে থাকিলাম। এতদিন দেখিয়াছি পিঁপড়ার সারির মত মানুষ আর নদীর স্রোতের মত মোটরশ্রেণী। বাড়ী একটির ঘাড়ে আর একটি; পাল্লা দিয়া আকাশ ছুঁইতে উঠিয়াছে। এখানে কোন তাড়াহুড়া নাই। মানুষ, গাড়ী বা বাড়ী কেহই ভীড় করিয়া ছুটিতেছে না। অনেকক্ষণ পথ চলিলে একটি মানুষ বা একটি গাড়ী অথবা একটি বাড়ী দেখা যায়। বাড়ী মাটি ছাড়িয়া আকাশে উঠিতে চায় না। মাটির কোলেই শান্তিতে বিশ্রাম করিতেছে। কৃশা মলোংলো নদীর গতিতে কোন তাড়াহুড়া নাই। নির্মল আকাশের নীচে এ যেন প্রকৃতির মায়াপুরী। প্রকৃতির কোলে বসিয়াও তাহার অপ্রমেয় রহস্যের কূলকিনারা না পাইয়া উইপিং উইলো আলুলায়িত-কুন্তলা বিরহিণীর মত কাঁদিতেছে।

হোটেলে আসিয়া স্নানাদি সারিয়া পুনবায় হাই কমিশনার আপিসে আসিলাম। বাংলার ভূতপূর্ব লাট শ্রীযুত কেসি সাহেবের চিঠি আমার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি আমাকে তাঁহার মেলবোর্ণের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং এখানকার ট্রেজারী ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুত ম্যাক্‌ফার্লেন মহাশয়ের নিকট আমাকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যে চিঠি দিয়াছেন তাহার একটি নকল পাঠাইয়াছেন। প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে যখন

কনজার্ভেটিভ পার্টির হাতে এ দেশের মন্ত্রিত্ব ছিল তখন কেসি মহাশয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন। দাম্‌লে মহাশয় টেলিফোনে আমার আগমন-বার্তা প্রয়োজনীয় আপিসগুলিতে জানাইয়া দিলেন। স্থির হইল ট্যাক্স বিভাগের পি. এস. ম্যাক্‌গভর্ণের সঙ্গে ঐ দিনই দেখা হইবে এবং পরদিন মারে-রিভার কমিশনের সি. জে. টেটাজ এবং ট্রেজারী সেক্রেটারী ম্যাকফার্লেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।

পার্লামেণ্ট ভবনের দুইটি হাতায় দুইটি বাড়ীর মধ্যে সরকারী খাস দপ্তরগুলি অবস্থিত। বাড়ী দুইটি উত্তর ব্লক ও দক্ষিণ ব্লক নামে পরিচিত। পার্লামেণ্ট ভবন একতলা। কিন্তু দপ্তর দুইটি দোতলা। পার্লামেণ্ট ভবনেব পিছনে একটি টিলা। এই টিলার উপর ভবিষ্যতে বড করিয়া নূতন পার্লামেণ্ট ভবন নির্মিত হইবে। পি. এস. ম্যাকগভর্ণ ও এল. টম্‌সন মহাশয়দ্বয়ের সহিত নানাবিধ আলাপ আলোচনা কবিয়া এবং পড়িবার জন্য কয়েকখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

এখানে ৬টা হইতে ৭টা পর্যন্ত নৈশ ভোজনের সময়। ৭টার পর কর্মচারিগণের ছুটি। খাদ্যের ও পরিবেশনের ব্যবস্থা ভালই। অভাবের কোন চিহ্ন নাই। একই টেবিলে পরস্পর অপরিচিত লোকেরা খাইতেছে।

এখানে দেখিতেছি সকলেই বেশ আলাপী। খাবার টেবিলে বা খাবার পর লাউঞ্জে অনেকেই আলাপ করিতে

আসেন। হোটেলে কয়েকজন সাংবাদিক আছেন। তাঁহারা প্রায়ই নানা বিষয়ে আলাপ করেন। অনেকেই "শ্বেত অষ্ট্রেলিয়া" নীতি সম্বন্ধে আমার মতামত জানিতে চাহেন।

অষ্ট্রেলিয়া বিরাট দেশ। ইহার আয়তন ২৯,৭৪,৫১৪ বর্গ মাইল অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ। ইহার জনসংখ্যা মাত্র ৭৫ লক্ষ অর্থাৎ বর্তমানে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলের জনসংখ্যা অপেক্ষা কিছু বেশী। জনবসতি সমুদ্রোপকূলে সীমাবদ্ধ। দেশের অভ্যন্তরে জনবসতি নাই বলিলেই হয়। মাত্র চার-পাঁচটি শহরে দেশের প্রায় অর্ধেক লোকের বাস। সিডনিতে ১১ লক্ষ, মেলবোর্ণে ১০ লক্ষ, ব্রিজবেনে ৫ লক্ষ, এডিলেডে ৩ লক্ষ, এবং পার্থে ২ লক্ষ লোকের বাস। বাংলাদেশে চাষাপ্রতি ৩।৪ একর জমি, আমেরিকায় চাষাপ্রতি ৩।৪ শত একর জমি ; আর এখানে চাষাপ্রতি ৩।৪ হাজার একর জমি। অষ্ট্রেলিয়ায় জলের বড় অভাব। জলাভাবে দেশের অভ্যন্তরে চাষের প্রসার সম্ভব হয় নাই। কোথাও জল এত অল্প যে পশুপালনও সম্ভব নয়। 'মেরিনো' জাতীয় মেষ আবিষ্কারের ফলে এদেশের বহু স্বল্পজল স্থানে মেষপালন সম্ভব হইয়াছে। এই জাতীয় মেষগুলি খায় কম ; দেখিতে কৃশ। কিন্তু ইহাদের লোম ঘন ও লম্বা। গম, ফল এবং পশম অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান পণ্য।

১৩ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ৯টায় মারে-রিভার কমিশনের আপিসে গেলাম। টেটাজ মহাশয় আমাকে সাদরে স্বাগত

করিলেন। তাঁহার নিকট 'মারে' নদীর বিশদ বিবরণ শুনিলাম। 'মারে' এদেশের বৃহত্তম নদী। ১৬০০ মাইল লম্বা। ডার্লিং, মরুমবিজ ও গুলবার্ণ ইহার প্রধান উপনদী। ইহাদের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৭৬০ মাইল, ১০৫০ মাইল এবং ২৮০ মাইল। ভিক্টোরিয়া রাজ্যের অন্তর্গত 'গ্রেট ডিভাইড' পর্বতমালা হইতে এই নদীগুলি উদ্ভূত। উৎপত্তিস্থল হইতে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার সীমানা পর্যন্ত মারে নদী নিউ সাউথ ওয়েলসের সীমানা নির্দেশ করিতেছে। তারপর সাউথ অষ্ট্রেলিয়ার ভিতর দিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে। এই স্বল্পজল দেশে নদীর জল লইয়া রাষ্ট্রত্রয়ের মধ্যে প্রথম হইতেই বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন থাকায় বিবাদের মীমাংসা দুরূহ ছিল। ১৯০১ সালে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিবাদ-মীমাংসার পথ সুগম হইল। তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে জলের যথাযথ বণ্টন কবিবার জন্যই রিভার মারে কমিশনের সৃষ্টি। জলের প্রধান ব্যবহার সেচের জন্য। নদীটিকে মোহানা হইতে এচুকা পর্যন্ত নাব্য রাখাও কমিশনেব কর্তব্য। যাহাতে ন্যূনতম জলের দ্বারা এই নাব্যতা সম্পাদনের কার্য নির্বাহ হয় তজ্জন্য বাঁধ ও দরজা প্রভৃতি নির্মাণ করা হইয়াছে। নদী যেখানে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে সেখানে ভিক্টোরিয়া হ্রদ অবস্থিত। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার ব্যবহারের জন্য বৎসরে অন্ততঃ একবার এই হ্রদটিকে জলে ভর্তি করিয়া দেওয়া কমিশনের কর্তব্য। ভিক্টোরিয়া

রাষ্ট্রে অবস্থিত 'হিউম্' বাঁধ মারে নদীর সর্বাপেক্ষা বড় বাঁধ। সেখানে সম্প্রতি জলশক্তির দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা চলিতেছে। কমিশন নিজে কোন নির্মাণ-কার্যাদি করেন না। কমিশনের অনুমোদন লইয়া রাষ্ট্রগুলি স্ব-স্ব এলাকায় নির্মাণ-কার্য করিয়া থাকেন।

টেটাজ মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ শেষ করিয়া ১১টায় সেক্রেটারিয়েটে আসিয়া ট্রেজারী সেক্রেটারী ম্যাকফার্লেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। ম্যাকফার্লেন আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ঐদিন সমুদয় রাষ্ট্রের ট্রেজারী সেক্রেটারীগণ ক্যানবেরায় উপস্থিত ছিলেন। সাড়ে এগারটায় তাঁহাদের সম্মেলন হইবার কথা। ম্যাকফার্লেন আমাকে ঐ সম্মেলনে লইয়া গিয়া সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। কুইন্স্ল্যাণ্ড, নিউ সাউথ ওয়েলস্, ভিক্টোরিয়া, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া ও টাস্মানিয়ার ট্রেজারী সেক্রেটারীগণ প্রত্যেকেই আমার অভিজ্ঞতার কথা, বিশেষতঃ আমেরিকাব কথা শুনিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন এবং প্রত্যেকেই আমাকে স্ব-স্ব রাষ্ট্রে নিমন্ত্রণ করিলেন। অতি সংক্ষেপে আমার মার্কিন মুলুকের অভিজ্ঞতার কথা ইহাদের নিকট বিবৃত করিলাম। আমি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান দেখিবার জন্য এদেশে আসিয়াছি 'কমন্ওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশন' তাহাদের মধ্যে প্রধান। শুনিলাম 'কমন্ওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশন' আগামী সপ্তাহে টাসম্যানিয়ার রাজধানী হোবার্টে ট্যাসম্যানিয়া সরকারের

দরখাস্ত শুনিবেন। টাসম্যানিয়া সরকারের তিন জন প্রতিনিধি ক্যানবেরার এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ট্রেজারী সেক্রেটারী এইচ. ডি. রবিন্‌সন, ইকনমিষ্ট কে. জে. বিন্‌স্ এবং ব্যবহারজ্ঞ আর. জি. অস্‌বোর্ণ। কমন্‌ওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশনের কার্য দেখিবার আকর্ষণে ইহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

ঐ দিন সন্ধ্যায় ডাম্‌লেদের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ হোটেল হইতে বাহির হইলাম। এখানে রাস্তায় বাহির হইলেই ট্যাক্সি মিলে না। এক জন ট্যাক্সিব্যবসায়ী আছে। তাহার দোকানে পূর্ব হইতে সংবাদ দিয়া রাখিলে সময়মত যথাস্থানে ট্যাক্সি পাওয়া যাইতে পারে। বাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। রাস্তা জনশূন্য। বাস আসিতে দেরী হইতেছে। জনৈক ভদ্রলোক নিজের মোটরে যাইতেছিলেন। আমার পাশ দিয়া যাইবার সময় সহসা গাড়ী থামাইয়া আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনাকে কোথাও পৌছাইয়া দিতে পারি কি?" আমি গন্তব্যস্থানের ঠিকানা বলিলাম। তিনি আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন, "আমি আপনাকে দেখিয়াই বুঝিলাম যে, আপনি বাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। শহর হইতে দশ মাইল দূরে আমার বাড়ী। সেখানে আমার চাষ-বাসের ব্যবস্থা আছে। আমি অনেক শূকর পুষি। একবার এক জন ভদ্রলোকের নিকট অনেক শূকরের মাংস বেচিয়াছিলাম। সে কারবারে আমার বেশ লাভ

হইয়াছিল।” আমি ভাবিতেছিলাম ভদ্রলোকের ভদ্রতার কথা। ভদ্রলোক আমাদিগকে ডাম্‌লেদের গৃহের অদূরে নামাইয়া দিয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া চলিয়া গেলেন। জনশূন্য রাস্তায় বাড়ীর নম্বর দেখিতে দেখিতে গৃহটি খুঁজিয়া বাহির করিলাম। বহুদিন পর লুচি-তরকারি ও ভাত খাইলাম। ডাম্‌লে-গৃহিণী এদেশে গৃহস্থালীর সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। এখানে ঝি-চাকর পাওয়া যায় না। তিনি ভারতবর্ষ হইতে একটি লোক সঙ্গে আনিয়াছেন। সে-ই রান্না করিয়াছে। খাদ্যদ্রব্য সব সামনে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। নিজেরাই বাঁটিয়া খাইলাম। রেডিওতে দিল্লী কেন্দ্রের হিন্দী গান শুনিলাম। ডাম্‌লে গৃহিণীর আতিথেয়তায় আপ্যায়িত হইয়া হোটেলে ফিরিলাম।

১৪ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার আপিসে বসিয়া ডাম্‌লের সাহায্যে আমার অষ্ট্রেলিয়ার প্রোগ্রাম স্থির করিলাম। এখানে দেখিতেছি হোটেলে স্থান পাওয়া কঠিন ব্যাপার। সোমবার হোবার্টে যাইতে হইবে। সেখানকার হোম-সেক্রেটারী আমার জন্য হোটেলে স্থান সংগ্রহ করিতে না পারিয়া দুঃখ করিয়া তার করিয়াছেন। শেষে কি হোটেলের অভাবে আমার প্রোগ্রাম ব্যাহত হইবে? পরাঞ্জপে মহাশয়ের মাদ্রাজী সেক্রেটারী আয়েঙ্গারের এক বন্ধুর বাড়ী হোবার্টে। তাঁহার পরিবার হোবার্টে থাকে। সেই ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ীতে তার করিয়া আমার জন্য হোটেল খুঁজিতে অনুরোধ জানাই-

লেন। স্থির হইল আমি হোবার্টে স্থান না পাইলে এডিলেড যাইব। এডিলেডে স্থানপ্রাপ্তির আশা পাওয়া গেল। সেখান হইতে মেলবোর্ণ হইয়া পুনরায় ক্যানবেরায় আসিব। তারপর সিডনি হইয়া কলিকাতা ফিরিব। ডাম্‌লে মহাশয় সাত দিনের ছুটি লইয়া সমুদ্র-তীরে বেড়াইতে যাইতেছেন। সিডনির হোটেলে ঐ দিনই সিট ঠিক করিয়া রাখা হইল। মেলবোর্ণে হোটেল মিলিল না। সেখানে হোটেলের জন্য ক্যানবেরা ট্রেজারী সেক্রেটারীকে অনুরোধ করিতে হইল। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করিতে গিয়া টাকা বা অসুবিধার কথা তিনি যেন না ভাবেন।

আমাকে কাজ করিতেই হইবে। দামী হোটেলে কিংবা অসুবিধাজনক হোটেলে আমার আপত্তি নাই। যাহা পান তাহাই যেন বিনা দ্বিধায় তিনি আমার জন্য স্থির করেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার মদের দোকান বন্ধের সময় সম্বন্ধে সিডনিতে গণভোট গৃহীত হইবে। বর্তমানে সন্ধ্যা ছ'টায় দোকান বন্ধ হয়। এক দল রাত্রি পর্যন্ত দোকান খোলা রাখিতে চান। কাগজে ইহা লইয়া খুব বাদবিতণ্ডা ও প্রচার চলিতেছে। যাঁহারা রাত্রি পর্যন্ত দোকান খোলা রাখিতে চান তাঁহারা বলিতেছেন যে এখন ছ'টায় দোকানে অসম্ভব ভিড় হয়। পরে আর মদ পাওয়া যাইবে না বলিয়া ঐ সময় লোকে মাত্রাতিরিক্ত রূপে মদ পান করে। কাগজ পড়িয়া মনে হইতেছিল যেন প্রায় সকলের মতেই রাত্রি পর্যন্ত

দোকান খোলা রাখা উচিত। কিন্তু গণভোটের ফল যখন প্রকাশিত হইল তখন দেখা গেল ছ'টায় দোকান বন্ধ করার দল বহু ভোটে জিতিয়াছে। এদেশে মদ্যপানের বহর যেন একটু বেশী দেখিতেছি।

শনিবার হোটেলের লাউঞ্জে বসিয়া পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার ট্রেজারী সেক্রেটারীর সহিত নানা বিষয়ে আলাপ হইল। পার্থে যাইবার জন্য ইনি বার বার আমাকে অনুরোধ করিলেন। দুঃখের সহিত আমাকে এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে হইল। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার বহু বিষয়ে ইহার সহিত আলোচনা হইল। ইনি বলিলেন, "সিডনির চেয়ে ভারতবর্ষ আমাদের বেশী কাছে। যুদ্ধের সময় পার্থ হইতে কলম্বো পর্যন্ত একটি বিমান চলিত। সিডনি পৌছিতে যত সময় লাগে তার চেয়ে কম সময়ে তখন কলম্বো যাওয়া যাইত।" ভদ্রলোক আরও বলিলেন, "এদেশে অল্প লোকের বাস। বহু দূরে দূরে ছড়ান। সিডনি বা মেলবোর্ণের স্বার্থ পার্থের স্বার্থ হইতে ভিন্ন। সেই জন্য ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গীও বিভিন্ন। ফেডারেশন হইতে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়াকে পৃথক করিয়া দিবার জন্য সেখানকার বহু লোক যুদ্ধের পূর্বে বিলাতের হাউস অব লর্ডসের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। হাউস অব লর্ডস এ বিষয়ে কিছু করিতে পারেন কি না তাহা অবশ্য তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই।" কেসি সাহেবের কথা উঠিল। এক জন অষ্ট্রেলিয়ান ভারতবর্ষে কিরূপ লাটগিরি করিয়াছেন সেকথা এদেশে আমাকে

অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাঁহার শাসনকালে বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের কিরূপ তীব্রতা ছিল এবং সেজন্য তিনি কতদূর দায়ী, অনেকেই আমাকে এ প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 'কেসি' মহাশয়ের বিরোধী দলের লোকের সংখ্যাও কম নয়।

শনিবার আয়েঙ্গারের বন্ধুর বাড়ী হইতে তার আসিল যে, হোবার্টে কোন হোটেলেই স্থান নাই। তবে আমার আপত্তি না থাকিলে 'হলিডিন' নামক 'গেষ্ট-হাউসে' তিনি আমার জন্য স্থান সংগ্রহ করিতে পারেন। আমার অবশ্য আপত্তির কারণ ছিল না। গেষ্ট-হাউস শুনিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে, কাহারও বাড়ীতে গেষ্ট হিসাবে থাকিতে হইবে। পরে দেখিয়াছিলাম 'হলিডিন' হোটেলই। তবে এখানে মদ পরিবেশন করা হয় না। মদ বিক্রয়ের লাইসেন্স বিহীন হোটেল এখানে 'গেষ্ট-হাউস'রূপে পরিচিত।

১৭ই ফেব্রুয়ারী সোমবার সকালে ট্রেজারীতে ম্যাকফার্লন ও তদীয় ডেপুটি 'ওয়াটের' সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিলাম। বেলা ২টা ১৫ মিনিটে হোটেল ত্যাগ করিলাম। আমার বড় থলিটি হোটেলের দারোয়ানের হেফাজতে রাখিয়া গেলাম। ওভার-কোটটিও রাখিয়া যাইব স্থির করিয়াছিলাম। দারোয়ান বলিল, "টাসম্যানিয়া পাহাড়ে দেশ। সেখানে এ সময়েও বেশ ঠাণ্ডা পড়িতে পারে। ওভার-কোটটি সঙ্গে রাখাই ভাল।" তাহার উপদেশমত ওভার-কোটটি সঙ্গে লইয়া যে ভালই করিয়াছিলাম তাহা পরে বুঝিয়াছিলাম।

বেলা ৩টা ১০ মিনিটে বিমান উড়িল। বনাবৃত পর্বত-শ্রেণীর উপর দিয়া উড়িতেছি। বন্ধুরগাত্র ভূমির রূপ কমনীয়, যেন সুকোমল ভেলভেটে মোড়া। ৫টা ২০ মিনিটে মেলবোর্ণ বিমান-ঘাটিতে বিমান নামিল। এখান হইতে দ্বিতীয় বিমানে হোবার্টে যাইতে হইবে। টাসম্যানিয়া অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত একটি দ্বীপ। দ্বীপের অভ্যন্তরভাগ পর্বতসঙ্কুল। সেখানে জন-বসতি নাই বলিলেই হয়। উত্তর ও দক্ষিণ উপকূলে কিছু জন-বসতি আছে। হোবার্ট শহর দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে।

মেলবোর্ণের বিমান-ঘাটিটি বেশ বড়। প্রায়ই বিমান নামিতেছে ও উড়িতেছে। হোবার্ট-গামী বিমানে ৭টায় বিমান-ঘাটি ত্যাগ করিলাম। সুসজ্জিত শহরের উপর দিয়া উড়িয়া ৭টা ২৫ মিনিটে অন্তরীপ ছাড়িয়া সমুদ্রে পড়িলাম। প্রথমে তু-একটা ছোট ছোট বালির চর। তারপর দিগন্তব্যাপী নীল জল। সন্ধ্যার পূর্বে দেখা গেল আকাশে অপরূপ মেঘের সজ্জা। আকাশের রূপ কোথাও মেদিনীপুরের পাহাড়-প্রস্তর-সঙ্কুল প্রান্তরের মত, কোথাও যেন অযুত হস্তীর শোভাযাত্রা। দূরে ভারত মহাসাগরে সূর্যদেব অস্তগমন করিতেছেন। ভারত-মাতা তখনও জ্যোতির্ময়ী। তাঁহার শিরোভূষণের জ্যোতি যেন তখনও পশ্চিম-দিগন্ত ভেদ করিয়া ঈষৎ দেখা যাইতেছে। ভাবিতেছি কলিকাতায় এখন বেলা প্রায় ৩টা। গৃহিণীগণ নিজ

নিজ গৃহে বিশ্রাম করিতেছেন। পুরুষেরা কর্মস্থলে। এখানে কিন্তু ক্রমশঃ "অন্ধকার নেমে আসে চোখে, চোখের পাতার মত।" অন্ধকারে সব একাকার হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইয়া পড়িয়াছে। চারদিক নিস্তব্ধ। কেবল বিমানের একটানা গর্জন শুনা যাইতেছে। সহসা অনন্ত-অন্ধকার মহাসাগরে জ্যোতিষ্কসমবায়ের মত হোবার্টের আলোকমালা নয়নপথে পতিত হইল। রাত্রি ৯টা ২৫ মিনিটে এরোড্রোমে নামিয়া ১০টায় হোটেলে পৌছিলাম। ডারওয়েন্ট নদীর সেতুর উপর দিয়া নগরে প্রবেশকালে পর্বত-বন্ধুর শহরের আলোক-সজ্জা পরম রমণীয় দেখাইতেছিল।

১৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রবিন্‌সন, অসবোর্ণ ও বিন্‌সের সহিত ট্রেজারীতে মিলিত হইলাম। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে 'হোটেলে জায়গা পাওয়া যাইবে না' বলিয়া যে তার গিয়াছে তাহা পাইয়া আমি আর আসিব না। আমার জন্য হোটেলে স্থান সংগ্রহ করিতে না পারায় তাঁহারা লজ্জিত ছিলেন। আমি আসিব না ভাবিয়া দুঃখিতও হইয়াছিলেন। সহসা আমাকে দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। আমি 'হলিডিনে' আছি শুনিয়া বিন্‌স বলিলেন, "হলিডিন মন্দ জায়গা নয়। তবে আমাদের আপিস হইতে আপনার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট হোটেলেই স্থান খোঁজা হইয়াছিল, এখন এখানে ভ্রমণকারীদের বড় ভিড়। সে হোটেলে স্থান পাওয়া অসম্ভব।" ঐ দিনই কমনওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশনের শুনানী আরম্ভ হইবে। প্রধান

মন্ত্রী কমিশনের সভ্যগণকে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করিবেন। সেই ভোজে আমারও নিমন্ত্রণ হইল। পার্লামেণ্ট ভবনের হল ঘরে এই ভোজের ব্যবস্থা। সেখানে প্রধান মন্ত্রী রবার্ট কস্‌গ্রোভের সহিত আমার আলাপ হইল। তিনি যথারীতি কমিশনের সভ্যবৃন্দ ও উপস্থিত মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারিগণের সহিত আমাব পরিচয় করাইয়া দিলেন। ভোজ-সভায় জন পনর ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী আমাকে বলিলেন, "শুনানী শেষ করিয়া কমিশন আমাদের হাইড্রো-ইলেকট্রিক সংক্রান্ত কাজগুলি দেখিবার জন্য টাসম্যানিয়ার অভ্যন্তবে সফর কবিবেন। আমবা তাঁহাদের সফরের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনি যদি তাঁহাদেব সহিত যোগ দেন তবে বিশেষ আনন্দিত হইব।" কমিশনের সহিত ভ্রমণের প্রস্তাবে আমি সানন্দে সম্মত হইলাম। ভোজ-সভায় শিক্ষামন্ত্রী আমার পাশে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে টাসম্যানিয়া সর্বাপেক্ষা অগ্রণী। 'এরিয়া স্কুল'গুলি আমাদেব বিশেষত্বপূর্ণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এই স্কুলগুলির শিক্ষাপদ্ধতির বিশিষ্টতা সুধীগণের প্রশংসা পাইয়াছে। আপনার একটি এরিয়া স্কুল দেখিবার সময় হইবে কি?"

আমি বলিলাম, আগামী কাল ও পরশু (বুধ ও বৃহস্পতিবার) কমিশনের শুনানী চলিবে। শনিবার কমিশনের সহিত একত্রে সফরে বাহির হইতে হইবে। শুক্রবারে আমি

মুক্ত। যদি ঐ দিনে দেখা সম্ভব হয় তবে অবশ্যই আমি সাগ্রহে আপনাদের এরিয়া স্কুল দেখিতে যাইব।

ভোজনান্তে কমিশনের শুনানী আরম্ভ হইল। সর্বপ্রথম প্রধান মন্ত্রী কমিশনের নিকট তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিলেন। তার পর বিভাগীয় অধিকর্ত্তাগণ স্ব স্ব বিভাগ সম্বন্ধে বলিলেন। কমিশনারগণ তাঁহাদিগকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী বুধবার স্থানীয় সংবাদপত্র 'মারকারী'তে এই শুনানীর বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইল। খুব বড় অক্ষরে এই বিবরণীর এইরূপ শিরোনামা ছাপা হইয়াছিলঃ "অষ্ট্রেলিয়ান অর্থ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের ঔৎসুক্য"। বিবরণীর প্রথমেই বড় হরফে এই শুনানীতে বর্তমান লেখকের উপস্থিতির কথা বলা হইয়াছিল। শুনানীর শেষ দিনে কস্‌গ্রোভ মহাশয় টাসম্যানিয়ার একখানি ভূচিত্রাবলী কমিশনের সমক্ষে উত্থাপিত করিলেন। এক একটি মানচিত্রে দেশের এক একটি সম্পদ বা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মানচিত্রসমূহ রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার বিশেষ সহায়ক। কমিশন এগুলির খুব তারিফ করিলেন, বলিলেন, "অষ্ট্রেলিয়ার কোন রাষ্ট্রে তাঁহারা এইরূপ মানচিত্র দেখেন নাই।" কস্‌গ্রোভ মহাশয় আমাকে কয়েকখানি মানচিত্র উপহার দিলেন। আমি একখানি গ্রহণ করিয়া বলিলাম, "বেশী দিতে হইলে কলিকাতা পাঠাইবার ভার আপনাকেই লইতে হইবে।"

অষ্ট্রেলিয়ায় ছয়টি রাষ্ট্র। তন্মধ্যে কুইনস্‌ল্যাণ্ড, নিউ সাউথ

ওয়েলস্ এবং ভিক্টোরিয়া সমৃদ্ধিশালী। টাসম্যানিয়া, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া জনবিরল এবং শিল্পসম্পদে পশ্চাৎপদ। শেষোক্ত রাষ্ট্রত্রয় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্য ব্যতীত অচল। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য-বিতরণ ব্যবস্থা ন্যায়-প্রতিষ্ঠ করিবার জন্যই কমনওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশনের সৃষ্টি।

কোন রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় সরকারেব নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলে কেন্দ্রীয় সরকার দরখাস্তটি কমিশনের নিকট প্রেরণ করেন। কমিশন যথোচিত অনুসন্ধান কবিয়া তাঁহাদেব সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইয়া দেন। কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে প্রার্থী রাষ্ট্রকে সাহায্য প্রদান করেন। এ বিষযে কমিশন কতিপয় সুনির্দিষ্টনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কমিশনের মতে যদি কোন রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের তুল্য করভার বহন করিবার দায়িত্ব লয় তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনহিতকর কার্যেও অন্যান্য বাষ্ট্রের ন্যায়ই তাহার সমানাধিকার। রাষ্ট্র কিরূপ করভার বহন করিবে বা কিরূপ জনহিতকর কার্য করিবে সে বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণেই শুধু কমিশনের সূত্র প্রয়োগ করা হয়। প্রার্থী রাষ্ট্রের করভাব কম থাকিলে সাহায্য কম হয় এবং করভার বেশী থাকিলে সাহায্য বেশী হয়। সেইরূপ জনহিতকর কার্যের ব্যয় অন্যান্য রাষ্ট্র অপেক্ষা বেশী থাকিলে সাহায্য তদনুপাতে কম হয় এবং কম থাকিলে সাহায্য

তদনুপাতে বেশী হয়। রাষ্ট্রের কর্মকুশলতা অনুসারেও সাহায্য কম-বেশী করা হয়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই কমিশন এদেশে কাজ করিতেছেন। এ পর্যন্ত ইঁহাদের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রার্থী রাষ্ট্র নির্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছে।

মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার কমিশনের শুনানী চলিল। দুই বেলা শুনানীতে উপস্থিত রহিতেছি আর বৈকালে শহরে বেড়াইতেছি।

হোবার্ট শহর ডারওয়েন্ট নদীর তীরে; সমুদ্র হইতে ১৪ মাইল দূরে। অদূরে ৪১৬৬ ফুট উচ্চ ওয়েলিংটন পর্বত। পাহাড়ের গায়ে ও উপত্যকার সমভূমিতে সহরটি অবস্থিত। নদীর উভয় পার্শ্বে এবং সমভূমিটুকুর তিন দিকেই পাহাড়। শহরটি নদীর পশ্চিম পারে। নদী বাঁকিয়া মাঝে মাঝে শহরের ভিতরে চলিয়া আসিয়াছে—স্থলভাগ যেন দুই বাহু বাড়াইয়া নদীর মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। উপকূলভাগ কয়েক স্থলেই এইরূপ শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদের মত বক্র। হোবার্ট বন্দর একটি শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়। পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ অনায়াসে এখানে আসিতে পারে। প্রকৃতির রমণীয় নিকেতনে এই শহরটি অবস্থিত। গাছপালা ঘনসবুজ। রকমারি ফুল। গ্লাডিয়োলা ফুল বড সুন্দর। পাইন জাতীয় ছোট ছোট গাছ নানা রূপে ছাঁটিয়া কেহ বাড়ীর প্রাচীর তৈরি করিয়াছেন। কেহ নানারূপ তোরণ নির্মাণ করিয়াছেন। আকাশ পরিষ্কার, বাতাস বিশুদ্ধ। আবহাওয়া সুখকর।

পর্বতক্রোড়ে প্রশস্ত নদীতীরে প্রকৃতির লীলা-কুঞ্জে ছবির মত সুন্দর শহর হোবার্ট। শহরের জনসংখ্যা ৭২০০০। বিকালে বেড়াইতে নদীর উপরকার পুলে যাইতাম। ইহা একটি 'পণ্টুন' সেতু। সেতুটি বেশ সুন্দর। ইহাব উপব হইতে শহবেব দৃশ্য পরম রমণীয়। শহরেব অনেকে আমাকে বলিত, "এত বড় 'পণ্টুন' সেতু পৃথিবীতে আর নাই। আমি কলিকাতার পুরাতন হাওড়ার পুলের কথা বলিয়া সবিনয়ে প্রতিবাদ জানাইয়াছি।

এখানে বড় রাস্তার উপর সবকারের টুরিষ্ট ডিপার্টমেণ্টের আপিস। ভ্রমণকারীদের সবপ্রকার সংবাদ সরবরাহ করা এবং তাহাদেব জন্য নানাদিকে যাতায়াতের বন্দোবস্ত করা এই আপিসেব কায। গ্রীষ্মকালে মনোরম টাসম্যানিয়ায় ভ্রমণ-কারীদেব বড় ভিড়।

বুধবাব শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট হইতে চিঠি পাইয়া তাঁহার আপিসে গেলাম। তাঁহার সহকারী হিউসের সঙ্গে আলাপ হইল। ঠিক হইল হিউস শুক্রবার সকালে আমাকে একটি এরিয়া স্কুলে লইয়া যাইবেন। সকাল ৮টায় রওনা হইয়া সন্ধ্যায় ফিরিব। পরদিন গ্রাণ্টস্ কমিশনের সহকারী সেক্রেটারী ফরেষ্টার আমার সহযাত্রী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ফরেষ্টার পক্বকেশ হইলেও যৌবনোচিত সজীবতায় সবদা প্রফুল্ল এবং সদালাপী।

২০শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অসবোর্ণ আমাকে নৈশ

ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন, সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। অসবোর্ণ-গৃহিণী সাদরে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহার রন্ধন তখনও শেষ হয় নাই। মাঝে মাঝে রান্নাঘরে যাইতেছিলেন। সস্ত্রীক এটর্ণী জেনারেল বা আইন মন্ত্রী এবং গ্রাণ্টস্ কমিশনের সভ্যত্রয়ও এই ভোজে নিমন্ত্রিত ছিলেন। তাঁহারা আমার পরেই আসিলেন। অসবোর্ণের দশ-এগার বৎসরের এক পুত্র বাহিরে খেলিতেছিল। ছেলেটির ম্যাজিকে বড় ঝোঁক। আমি ভারতবর্ষের লোক শুনিয়াই সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "আপনি দড়ির খেলা জানেন?" তাহার মাতা হাসিলেন। বুঝাইয়া দিলেন যে, দড়ির খেলাটি গল্পমাত্র। ছেলেটির কল্পনায় ভারতবর্ষ ম্যাজিকের দেশ। তাহার জানা দুই-একটি ম্যাজিক আমাকে দেখাইবার জন্য সে খুব ব্যস্ত হইল। একটি ম্যাজিক বেশ ভালই দেখাইল। একটি রবারের নলের মধ্য দিয়া একটি সুতা চালাইয়া দিল। সুতার দুই প্রান্ত নলের দুই দিক দিয়া ঝুলিতে লাগিল। ছেলেটি তখন কাঁচি দিয়া নলটি কাটিয়া দুই টুকরা করিয়া ফেলিল। কিন্তু সুতাটি অখণ্ডই রহিয়াছে। আমরা সকলেই তাহার প্রশংসা করিলাম। ছেলেটি উৎসাহী ও বুদ্ধিমান্। যথাসময় ভোজন সুরু হইল। অসবোর্ণ-গৃহিণী পরিবেশনও করিতেছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে আহার করিতেও বসিয়াছিলেন। তাঁহার কর্মপটুতা ও রন্ধন-কুশলতার প্রশংসা করিলাম।

রাত্রি প্রায় ১১টায় অসবোর্ণদের নিকট বিদায় লইয়া

আমরা সকলে একত্রে বাসে ফিরিলাম। এটর্ণী জেনারেল ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে হোটেলে পৌছাইয়া দিবার ভার লইলেন। এটর্ণী জেনারেল যুবক। গ্রাণ্টস কমিশনের সভ্য অধ্যাপক উড্ তাঁহার পূর্বপরিচিত। তিনি অধ্যাপকের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আইন ব্যবসা ছাড়িয়া নূতন রাজনীতিতে আসিয়াছি। আইন ব্যবসা ভালই চলিতেছিল। কিন্তু রাজনীতির বিচিত্র গতি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।" বাস হইতে নামিয়া ভদ্রলোক ও তাঁহাব স্ত্রী আমার সঙ্গে হোটেলের দরজা পর্যন্ত আসিলেন। দেখিলাম দরজা বন্ধ। ভদ্রমহিলা হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই। যেরূপেই হোক আপনাকে ঘরে ঢুকাইয়া যাইব। না হয় জানালা বাহিয়াই উঠিব।" অনুসন্ধানে দেখা গেল একটা দরজা খোলা আছে। আমাকে 'ভিতবে ঢুকাইয়া' তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার এরিয়া স্কুল দেখিতে যাইব। প্রাতরাশের পর পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে হিউস্ ও ফরেষ্টারের সঙ্গে মিলিত হইলাম। হিউস-পত্নী আমাদের সঙ্গে যাইবেন। তাঁহাকে তাঁহার গৃহ হইতে গাড়ীতে তুলিয়া লওয়া হইল। হিউস্-পত্নী ভারতবর্ষের কথা তুলিলেন। সোৎসাহে বলিলেন, "আমার ঠাকুর্দা ভারতবর্ষে রেল-কর্মচারী ছিলেন। পূর্ববঙ্গের কোন এক শহরে তাহার কর্মস্থল ছিল। আমার এক ভাই (সহোদর নহে) এখনও ভারতবর্ষে রেলের কাজে নিযুক্ত আছেন। (স্বামীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) এই

ব্যক্তিটির জন্যই আমার ভারতবর্ষে যাওয়া হয় নাই। পিতার সঙ্গে ভারতবর্ষে যাইবার জন্য আমি প্রস্তুত এমন সময়ে ইনি আমাকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন।"

ফরেষ্টার বলিলেন, "আমার এক ভগিনী গারো পাহাড়ে মিশনরী জীবন যাপন করিতেছেন।"

হিউস্-পত্নী আমাকে স্ত্রী ও পুত্রকন্যার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তাহাদের ফটো দেখিতে চাহিয়া আমার নিকট তাহাদের ফটো নাই শুনিয়া নিরাশ হইলেন।

আমরা এরিয়া স্কুল দেখিতে জীবষ্টোন গ্রামে যাইতেছি। জীবষ্টোন হোবার্ট হইতে ৩৪ মাইল। ওয়েলিংটন পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠিতেছি। আঁকা-বাঁকা রাস্তা। দূরে ডারওয়েণ্ট নদী দেখা যাইতেছে। আরও উপরে উঠিবার পর বহু দূরে সমুদ্র দেখা গেল। সমুদ্র পুনঃ পুনঃ চোখে পড়িতেছে ও আড়ালে যাইতেছে। চারিদিকে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে অফুরন্ত ইউক্যালিপ্টাস বা গাম গাছের জঙ্গল। পাইন, ফার এবং ওক গাছও যথেষ্ট। মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ ঝোপ। তাহাতে ছোট ছোট লাল ফল পাকিয়া আছে। কোথাও মেয়েরা সেই ফল পাড়িয়া লইতেছে। সেগুলি দ্বারা নাকি জেলি প্রস্তুত করিবে। হুয়নভিল নামক একটি গ্রাম পথে পড়িল। এই গ্রামে একটি স্কুল আছে, স্কুলের বাড়ীটি সুন্দর, তখনও স্কুল বসে নাই। হিউস্ সেখানে গাড়ী থামাইয়া চারিদিক ঘুরাইয়া দেখাইলেন। দূরে চারদিকেই পাহাড়।

অদূরে হুয়ন নদী—স্বচ্ছতোয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী। নদীর উপরকার সুন্দর একটি সেতু অতিক্রম করিয়া ওপারে গেলাম। অনেক দূর পর্যন্ত নদীব ধারে ধারে চলিলাম। পথের পাশে মাঝে মাঝে আপেলের বাগান। বড় বড় আপেলের বাগিচা-গুলি দেখিতে বড় মনোরম। আপেল পাকিবার সময় হইয়া আসিয়াছে। এক একটা গাছ যেন আপেলের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে লাল টুকটুকে ফলগুলি দেখিতে বড়ই লোভনীয়। বেলা সাড়ে বারটায় জীবষ্টোনে পৌছিলাম।

প্রধান শিক্ষক স্কুলের পাশেই সপরিবারে বাস করেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন হইয়াছে। ভোজনে বসিলাম। স্কুলের মেয়েরা রান্না করিয়াছে। তাহাদেব মধ্যে দুই জন পবিবেশন করিল। সস্ত্রীক প্রধান শিক্ষক এবং কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী আমাদের সঙ্গে আহার করিলেন। ভোজনান্তে প্রধান শিক্ষক আমাদিগকে ক্লাসে লইয়া গেলেন। পব পর তিনটি ক্লাস দেখিলাম। চৌদ্দ-পনের বছরের ছেলে-মেয়েবা পড়া দিতেছিল। ছয়-সাত বছরের ছেলেমেয়েরা কাগজ কাটিয়া বাড়া বানাইতেছিল। বাড়ীগুলি আমাদিগকে দেখাইবার জন্য তাদের বিশেষ উৎসাহ। আট-নয় বছরের ছেলেমেয়েরা ভূমণ্ডলের ম্যাপ আঁকিতেছিল। প্রধান শিক্ষক আমাকে প্রত্যেক বেঞ্চের কাছে লইয়া গেলেন। আমি নিকটে যাইতেই শিশুগণ "এই ভারতবর্ষ" বা "এই কলিকাতা" বলিয়া

নিজেদের অঙ্কিত মানচিত্রে সোৎসাহে আমাকে ভারতবর্ষ বা কলিকাতার অবস্থান দেখাইতেছিল। এতটুকু ছেলেমেয়েরা ভূমণ্ডলের মানচিত্র আঁকিয়াছে দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। অঙ্কন মোটামুটি ভালই হইয়াছে। আমার প্রশ্নের জবাবে তাহারা মানচিত্রের উপর অন্যান্য জায়গাও দেখাইল। প্রধান শিক্ষক বলিলেন, "আমি কাল ইহাদের বলিয়াছিলাম যে কলিকাতা হইতে এক জন ভদ্রলোক তোমাদের দেখিতে আসিতেছেন। তোমরা যদি তাঁহাকে তাঁহার দেশের কথা বলিতে না পার তবে তিনি তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন। বাইরে কয়েকটি ছেলে কোদাল দিয়া খেলার মাঠ পরিষ্কার করিতেছিল। কোথাও ছেলেরা ছুতার মিস্ত্রীর কাজ করিতেছে, কোথাও লোহারের কাজ চলিতেছে, কোথাও বা চামড়ার কাজ চলিতেছে। মেয়েরা সেলাই শিখিতেছে। তাহাদের রান্না ও পরিবেশন তো পূর্বেই দেখিয়াছি। কাঠের কাজের শিক্ষক সগর্বে বলিলেন তাঁহার একটি ছাত্র কয়েকদিন পূর্বেই হোবার্টে একটি বড় দোকানে বেশ ভাল মাহিনায় কাঠের কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিলাম। ভদ্রলোকের নানা বিষয় বেশ জানাশুনা আছে। বলিলেন, "আমরা দেখিয়াছি যে অধিকাংশ ছেলেই স্কুল ছাড়িয়া চাষবাস বা অন্য ব্যবসায়ে চলিয়া যায়। কলেজে খুব কম ছেলেই যায়। কাজেই স্থানীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়াই এই এরিয়া স্কুলের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। শহরের

এরিয়া স্কুলে অন্যান্য বিষয় শেখান হয়। এখানে আমরা গৃহনির্মাণ শিখাই, কংক্রিটের কাজ শিখাই, কাঠের কাজ শিখাই। মেয়েরা রান্না শেখে, শেলাই শেখে। ইহারা পরিণত বয়সে যেরূপ জীবন যাপন করিবে তাহার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করিয়া তোলাই এরিয়া স্কুলের আদর্শ। স্থানীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়াই ইহাদিগকে আমরা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করি।"

হিউস্ প্রধান শিক্ষককে বলিলেন, "আপনাদের দেশে আসিয়া ইনি স্বহস্তে একটি পাকা আপেল তুলিতে পারিলেন না—ইহাই আমার আপশোষ।"

প্রধান শিক্ষক—"এবার দুর্বৎসর, ফসল দেরীতে হইয়াছে। অন্যান্য বার এতদিনে আপেল পাকিয়া যায়। কিন্তু এবার একটিও পাকে নাই।"

স্কুল-প্রাঙ্গণে অনেকটা সমতল ভূমি। দূরে চারদিকে পাহাড়, বড় বড় ইউক্যালিপটাস গাছ। নানারূপ ফুল গাছ। কতকগুলি বাবলা গাছের মত গাছ দেখিলাম। নাম ওয়াটাল। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যখন ভারতবর্ষের 'বাণিজ্য-যুদ্ধ' সুরু হইয়াছিল তখন শুনিয়াছিলাম যে চামড়া ট্যান করিতে ওয়াটাল গাছের ফলের প্রয়োজন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাই ভারতবর্ষকে এই ফল সরবরাহ করিত। এদেশের খেলা-ধূলা সম্বন্ধে অলোচনা হইল। এখানে নাকি এক পক্ষে ১৮ জন লইয়া ফুটবল খেলা হয়।

বৈকালে সকলে মিলিয়া চা-পান করিয়া ৪টায় জীবষ্টোন ত্যাগ করিয়া ৬টায় হোবার্টে পৌঁছিলাম।

পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারী শনিবার প্রাতরাশের পর হোটেলের পাওনা চুকাইয়া দিয়া বসিয়া আছি। সরকারী হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক কারখানাগুলি পরিদর্শনার্থ রওনা হইতে হইবে। রবিনসন গ্রাণ্টস্ কমিশনের সভ্যগণকে লইয়া আমাকে হোটেল হইতে তুলিয়া লইবেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। আমি গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। দুইটি মোটর গাড়ীতে আমরা আট জন। কমিশনের তিন জন সভ্য, সেক্রেটারী, সহকারী সেক্রেটারী, রবিনসন, হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক কমিশনের চেয়ারম্যান এবং আমি। এ. ডব্লু. নাইট হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিকের সভাপতি। ইনি আমাদের অভিযানের নেতা ও পথপ্রদর্শক। ট্রেজারী সেক্রেটারী রবিনসন সরকারের পক্ষে দলের তত্ত্বাবধায়ক। এ. এ. ফিট্‌জিরাল্ড গ্রাণ্টস্ কমিশনের সভাপতি। ইনি এদেশের একাউন্ট্যাণ্ট সভারও সভাপতি। অধ্যাপক জি. এল. উড দ্বিতীয় সভ্য। ইনি মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। অপর সভ্যের নাম জে. জে. কেনেলি। ইনি পার্থের অধিবাসী। ইহারা সকলেই প্রৌঢ়-বয়স্ক। কমিশনের সেক্রেটারী এম্. রিচার্ডসন। ইনি পক্ক-কেশ বৃদ্ধ। সহকারী সেক্রেটারী ফরেষ্টার পূর্বদিন আমার সঙ্গে জীবষ্টোন গিয়াছিলেন। এ দেশের অভ্যন্তর-ভাগ পার্বত্য

মালভূমি। ৩৩০০ ফুট উচ্চে একটি বড় হ্রদ আছে। হ্রদটি ২০ মাইল লম্বা ও ১৪ মাইল চওড়া। ইহার নাম গ্রেট লেক। এত উচ্চে এত বড় হ্রদ বিদ্যুৎ-শক্তির একটি বিরাট আধার-বিশেষ। এখান হইতে জল নামাইয়া লইয়া পথে যেখানেই একটা খাড়া পাহাড় পাওয়া যায় সেখানেই পর্বতশীর্ষ হইতে সবেগে নিপতিত জলস্রোতের সাহায্যে পর্বতমূলে টারবাইন চালাইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হইয়া থাকে। টারবাইন ঘুরাইয়া দিয়া জলরাশিকে খাল দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়। পরে ঐ জলের অবতরণ-পথে আবাব যখন একটি খাড়া পাহাড পড়ে তখন সেখানে ঐ জলের দ্বারাই আবার একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র চালান হয। এইরূপে এই হ্রদের জলের দ্বাবা শ্যানন্ ও ওয়াডামালা নামক দুইটি স্থানে দুইটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে।

গ্রেট লেক ভিন্ন লেক সেণ্ট ক্লেযার নামে আব একটি হ্রদও এই পাহাড়ের উপর অবস্থিত। তাহার জলের দ্বারা টেরেলিয়া কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। বাটলার্স গর্জ নামক স্থানে অপর একটি কারখানা স্থাপিত হইতেছে। এই কেন্দ্রটিও সেণ্ট ক্লেয়াবের জলে চলিবে।

এই সমস্ত জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ একটি কমিশনের হস্তে ন্যস্ত। নাইট এই কমিশনেব সভাপতি। কমিশন প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতেছেন। ইহাদেব বিদ্যুৎ-উৎপাদন-প্রচেষ্টা অফুরন্ত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। ভবিষ্যতে সমুদ্রের

তলা দিয়া তার চালাইয়া এখান হইতে ভিক্টোরিয়া রাষ্ট্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার কথাও কেহ কেহ চিন্তা করিতেছেন। টাসম্যানিয়ায় উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি টাসম্যানিয়ার তথা অষ্ট্রেলিয়ার একটি বড় সম্পদ।

আমরা শনিবার সেন্ট ক্লেয়ারের কেন্দ্রগুলি এবং রবিবার গ্রেট লেকের কেন্দ্রগুলি দেখিব। সোমবার হোবার্ট ফিরিব এবং ফিরিয়াই আমি মেলবোর্ণ অভিমুখে রওয়ানা হইব।

শনিবার প্রাতঃকালে হোবার্ট ত্যাগ করিয়া দুই গাড়ী বোঝাই হইয়া চলিয়াছি। এক গাড়ীতে রবিনসন, উড, ফরেষ্টার ও আমি। আমার সহযাত্রীরা সকলেই সদালাপী। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া ডার ওয়েন্ট নদীর তীর ধরিয়া চলিয়াছি। সুন্দর দিন। সুন্দব দৃশ্য। দুই-এক স্থানে ধূসর এবং কৃষ্ণ হংসশ্রেণী দেখিলাম। ববিনসন ভারতবর্ষেব কথা তুলিলেন। উড বলিলেন, "আজকের কাগজ দেখিয়াছেন কি? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ওয়াভেলের স্থলে মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতবর্ষের বড়লাট নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ১৯৪৮-এর ১৫ই জুনের মধ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।"

আমি—"যতদূব জানি ওয়াভেলের উপব ভারতবর্ষের কংগ্রেস-নেতাদের বেশ আস্থা ছিল। তবে ভারতবর্ষে এখন দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে।"

রবিনসন তাঁহার বাল্যকালের কথা তুলিলেন। বলিলেন, "আমার পিতা আফগান-যুদ্ধে সেনাপতি লর্ড রবার্টসের এক জন

সহকর্মী ছিলেন। আমার জন্ম হয় টাসম্যানিয়ায়। কিন্তু জীবনের প্রথম চার বৎসর আমি ভারতবর্ষে অতিবাহিত করি। কান্দাহার, রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর প্রভৃতি শব্দ তখন আমাদের পরিবারে সর্বদাই শুনিতে পাইতাম।"

একটু ভাবিয়া বলিলেন, "এখনও বোধ হয় দু-চারিটি হিন্দুস্থানী কথা স্মরণ করিতে পারি। সহস্। বাবুর্চি। খিদ্‌মদ্‌কার। ঠিক বলিতেছি ত?"

একটু থামিয়া সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিলেন, "আর যে দু'-একটা কথা মনে পড়িতেছে সেগুলি বোধ হয় গালাগালি। যেমন, শূয়ারকা বাচ্চা। একবার ভারতবর্ষে যাইয়া আমার বাল্যস্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা আছে।"

হোবার্ট হইতে প্রায় দশ মাইল আসিয়া পড়িয়াছি। অদূরে চকোলেট, কোকো প্রভৃতি প্রস্তুতকারক ক্যাডবেরী কোম্পানীর কারখানা। কারখানাটির চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর; নিকটে ক্লিয়ার মণ্ট শহর। পাশ দিয়া আড়াই ফুট গেজের রেলগাড়ী চলিয়াছে। পরে বেয়া শহর। সেখানে অষ্ট্রেলিয়ান নিউজ প্রিণ্ট মিল অবস্থিত। এখানে প্রচুর খবরের কাগজ প্রস্তুত হয়। কাছেই নিউ নরফোক শহর। পরে গ্রেটনা গ্রীন ও হ্যামিলটন নামক দুইটি গ্রাম অতিক্রম করিলাম। এ সব স্থানের দৃশ্য ও আবহাওয়া নাকি স্কটল্যাণ্ডের মত। মাঝে মাঝে হুপ্‌স বৃক্ষের কুঞ্জ ও বড় আপেল-ক্ষেত। একটি গৃহস্থের বাড়ী সুদীর্ঘ পপ্‌লার বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা ঘেরা। বৃক্ষ-

শ্রেণী যেন ব্যূহবদ্ধ হইয়া উন্নত শিরে পবনদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। শীর্ণা 'উজ' নদী পার হইয়া একটি চটিতে চা পান করিলাম।

পরে 'নাইভ' নদী পার হইলাম। তারপর রাস্তার দু'ধারে বিস্তীর্ণ বিরাটকায় ইউক্যালিপটাস্ বা গাম গাছের জঙ্গল আরম্ভ হইল। পাহাড়গুলিও এখন বড়। ক্রমশঃ জঙ্গলের চেহারা বদলাইল। এখন ওয়াট্যাল, সাসাফ্রাস ও ফার্ণ গাছই বেশী। মধ্যাহ্নে টেরেলিয়া শ্যালেটে উপস্থিত হইলাম। শ্যালেট অনেকটা আমাদের ডাক-বাংলো বা সার্কিট-হাউসের মত। এখানে 'ইওলো সাইপ্রাস্' বা স্বর্ণ-লতার বেড়া বড়ই মনোরম লাগিল। টেরেলিয়া শ্যালেট একটি খাড়া পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত। পাহাড়ের নীচে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কেন্দ্র—উপর হইতে ক্ষুদ্র কুটিরের মত দেখায়। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বাহির হইয়া পড়িলাম। সরিষা ফুলের মত একপ্রকার হলুদ ফুলে জঙ্গল ভর্তি। ক্রমশঃ বাটলার্স গর্জে উপস্থিত হইলাম। অদূরে লেক, সেণ্ট ক্লেয়ার। গর্জের ভিতর দিয়া জল সবেগে নামিতেছে। সেখানে একটি বাঁধ তৈরী হইতেছে। অদূরে পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া সেগুলিকে ক্রেনে করিয়া ট্রেনের মধ্যে ঢালিয়া রেলপথে একটি মিশ্রণকারী যন্ত্রের মধ্যে ঢালা হইতেছে। সেখানে কংক্রিট প্রস্তুত হইয়া যন্ত্রসাহায্যে বাঁধের উপর পতিত হইতেছে। এইরূপে কংক্রিটের বাঁধটি গাঁথিয়া তোলা হইতেছে। বাঁধটির

নাম নিউ ক্লার্ক বাঁধ। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সমস্ত দেখিলাম। পরে আবার টেরেলিয়ায় ফিরিলাম। সেণ্ট ক্লেয়ার হ্রদ হইতেই ডারওয়েণ্ট নদীর উৎপত্তি। বাটলার্স গর্জের নিকট হইতে ডারওয়েণ্টের জল টেরেলিয়া পর্যন্ত আনা হইতেছে। কাজেই ডারওয়েণ্ট এখানে ক্ষীণকায়া। জলের রকমারি বাহন। কখনও কংক্রিটের খাল, কখনও লোহার চোঙ, কখনও একুইডাক্ট এবং যেখানে জল উপরে উঠাইতে হইতেছে সেখানে 'ইনভার্টেড সাইফন'। এইরূপে জল টেরেলিয়ায় আনিয়া তত্রত্য খাড়া পাহাড়ের গা দিয়া ৮৫৫ ফুট নীচেকার শক্তিগৃহে প্রেরণ করা হইতেছে। টেরেলিয়ায় ফিরিয়া রাত্রে নীচে নামিয়া শক্তিগৃহ দেখিতে গেলাম। শ্যালেটের উচ্চতা ১৯৫৫ ফুট। যেস্থানে শক্তিগৃহ অবস্থিত তাহার উচ্চতা ১১০০ ফুট। জল পাহাড়ের মাথা হইতে ৮৫৫ ফুট নীচে পড়িতেছে। শক্তিগৃহে পাঁচটি টারবাইন। তিনটি চলিতেছে। টারবাইন ঘুরাইয়া দিয়া জল নামিয়া যাইতেছে। 'নাইভ' নদীর ভিতর দিয়া এই জলরাশি আবার ডারওয়েণ্টকে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে। রাত্রে শ্যালেটেই ঘুমাইলাম। এখানে বেশ শীত। ঘরে বিত্যুৎ-উত্তাপক জ্বালাইয়া রাখিতে হইল। ঐদিন মোট ৯৫ মাইল পথ চলিয়াছি। হোবার্ট হইতে 'উজ' ৫৫ মাইল। উজ হইতে টেরেলিয়া ২৫ মাইল। টেরেলিয়া হইতে বাটলার্স গর্জ ১৫ মাইল। বাটলার্স গর্জ হইতে টেরেলিয়া ফিরিতে এই ১৫ মাইল পথ দ্বিতীয়বার অতিক্রম করিয়াছি।

পরদিন রবিবার প্রাতরাশের পর বাহির হইয়া পড়িলাম। জনশূন্য বন্ধুর 'নাইভ' উপত্যকার ভিতর দিয়া চলিয়াছি। দূর হইতে একটি শিশু দৃষ্টিগোচর হইল। নিশ্চয়ই রাস্তার কোন চৌকিদার নিকটে ঘর বাঁধিয়া আছে। এ তাহারই শিশু। যে রাস্তা দিয়া চলিয়াছি, তাহার নাম 'মিসিংলিঙ্ক' বা হারানো যোগসূত্র। রাস্তাটি নাকি উত্তর ও পশ্চিম উপকূলগামী রাস্তাদ্বয়কে সংযুক্ত করিয়াছে। একটি সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়িলাম। ইহার নাম 'ওয়াইল্‌ড ডগ প্লেন্‌স' বা পাগলা কুকুরের সমভূমি। চারিদিকে পাহাড় ও জঙ্গল। জঙ্গলের মাঝখান দিয়া চলিয়াছি। প্রথমে ছোট ছোট পাইন গাছ, পরে বড় বড় ইউক্যালিপটাস বা গাম গাছের জঙ্গল। এই জঙ্গলে কতকগুলি মেষ চরিতেছে। ইউক্যালিপটাস জঙ্গলের যেন শেষ নাই। ঠিক যেন ঝাড়গ্রামের শালবনেব মত। লম্বা লম্বা গাছ সোজা উঠিয়া গিয়াছে; খুব মোটা ও সুগোল। দেখিতে বড় ভাল লাগে। গাছগুলিকে স্বল্পায়াসে মারিয়া ফেলিবার জন্য তাহাদের গোড়ায় আংটি কাটিয়া রাখা হইয়াছে। শিকড়গুলি মাটি হইতে যে রস টানিতেছে তাহা আর এই আংটির উপরে উঠিতে পারিতেছে না। ফলে গাছগুলি শুকাইয়া মরিতেছে। নগ্ন অনাহারক্লিষ্ট গাছগুলি পঞ্চাশের মন্বন্তরে লঙ্গরখানার সামনে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বাঙালীর মত হাত বাড়াইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এখানে ভূমি নীরস। মাটির সমস্ত রসটুকুই যদি গাম

গাছগুলি টানিয়া লয় তবে ঘাস জন্মায় না। ফলে মেষগুলি খাইতে পায় না। ঘাসের বৃদ্ধির জন্যই গাম গাছগুলিকে এভাবে মারিয়া ফেলা হইতেছে। গাছগুলিকে এত উপর হইতে নীচে লোকালয়ে লইয়া গেলে খরচ পোষায় না। তাই বড় বড় সুদৃশ্য গাছগুলিকে ধ্বংস করিবার এই স্বল্পব্যয়সাধ্য উপায় অবলম্বন করা হয়। জ্বালানি কাঠ করিবে সেরূপ লোকও এখানে নাই।

আমরা গ্রেট লেকের পার ধরিয়া শ্যানন শক্তিগৃহে পৌঁছিলাম। এখানে একটি শক্তিগৃহে তিনটি কল। শক্তি-গৃহটি খাড়া পাহাড়ের গোড়ায়। পাহাড়ের মাথা হইতে নলের সাহায্যে শক্তিগৃহে জল নামানো হইতেছে। চাকা ঘুরাইয়া দিয়া জল খাল দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে নাকি একটি নববিবাহিতা যুবতী স্বামীর সহিত 'মধুচন্দ্র' যাপনার্থ এখানে আসিয়া এই খালে পড়িয়া গিয়া সলিল-সমাধি লাভ করেন। লোকে এখনও সেকথা স্মরণ করে। এখানকার জল খাল দিয়া ওয়াডামানায় নীত হইতেছে। এখান হইতে আমরাও ওয়াডামানায় পৌঁছিলাম। তখন মধ্যাহ্নকাল।

ওয়াডামানা শক্তিগৃহটি একটি ক্ষুদ্র সমতল উপত্যকায় অবস্থিত। উপত্যকাটির চারিদিকই পাহাড়ে ঘেরা। সবুজ বৃক্ষশ্রেণী পাহাড়গুলির সানুদেশকে যেন ভেলভেটে মুড়িয়া রাখিয়াছে। এখানে দুইটি শক্তিগৃহ। একটিতে নয়টি

টারবাইন, অপরটিতে তিনটি। এখানে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। উপত্যকাটি বড় মনোরম। ভোজনের পর উপত্যকা-ভূমিতে অনেকক্ষণ পায়চারি করিলাম। সহসা দেখি একটি পাহাড়ের গায়ে একটি রামধনু লাগিয়া রহিয়াছে। মনে হইল আগাইয়া গেলে রামধনুটিকে হাত দিয়া ধরিতে পারিব।

ওয়াডামানা ত্যাগ করিয়া আমরা অপরাহ্ণে গ্রেট লেকের তীরে 'মিয়েনা' হোটেলে পৌঁছিলাম। হোটেলটি একতলা, পনর-ষোলটি ঘর। বারান্দার নীচেই দিগন্তবিস্তৃত হ্রদ। হ্রদের মধ্যে একটি ছোট পাহাড়। হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে একটি বড় বাঁধ। তাহার উপর ঘুরিয়া বেড়াইলাম। বাঁধটি ১১৮০ ফুট দীর্ঘ। বাঁধে চল্লিশ ফুট করিয়া সাতাশটি খিলান এবং পার্শ্বরক্ষার্থ এক শত ফুট গাঁথুনি আছে। এই বাঁধের ভিতর দিয়া হ্রদের জল শ্যানন শক্তিগৃহে নীত হইতেছে। এই স্থানে বহুলোক বঁড়শি দিয়া মাছ ধরিতে আসে। এই হোটেলটি ভ্রমণবিলাসীদের একটি বড় আড্ডা। বাঁধের ওপারে মাছের পোনা পালন করিবার কয়েকটি অগভীর পুকুর। সেখান হইতে এদেশে পোনা সরবরাহ করা হয়। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছোট ছোট পোনাগুলির সন্তরণলীলা দেখিলাম। হোটেলের বারান্দা হইতে হ্রদ, পাহাড় ও বাঁধের দৃশ্য পরম মনোজ্ঞ।

আমাদের জলবিদ্যুতের কাজগুলি দেখা শেষ হইয়াছে। কয়েক দিন যাবৎ সঙ্গীদের সঙ্গে একত্র ঘুরিয়াছি, একত্র

খাইয়াছি, একই গৃহে শয়ন করিয়াছি। রবিনসন, উড এবং ফরেষ্টার বড রসিক। পথে নানারূপ গল্প করিয়া আড্ডা বেশ জমাইয়া রাখিয়াছেন। মাঝে মাঝে সমস্বরে চীৎকার করিয়া গান ধরিয়াছেন। একবার যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের গান জুড়িয়া দিলেন। একবার আমার নামে গান রচনা করিয়া গাহিলেন। একবার একটি গান ধরিলেন, তাহার ভাবার্থ—

সে এত রূপ লইয়া জন্মিল কেন ?

সে আদৌ জন্মিল কেন ?

এই সব বিষয়ে উডই অগ্রণী। তাহার উৎসাহ অফুরন্ত।

রবিবার রাত্রে ভোজনের পর হোটেলের লাউঞ্জে জোর আড্ডা চলিল। উড দিবাভাগে একটি রস-রচনা লিখিয়াছেন। তিনি এই মৌলিক রচনাটি পাঠ করিলেন। আমাদিগের প্রত্যেককেই তাহার সমালোচনা করিতে হইল। দেখিলাম বৃদ্ধ ফিট্‌জিরালড এবং কেনেলিও কম রসিক নন। কেবল বৃদ্ধ সেক্রেটারী রিচার্ডসন বরাবর তাঁহার বয়সোচিত গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন আর নাইট সসম্ভ্রমে দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর হোটেল ত্যাগ করিয়া হোবার্ট অভিমুখে রওনা হইলাম। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া ছুটিয়াছি। পথে একটি ছোট শহরের মত গ্রাম। নাম বথওয়েল। এখানে ক্যাস্‌ল্‌ হোটেলে লঘু জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিপ্রহরে নিউ নরফোক শহরে পৌছিলাম। সেখানে

মধ্যাহ্ন-ভোজন করিলাম। ফরেষ্টারের সঙ্গে ক্যামেরা ছিল। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের ছবি লইতেছিলেন। আমাকে চারিটার মধ্যে হোবার্ট পৌছিতে হইবে। আমাদের গাড়ী মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরই ছাড়িবে। কমিশনের সভ্যগণ ঐ দিন নিউ নরফোকে থাকিয়া যাইবেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর রবিনসন ও আমি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিউ নরফোক হইতে রওনা হইলাম।

হোবার্টে পৌছিয়া প্রথমেই রবিনসনের সঙ্গে ট্রেজারীতে গেলাম। সেখানে বিন্‌স ও অস্‌বোর্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কানাডার অর্থ-বিভাগের কার্য দেখিতে বিন্‌স আগামী বৎসর অটোয়া যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহাকে অটোয়াব আপিসগুলির বিবরণ দিলাম, তত্রত্য কর্মচারিগণের নাম ও ঠিকানা দিলাম। পরে ইহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলাম এবং প্রধান মন্ত্রী কস্‌গ্রোভকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিয়া বিমানের নগরস্থিত আপিসে পৌছিলাম। বেলা চারটায় হোবার্ট হইতে বিমান-ঘাটির দিকে রওনা হইলাম। বিমানে টাসম্যানিয়ার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত উড়িয়া সমুদ্রে পড়িতে হইবে। বিমান হইতে টাসম্যানিয়ার অভ্যন্তরস্থ পর্বতসঙ্কুল মালভূমি ও তদুপরি গ্রেট লেক দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সমুদ্রের মধ্যে সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য দেখিলাম। পশ্চিম আকাশ পরিষ্কার। দিগন্তের একটু উপরে কোদালে মেঘের সজ্জা। কোদালে মেঘগুলি

যেন মণিমুক্তা-খচিত সোনার ঝালর। সূর্য ধীরে ধীরে সমুদ্র-গর্ভে অবতরণ করিলেন। নীচে নামিয়াও যেন আকাশের মেঘমালার পানে তাকাইয়া আছেন। মেঘমালা তখনও তাঁহারই অনুরাগের রঙে রঞ্জিত। ধীরে ধীরে মেঘের নীচেকার অংশ গাঢ় লাল হইল। রক্তিমাভা ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। অবশেষে মেঘ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। যেন তাহার উপর কেহ কালি লেপিয়া দিয়াছে।

বিমানে বসিয়া সংবাদপত্রে দেখিলাম, কেসী মহাশয় ব্রিটিশ সরকারের ১৯৪৮-এর ১৫ই জুনের পূর্বে ভারত-ত্যাগের সঙ্কল্প-ঘোষণার প্রশংসা করিয়াছেন। রাত্রি আটটায় মেলবোর্ণের হোটেলে পৌঁছিলাম। ক্যানবেরার ট্রেজারী ডিপার্টমেণ্ট আমার জন্য এই হোটেল ঠিক করিয়া সেকথা আমাকে টাসম্যানিয়ার ঠিকানায় জানাইয়া দিয়াছিলেন। হোটেলটির নাম 'হোটেল সিসিল'; শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

হোটেলে কেসি সাহেবের চিঠি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁহার আপিসে যাইবার জন্য আমাকে লিখিয়াছেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সকালে প্রাতরাশের পর সহর দেখিতে বাহির হইলাম। শহরটি সুন্দর। কেন্দ্রস্থলে মার্কিণ প্রথায় সমান ও সমান্তরাল সারি সারি রাজপথ। বাড়ীগুলি সাধারণতঃ পাঁচ ছয় তলা। ঘুরিতে ঘুরিতে চিড়িয়াখানায় উপস্থিত হইলাম। পাখীর ঘরটি খুব ভাল লাগিল; চঞ্চল পাখী

গুলির গায়ে রকমারি রঙের বাহার। অনেক প্রকারের কাঙ্গারু দেখিলাম। দুইটি জানোয়ার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি প্লাটাপুস্, অপরটি এচেগুন। প্লাটাপুস্ জীবজগতের ব্যতিক্রম। ইহা অণ্ডজ অথচ স্তন্যপায়ী। অণ্ডজ জীব যে স্তন্যপায়ী হইতে পারে তাহা ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ পূর্বে বিশ্বাস করিতেন না। অষ্ট্রেলিয়ান প্লাটাপুস্ একদিন বৈজ্ঞানিক-জগতে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। এচেগুন ছোট সজারুর মত। গায়ে কাঁটা ভর্তি। আয়তনে বিড়ালের মত। ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম জানোয়ারসমূহের অন্যতম। সন্ধ্যায় সমুদ্র-তীরে বেড়াইতে গেলাম।

তখন সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে; কিন্তু দিনের আলো ঈষৎ রহিয়াছে। বেলাভূমি পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত এবং প্রায় জনশূন্য। নগর-কর্তৃপক্ষ এখানে স্নানের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। সমুদ্রে অল্প অল্প ঢেউ। দু-এক জন স্ত্রী-পুরুষ সমুদ্রে স্নান করিতেছে। পূর্বে ও পশ্চিমে শহরের দুইটি হাতা সমুদ্রের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সহসা শহরের আলো জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল যেন বসুন্ধরা কাঞ্চনাভরণখচিত হাত দুইটি জননী সিন্ধুর পানে বাড়াইয়া দিল। জননী পা টিপিয়া পিছাইয়া যাইতেছেন। কিন্তু আনন্দে তাঁহার তরঙ্গবন্ধুর বক্ষ কাঁপিতেছে। উপরে পঞ্চমীর চাঁদ মিটি মিটি হাসিতেছে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী বুধবার কমনওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশন আমার সুবিধার্থে একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন

করিয়াছিলেন। ঐ দিন সকালে ও বিকালে তাঁহাদের আপিসেই কাজ করিলাম। কমিশন পূর্বদিন টাসম্যানিয়া হইতে ফিরিয়াছেন। বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহারা আমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সকালে কেসী সাহেবের আপিসে গিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি বাংলাদেশের খবর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইংরেজের ভারত-ত্যাগের সঙ্কল্প-ঘোষণাকে প্রশংসা করিলেন। আলাপান্তে বলিলেন, "আমরা গ্রামে থাকি। শহরে আমাদের একটি ছোট বাড়ী আছে। আমার স্ত্রী আজ সেখানে আসিয়াছেন, আপনি যদি বৈকালে আমাদের শহরের বাড়ীতে যাইতে পারেন তবে আমার স্ত্রী বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন।" আমি তাঁহার বাড়ীর ঠিকানা লইয়া হোটেলে ফিরিলাম। মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া অধ্যাপক উডের সহিত মিলিত হইলাম। তিনি তাঁহার সহ-কর্মিগণের সহিত আমাকে আলাপ করাইয়া দিলেন। পরে একটি বড় বইয়ের দোকানে লইয়া গিয়া অষ্ট্রেলিয়া সম্পর্কে কয়েকটি ভাল বইয়ের তালিকা দিলেন। বৈকালে কেসী সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কেসী-গৃহিণী ও কেসী মহাশয় আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সেখানে তাঁহাদের বঙ্গ-প্রবাসকালের সেক্রেটারী মিস্ প্যাট জ্যারেট উপস্থিত ছিলেন। কেসী-গৃহিণী বাংলাদেশের অনেকগুলি নারী-প্রতিষ্ঠানের কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

বলিলেন, তিনি এখনও তাহাদের কোন উপকারে আসিতে পারিলে কৃতার্থ হইবেন। আমাকে পানীয় প্রদান করিলেন। আমি মদমিশ্রিত কোন পানীয় গ্রহণ করিব না শুনিয়া তিনি যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কেসী সাহেব অরেঞ্জ কোয়াসের কথা মনে করাইয়া দিলে তিনি যেন থৈ পাইলেন। আমি অরেঞ্জ কোয়াস পান করিলাম। কেসী সাহেবের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্বন্ধে নানা বিষয়ে কথা হইল। কেসী পকেট হইতে একটি সুন্দর রেশমের রুমাল বাহির করিয়া বলিলেন, "বাংলার একটি জেলায় এগুলি তৈরি। এগুলি আমার বড়ই পছন্দ। আপনি যদি এরূপ দু'ডজন রুমাল তৈরি করাইয়া আমাকে পাঠাইতে পারেন তবে আমি বিশেষ উপকৃত বোধ করিব।" আমি স্বীকার করিলে নমুনা-স্বরূপ একটি রুমাল আমাকে দিলেন। গান্ধী, নেহরু ও জিন্নার কথা উঠিল। কেসী-গৃহিণী বলিলেন, "লাট-ভবনে আমাদের শ' তিনেক ভৃত্য ছিল। যখনই গান্ধী লাট-ভবনে আসিয়াছেন তখনই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিন শত ভৃত্য তাঁহার পদধূলি লইয়াছে। কিন্তু নেহেরু বা জিন্না যখন লাট-ভবনে আসিয়াছেন তখন কাহারও এরূপ আগ্রহ দেখি নাই। তবে কি নেহেরু বা জিন্না সেরূপ জনপ্রিয় নন?

আমি—"নেহেরু বা জিন্নার চেয়ে বেশী জনপ্রিয় নেতা ভারতবর্ষে নাই। তবে গান্ধীর কথা স্বতন্ত্র। গান্ধী শুধু জনপ্রিয় নেতা নন, তিনি তদপেক্ষা আরও বেশী কিছু।"

কেসী—"হাঁ, গান্ধী সাধারণের চক্ষে দেবতা।"

প্যাট জ্যারেট আমার নিকট একটি বিবৃতি চাহিলেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও কানাডা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতের, অষ্ট্রেলিয়ার এবং ভারত-অষ্ট্রেলিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কের কোন্ রূপ আমার চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে তাহা আমার নিকট জানিতে চাহিলেন। আমি স্বভাবতঃই প্রচার-পরাঙ্মুখ। কিন্তু কেসী সাহেবের আগ্রহাতিশয্যযুক্ত ইহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। স্থির হইল পরদিন সকাল ৮টায় প্যাট জ্যারেট বিবৃতি শুনিবার জন্য আমার হোটেলে যাইবেন।

সেদিন মেলবোর্ণে বেশ গরম পড়িয়াছিল। তাপ ৯৫° ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়াছিল। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় হোটেলে পার্থের জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি বলিলেন, "এখানে বায়ুর আর্দ্রতা বড বেশী। কাজেই অল্প গরমে বেশী কষ্ট হয়; ঘামও বেশী হয়। আমাদের পার্থে যখন তাপ ১১০° ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে তখনও এত কষ্ট হয় না। বরং গ্রীষ্মে আমরা বেশ স্ফূর্তিতে থাকি।" এদেশে এখন গ্রীষ্মকাল চলিতেছে। টাসম্যানিয়ায় গ্রীষ্মকালে তাপ ৮০° ডিগ্রীর উপরে উঠে না। মেলবোর্ণে তাপ সাধারণতঃ ৭০-৮০° ডিগ্রীর মধ্যে থাকে, কখন কখন ১০০° ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে। ক্যানবেরায়ও তাপ সাধারণতঃ ৮০° ডিগ্রীর নীচে থাকে। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় মাঝে মাঝে তাপ ১০০° ডিগ্রী ছাড়াইয়া যায়। কুইনসল্যাণ্ডের অবস্থাও তদ্রূপ। এখন পিচ ও পিয়ার ফল

পাকিয়াছে। এগুলি টিনে ভরিয়া সেখানকার লোকেরা চালান দেয়। চিনির কারখানায় ষ্ট্রাইক চলিতেছে। সেজন্য ফল টিনে পূরিবার কারখানাগুলি চিনি পাইতেছে না। হাজার হাজার টন ফল হয়তো এ জন্য নষ্ট হইয়া যাইবে।

ঐদিন রাত্রিতে খাইবার সময় এক ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত আলাপ হইল। ভদ্রলোক লিবাবেল পার্টির প্রচার-সচিব। কেসী সাহেব লিবারেল পার্টির একজন নেতৃস্থানীয় সভ্য। উপরোক্ত ভদ্রলোক কেসী সাহেব ও বাংলাদেশের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভদ্রলোক গৃহাভাবে সপরিবারে হোটেলে বাস করিতেছেন। বলিলেন, "এদেশে গৃহ-সমস্যা বড় কঠিন। সরকার কিছুই করিতে পারিতেছেন না। ইহুদীগণ শহরে আসিয়া বহু বাড়ী কিনিয়া ফেলিতেছে, এবং সেলামী প্রভৃতি লইয়া লোকের উপর জুলুম করিতেছে।" ভদ্রলোকের স্ত্রীর জ্যোতিষী বা ভবিষ্যদ্বক্তার উপর খুব আস্থা। ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষীগণের সুনাম তাঁহার কানে পৌঁছিয়াছে। তাঁহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি বলিলাম, "ভারতবর্ষে অনেক ভাল জ্যোতিষী আছেন। আবার অনেক ভণ্ড জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীও আছে। তবে জ্যোতিষীর কথার উপর আস্থা স্থাপন করিতে আমি আপনাকে পরামর্শ দিব না, তাঁহাদের নিকট ভবিষ্যৎ জানিয়া লইবার আগ্রহকেও আমি প্রশংসা করি না। অন্ধকার জীবনপথে চলিবার জন্য ভগবান মানুষকে একটি সুন্দর প্রদীপ

দিয়াছেন। সেটি তাহার বুদ্ধি। এই ভগদ্দত্ত প্রদীপের সাহায্যে পথ চলাই শ্রেয়ঃ। এই প্রদীপটি নির্বাণ হইলে বা ইহার উপর আস্থা চলিয়া গেলেই বিপদ।”

ভোজনান্তে এই দম্পতির সঙ্গে অনেক বিষয় আলাপ হইল। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে আমাকে নিজেদের ঘরে লইয়া গিয়া ইহাদের আট ও দশ বৎসর বয়সের কন্যা দুইটির সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিলেন। কন্যাদ্বয় কলিকাতার কথা শুনিয়াছে। কলিকাতার মানুষ দেখিয়া খুশি হইল।

পরদিন ২৮শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার প্রাতরাশের পর প্যাট জ্যারেট আসিয়া উপস্থিত। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁহার নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দিয়া হোটেল ত্যাগ করিয়া এরোড্রোমে পৌঁছিলাম। ক্যানবেরায় গিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন সম্পন্ন করিলাম।

ঐ দিন বৈকালে “হোটেল ক্যানবেরায়” ওয়াল্টার স্কট নামক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি এদেশের একজন বিখ্যাত কস্‌ট-একাউন্টেন্ট। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে থাকিবে কি না এই প্রসঙ্গে নানা আলাপ-আলোচনা হইল। স্কট বলিলেন, “আমাদের দেশে সর্বসাধারণের মনে ইংরেজের প্রতি একটা প্রীতির ভাব আছে। অন্য সব বিষয়ে আমাদের মতভেদ থাকিতে পারে ; কিন্তু ইংরেজদের জন্য সকলেরই মনে খানিকটা স্নেহ বিদ্যমান।”

আমি—“আমরাও ইংরেজ জাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সেক্স-পীয়র বা নিউটনের নামে সকল ভারতবাসীই মাথা নোয়ায়।

শুধু শাসক-ইংরেজের প্রতিই ভারত বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে। ভারতের শাসন-ব্যাপারে হস্তক্ষেপে বিরত হইলে ইংরেজের প্রতি ভারতবাসীর বিরূপ মনোবৃত্তির কোন কারণ থাকিবে না।”

স্কট—অবশ্য আপনারা যা ভাল বোঝেন তাহাই করিবেন। তবে আমার মনে হয় আপনারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে থাকিলেই ভাল হইত।

পরদিন ১লা মার্চ শনিবার। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় কয়েকজন অষ্ট্রেলিয়ার ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। ইঁহারা সাংবাদিক। ইঁহারাও ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইঁহাদের অজ্ঞতা সীমাহীন। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ইহাদের ভীতিমিশ্র বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ভারতবর্ষে টাটা কোম্পানীর মত বিরাট ইস্পাতের কারখানা আছে, অর্ধ ডজনের উপর এফ. আর. এস. আছেন, সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মনীষীরা আছেন। আমার প্রমুখাৎ এই সমস্ত সংবাদ শুনিয়া ইঁহারা বিস্ময় বোধ করিতেছিলেন। এক ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির নাম লিখিয়া লইলেন। এদেশে অবশ্য নোবেল প্রাইজ এখনও আসে নাই ; এবং এফ. আর. এস.-এর সংখ্যাও অনেক কম। ইংরেজের কথা উঠিল। ইঁহারা ইরেজের প্রতি খুব দরদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রতি এরূপ দরদ নাই কেন তার কারণ জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

আমি পূর্বদিন স্কটকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই ইঁহাদের

বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিলাম। কিন্তু তথাপি যেন ইঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না। আমি একটু বিরক্তি বোধ করিতেছিলাম। তখন এদেশের বড়লাট নিয়োগ লইয়া সংবাদপত্রে খুব আলোচনা চলিতেছিল। বর্তমান বড়লাট রাজার খুল্লতাত। তাঁহার স্থলে কুইনস্‌ল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীকে বড়লাট মনোনীত করা হইয়াছে। পূর্বে একবার মাত্র এদেশে একজন অষ্ট্রেলিয়ান বড়লাট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন হাইকোর্টের জজ। তাঁহার নিয়োগে সবাই খুশি হইয়াছিলেন। এবারকার মনোনয়ন লইয়া বড়ই বিতর্ক উপস্থিত। সকলেই অবশ্য অষ্ট্রেলিয়ান বড়লাট চাহেন। তবে দলগত ভিত্তিতে একজন সক্রিয় রাজনৈতিককে বড়লাট নিবাচন করায় অনেকেই আপত্তি করিতেছেন। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত কারয়া আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আপনারা তো ইংরেজের বড় ভক্ত। একজন মাত্র ইংরেজ ভদ্রলোক আপনাদের দেশে আছেন। তিনি রাজার খুল্লতাত, নিবিরোধী এবং শাসন-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করেন না। তথাপি আপনারা এই ভদ্রলোককে বরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না কেন বলিবেন কি ?"

তখন ইঁহারা বলিয়া উঠিলেন, "এটা অবশ্য আপনি আমাদিগকে ঠিকই শুনাইয়াছেন।"

সাম্রাজ্যের প্রতি ইঁহাদের মনোভাব যেন খানিকটা ভাবাবেগমূলক। নিউজিল্যাণ্ডেও নাকি এইরূপ। কানাডায়

কিন্তু এ বিষয়ে অনেক বেশী বিচারশীল মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছি। কানাডা স্বতন্ত্র সিটিজেনশিপ বা নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, প্রিভি কাউন্সিলে আপীল উঠাইয়া দিয়াছে। ইহাতে নিউজিল্যাণ্ডের একটি সংবাদপত্র আপশোস করিয়া লিখিয়াছিল, "আশা করা গিয়াছিল প্রাচীনতম ও বর্ধিষ্ণুতম ডোমিনিয়নটি সাম্রাজ্য-বন্ধন দৃঢ়তর করিতে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে। আমাদের এ আশা আজ ক্ষুণ্ণ হইল।" ইহার জবাবে আটোয়ার 'মর্ণিং জার্ণাল' (১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী) লিখিল, "আমাদের অক্‌ল্যাণ্ডের সহযোগীর রসবোধ কম বলিয়া মনে হইতেছে। আমরা সভা করিয়া আইন পাস করিয়া গম্ভীরভাবে প্রচার করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি কানাডায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহার পিতা এবং পিতামহ এদেশে জন্মিয়াছে সে নিজেকে কানাডীয় বলিতে পারিবে। আর আমাদের অক্‌ল্যাণ্ডের সহযোগী বলিতেছেন যে, ইহাতে সাম্রাজ্যের মূল ছিঁড়িয়া যাইতেছে। যাহার তিন পুরুষ কানাডায় জন্মিয়াছে সে নিজেকে কানাডীয় ভিন্ন আর কি বলিতে পারে ? আর প্রিভি কাউন্সিলের আপীল উঠাইয়া দেওয়ায় প্রিভি কাউন্সিল নিজে কোন আপত্তি করিলেন না, করিলেন অক্‌ল্যাণ্ডের 'হেরাল্ড'।"

ভারতবর্ষে কন্‌ষ্টিট্যুয়েণ্ট এসেমব্লি বা বিধান পরিষৎ যখন ভারতবর্ষে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঘোষণা করিল তখন আমি কানাডায়। ভারতবর্ষের এই

সিদ্ধান্তকে কানাডীয়গণ সম্রাজ্যের বাহিরে যাইবার সিদ্ধান্ত বলিয়াই প্রথমতঃ মনে করিয়াছিল। কিন্তু তথাপি কানাডীয়-গণ এই সিদ্ধান্তকে বেশ সহজভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। লণ্ডনের কোন কোন কাগজ লিখিয়াছিল যে, এই সিদ্ধান্ত আইনে অগ্রাহ্য। ইহাতে মন্ট্রিয়েলের 'ডেলি ষ্টার' (২৩শে জানুয়ারী ১৯৪৭) লিখিল, "প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন আইনের বিচারের মাপকাঠিতে তাহার ফলাফল নির্ধারণ আর সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষে আজ সেই মুহূর্ত উপস্থিত।" মন্ট্রিয়েলের গেজেট লিখিল, "আজ হইতে ভারতবর্ষ প্রাচ্যের অশ্বেতকায় জাতিগণের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা হইল। প্রাচ্যের এই জাগরণ বলপূর্বক দমন করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি দেশীয় নেতাগণ ন্যূনতম দায়িত্বজ্ঞান বজায় রাখিতে পারেন তবে ইহাদিগকে ডিমোক্রেসির পথে পরিচালিত করা এখনও সম্ভব।"

অষ্ট্রেলিয়ায় সাম্রাজ্যের প্রতি যে ভাবাবেগপূর্ণ মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত হয় তাহার বিশেষ কারণ আছে। অশ্বেতকায় জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত দেশসমূহের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া শ্বেতাঙ্গ-সভ্যতার অনতিসবল ঘাটি। জাপানের দ্রুত উন্নতি ইহারা সভয়ে দেখিয়াছে। জাপানের পতনে ইহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য জাতির দ্রুত উন্নতির উদাহরণরূপে জাপানের স্মৃতি এখনও ইহাদের ভয়ের কারণ। ইহাদের জনসংখ্যা মাত্র ৭৫০০০০০, অথচ শ্বেতাঙ্গ-সভ্যতার বিশিষ্টতা

বজায় রাখিতে ইহারা বদ্ধপরিকর। তাহাদের ধারণা অশ্বেতকায় জাতির লোকেদের দেশে অবাধ প্রবেশাধিকার দিলে শীঘ্রই তাহাদের সংখ্যাধিক্য হইয়া পড়িবে এবং ক্রমশঃ শ্বেতাঙ্গ-সভ্যতা দেশ হইতে লোপ পাইবে। দক্ষিণ আফ্রিকা আজ সংখ্যাগুরু অশ্বেতকায় জাতিদের লইয়া বিব্রত। তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে কত ব্যবস্থাই না অবলম্বন করিতে হইতেছে। এই সময়ে রাজারাণী দক্ষিণ আফ্রিকায়। ৩রা মার্চের মেলবোর্ণ হেরাল্ডে অষ্ট্রেলিয়ান এসোসিয়েটেড প্রেসের একটি সংবাদের মধ্যে পড়িলাম, "যখন দরিদ্র অশ্বেতকায় জাতির স্কুল মাষ্টার বাণ্ড্ সঙ্গীত পরিচালনা করে, তখন রাণী অবশ্য সহজ মধুর হাসিদ্বারাই তাহাকে পুরস্কৃত করেন। কিন্তু তিনি কি জানেন যে, তাঁহার এইরূপ ফটো প্রকাশ করা আইনে নিষিদ্ধ?"

আজ অষ্ট্রেলিয়ার উভয় সঙ্কট। সে অশ্বেতকায় জাতিকে অবাধ প্রবেশাধিকার দিয়া নিজের স্বার্থহানি করিবে? না, বর্ণবিদ্বেষ নীতি দৃঢ়তার সহিত অনুসরণ করিয়া অশ্বেতকায় জাতির শত্রুতা উদ্রেক করিবে? অষ্ট্রেলিয়ায় অবশ্য দ্বিতীয় পন্থায়ই চলিতেছে, কিন্তু ইহাতে তাহার নিজের মনে এখনও খট্‌কা আছে। তাই ভারতবাসী দেখিলেই ইহারা 'সাদা অষ্ট্রেলিয়া' নীতির দোহাই দেয়, 'সাদা সভ্যতার' ঘাটি বলিয়া নিজেদের না ভাবিয়া পারে না। এক দিকে পশ্চিম-ইউরোপ হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় স্থায়ী বাসিন্দা আমদানী করিবার

জন্য ইহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, অপর দিকে মরুবহুল অষ্ট্রেলিয়ায় অধিক লোকবসতির উপায় নাই বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। এই কারণেই অষ্ট্রেলিয়ার কল্পনায় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে একটি সক্রিয় শাসনব্যবস্থা প্রয়োজনীয়। কিন্তু কানাডা সাম্রাজ্যকে সম-রাজ্যরূপেই দেখিতে চায়। চীন ও ভারতবর্ষের প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার দৃষ্টি বিশেষ সজাগ। এই সময় একটি কাগজে লিখিল, "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সাম্রাজ্যের প্রশ্ন। অতএব অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য ডোমিনিয়নের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ইহার মীমাংসা করা উচিত। ব্রিটেন একা এবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে অন্যায় হইবে।" এই সময় একদিন পূর্বগোলার্ধের মানচিত্রে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংস্থান দেখিলাম। দেখিয়াই ভারতবর্ষের প্রতি অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মনোভাবের ব্যাখ্যা যেন পরিষ্কার হইয়া গেল। দেশমাতৃকার এমন রূপ ত পূর্বে কখনও দেখি নাই। ভারতমাতার "ভারত মহাসাগরের অধীশ্বরী" মূর্তি যেন অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল।

এই সময় দিল্লী হইতে এক সংবাদ প্রচারিত হইল যে, ভারত-সরকার ভারতীয়গণের অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে অষ্ট্রেলিয়া-সরকারের সহিত আলোচনা করিতে চান। ইহাতে 'সাদা অষ্ট্রেলিয়া' নীতি লইয়া এখানকার সংবাদপত্রে কিছু কিছু আলোচনা হইল। ১লা মার্চের 'ডেলি টেলিগ্রাফের' ম্যাগাজিন সেক্‌সনে এই সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ

বাহির হইল। লেখক তাঁহার প্রবন্ধ এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন—

"সেদিন জনৈক মার্কিন পর্যটক এশিয়ার বিরুদ্ধে প্রাচীর তুলিবার জন্য আমাদিগকে নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যে, 'সাদা অষ্ট্রেলিয়া নীতি' শান্তির অন্তরায়। ইহার উত্তরে আমরা বলিয়াছিলাম যে, ভদ্রলোকটি যে দেশের অধিবাসী সে দেশকে আমাদের মত এশিয়ার জনসংখ্যার চাপ অনুভব করিতে হয় না। কিন্তু বতমান শতাব্দীর শেষে যখন এশিয়ার জনসংখ্যা দুই শত কোটীতে দাঁড়াইবে এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হইবে তখন মার্কিন ভদ্রলোকেরাও কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়িতে পারেন। অবশ্য ততদিন যদি বর্ণসাঙ্কর্যের ভয়কে তাঁহারা জয় কবিযা ফেলিতে পাবেন তবে সেকথা স্বতন্ত্র।

তার পর লেখক বলিয়াছেন, একথা মানিতেই হইবে যে, 'সাদা অষ্ট্রেলিয়া নীতি' একটি বর্ণগত বাধা। আমরা অবশ্য বুঝাইতে চেষ্টা করি য়ে, সাদা অষ্ট্রেলিয়া নীতির মূলে কোন বর্ণগত প্রশ্ন নাই এবং ইহার কারণ অর্থনৈতিক। এশিয়ার কুলী আসিয়া অল্প মাহিনায় কাজ করিতে শুরু করিলে আমাদের জীবনযাত্রার মান নামিয়া যাইবে, শুধু এই ভয়েই আমরা সাদা অষ্ট্রেলিয়া নীতি অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু আমরা তো কুলী ও ধনীর মধ্যে প্রভেদ করি না। এশিয়ার জীবনযাত্রার মান যদি আজ উঁচুও হইত তবু আমরা সাদা

অষ্ট্রেলিয়া নীতি পরিত্যাগ করিতে পারিতাম না। ইহার কারণ সহজ। অষ্ট্রেলিয়ানগণ তাহাদের ইউরোপীয় রক্ত ও কৃষ্টি বিশুদ্ধ রাখিতে চায়। অন্যান্য শ্বেত জাতি অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়ানদের এই ভয় বেশী প্রকট; কারণ অষ্ট্রেলিয়ার ভৌগলিক অবস্থান প্রায় এশিয়ারই মধ্যে এবং অষ্ট্রেলিয়া ইউরোপীয় জাতির পৃথিবীব্যাপী শক্তিব্যূহের দুর্বলতম অংশ। সম্প্রসারণকামী এশিয়া নিজের ঘর গুছাইতে পারিলেই এই দুর্বল অংশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে। এক্ষণে ইউ-রোপীয়গণ আমাদের এই কথা শুনিয়া হাসিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচ্য জাতিগণ যে কত দ্রুত উন্নতি করিয়া ঘর গুছাইয়া শক্তি-সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতে পারে জাপান তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একদিন এই বিপদ সাদা জাতির আন্যান্য অংশও জানিতে পারিবে। তখন তাহারা বুঝিবে যে, সাদা অষ্ট্রেলিয়া নীতি শুধু ৭৫ লক্ষ লোকের খামখেয়ালপ্রসূত নয়, ইহা পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান অশ্বেতকায় জাতির পার্শ্বে পাশ্চাত্য জাতির অরক্ষিত অবস্থার প্রতীকমাত্র। অষ্ট্রেলিয়ার 'বর্ণনীতি'তেই এক দিন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শক্তিপরীক্ষা হইবে! শুধু বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জন্যই যে অষ্ট্রেলিয়া এশিয়ার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিবে তাহা নয়; অষ্ট্রেলিয়াকে ঘাটি করিয়াই ব্রিটিশ ও মার্কিন শক্তিচক্র ভূমণ্ডল পরিক্রমণ করিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং এশিয়ার অভ্যন্তরে যুদ্ধ চালাইবার সামর্থ্যও লাভ করিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি

যে, এই সুযোগ ও সুবিধা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিবেই তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ইংরেজ তাহার প্রাচ্যের সাম্রাজ্য ত্যাগ করিতে সুরু করিয়াছে। চীনকে পূর্বেই ছাড়িয়াছে; শীঘ্রই ভারত ত্যাগ করিবে। মালয়, বর্মা, ইন্দোচীন ও জাপান ক্রমশঃ পরিত্যাগ করা হইবে। এইরূপে একদিন শ্বেত জাতিকে হয়ত অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডও ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা পরম অপমানকর পরিণাম। কিন্তু অল্প শক্তি লইয়া এশিয়াকে দাবাইয়া রাখা এখন অসম্ভব। ইহা বুঝিতে পারিতেছে না বলিয়াই আজ পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সাহায্যে ভূমণ্ডলব্যাপী শক্তিব্যূহ প্রতিষ্ঠিত করিতেছে না।

ইহার পর প্রবন্ধকার বলিতেছেন, হয় তো একদিন মানুষের মনোভাব পরিবর্তিত হইবে। জনৈক দার্শনিক বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত একুশটি সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছে, তন্মধ্যে চৌদ্দটি কালপ্রভাবে বিলুপ্ত। সভ্যতার উৎপত্তি ও বিলোপের হার যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে পৃথিবী ধ্বংস হইবার পূর্বে আরও ১৫ লক্ষ সভ্যতার উদ্ভব হইবে। দুই শত বৎসর পরে ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ও নিউজিল্যাণ্ডে যে জাতিসমূহ বাস করিবে তাহারা হয়ত আর শ্বেতকায় থাকিবে না, হয়ত তাহাদের বর্ণ-সাঙ্কর্যের ভীতিও থাকিবে না; কিন্তু আমরা বিংশ শতাব্দীর মনোভাব লইয়াই চিন্তা করিতে পারি। বর্তমানে সাদা জাতির বর্ণসাঙ্কর্য-ভীতি, এশিয়া-ভীতি স্বকীয়

সভ্যতাপ্রীতি প্রবল। অপর পক্ষে এশিয়াও সাদা জাতিকে ভয় করে ; কিন্তু সে ক্রমশঃ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া সাদা জাতির এলাকায় নিজের প্রভাব সম্প্রসারিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া উঠিতেছে। সাদা জাতি যদি হটিয়া যায় তবে অশ্বেতকায় জাতির সম্প্রসারণ বাড়িয়াই চলিবে। পরে ইহা সাদা জাতির অসহ্য হইবে। ফলে যুদ্ধও অনিবার্য হইয়া উঠিবে।

সাদা জাতি এই সম্প্রসারণে বাধা দিতে চাহিলে শুধু ধাপ্পার উপর বেশী দিন বাধাপ্রদান চলিবে না। ধ্বংসকারী হিংসার হাত হইতে শ্বেতকায় জাতির বাঁচিবার একমাত্র উপায় পূর্বাহ্লেই শক্তিব্যূহ রচনা করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকা। শুধু প্রস্তুত থাকিতে পারিলেই অপর পক্ষ সাদা জাতিকে ঘাঁটাইতে সাহস করিবে না। যুদ্ধ দূরে সরিয়া পড়িবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে মানুষের মনোভাব পরিবর্তনের সময় পাওয়া যাইবে। সাদা অষ্ট্রেলিয়া নীতি এই প্রকার মনোভাবেরই প্রতীক। এই নীতির দায়িত্ব শুধু অষ্ট্রেলিয়ার নয—সমস্ত সাদা জাতির।

প্রথম বার যখন ক্যানবেরায় ছিলাম তখন আমার ছাতাটি হারাইয়া যায়। হোবার্টে গিয়া ছাতাটির কথা মনে পড়িল। মনে হইল ক্যানবেরার জেনারেল পোষ্ট আপিসে ফেলিয়া আসিয়াছি। জেনারেল পোষ্ট আপিসের মত স্থানে ছাতা ফেলিয়া আসিলে পুনরায় পাওয়া যায় তাহা ভাবিতেও পারি নাই। এবার আসিয়া সেখানে গিয়া ছাতার কথা জিজ্ঞাসা

করিতে জনৈক কর্মচারী ছাতাটি আমাকে দিয়া বলিলেন, "৭।৮ দিন ছাতাটি ঐ স্থানে পড়িয়াছিল। পরে আমরা ভিতরে আনিয়া রাখিয়াছি।" ছাতাটি পাইয়া যতটুকু আনন্দিত হইলাম, তার চেয়ে অনেক বেশী বিস্মিত হইয়াছিলাম।

এবার ক্যানবেরায় পরাঞ্জপ্যে মহাশয়ের কন্যা শকুন্তলা ও চার-পাঁচ বছরের নাতনীর সহিত আলাপ হইল। পরাঞ্জপ্যে মহাশয়ের খাস সেক্রেটারী ডাক্তার গোরে, তদীয় গৃহিনী ও পুত্র, প্রচার সচিব ডাম্‌লে ও তাঁহার গৃহিণী—ইহারা সকলেই এবার ক্যানবেরায় উপস্থিত ছিলেন। সপত্নীক ডাম্‌লেও ছুটির পর ক্যানবেরায় ফিরিয়াছেন। ইহাদের যত্নে ও আতিথেয়তায় দিনগুলি বেশ কাটিল। ট্রেজারীতে আমার কাজও দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল।

একদিন পরাঞ্জপ্যের গৃহে আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের রাষ্ট্রদূত কিয়ার্ণনের পত্নীর সহিত আলাপ হইল। দেখিলাম আইরিশে ও ভারতবাসীতে ব্রিটিশ-শাসনের কুফল সম্বন্ধে বেশ সহজ ভাবেই আলাপ করা চলে। ব্রিটিশের ট্যাক্স ফাঁকি দিবার জন্য আইরিশ যুবক চন্দ্রালোকে মদ চোলাই করিতে করিতে যে গানটি গাহিত তাহা পরাঞ্জপ্যের নাতনী সুন্দর শিখিয়াছে। গানটি সরল। ইহার ধুয়াটি এইরূপ :—"আমি ক্ষুধার্থ হইলে খাই, তৃষ্ণার্ত হইলে পান করি। হে চাঁদের আলো, তুমি যদি আমাকে বধ না করো, তবে আমি মৃত্যু পর্যন্ত বাঁচিব।"

কিয়ার্ণন-পরিবার ও আমি একই হোটেলে আছি। পরদিন

হোটেলে মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় কিয়ার্ণন-পত্নী তাঁহার স্বামী, কন্যা ও জামাতার সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিলেন।

একদিন পরাঞ্জপ্যের গৃহে বড় একটি পার্টি হইল। স্থানীয় মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং সমস্ত দেশের রাষ্ট্রদূতগণ এই পার্টিতে নিমন্ত্রিত ছিলেন। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনারের নিমন্ত্রণ হয় নাই। কারণ, সে দেশের সহিত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রগত সম্পর্ক কিছুদিন যাবৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই পার্টিতে অনেকের সহিত আলাপ-পরিচয় হইল। রুশ দূতাবাসের জনৈক যুবকের সহিত আলাপ করিলাম, বলিলাম "আপনার দেশের খাঁটি খবর পাওয়া বড়ই কঠিন। আমরা যে সমস্ত বই পাই তাহার অধিকাংশই প্রচারাত্মক।" ভদ্রলোক নীরব। কথাটি খুব পছন্দ করিলেন কিনা সন্দেহ হইল। তখন বলিলাম, "আপনাদের দেশের কিছু খাঁটি খবর পাই সর্বপ্রথম আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠিতে। তিনিই প্রথম আপনাদের সাফল্যের চিত্র আমাদের সাম্‌নে উপস্থিত করেন।" ভদ্রলোক উৎফুল্ল হইলেন। বলিলেন, "হাঁ, রবীন্দ্রনাথের কথা আমি জানি। তিনি যখন রাশিয়ায় যান তখন আমি বালক। আমাদের ভাষায় তাঁহাব সমস্ত বইয়ের অনুবাদ হইয়াছে।"

একদিন পরাঞ্জপ্যের গৃহে রাত্রিতে আহার করিলাম। আমি ভিন্ন অপর চারিজন অতিথি ছিলেন—কেম্‌ব্রিজের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অধ্যাপক সার হ্যারল্ড জোন্‌স, এখানকার সরকারী

জ্যোতিষ-বিভাগের মার্টিন ও উলি এবং সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের উইলসন। জোন্‌স ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। সেখান হইতে এদেশে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কথা বলিলেন। পরাঞ্জপ্যে তাঁহার আমলের কেম্‌ব্রিজের কথা বলিলেন এবং জোন্‌সের নিকট কেম্‌ব্রিজের বর্তমান অবস্থার কথা আগ্রহের সহিত শুনিলেন।

একদিন গোরের বাড়ী এবং একদিন ডাম্‌লের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলাম। ডাম্‌লের বাড়ীতে এবারও একদিন নিমন্ত্রণ হইল। ভোজনের পর রেডিওতে দিল্লীর গান শুনিলাম। তারপর সবাই মিলিয়া এদেশের পার্লামেণ্টে গেলাম। তখন পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলিতেছিল। ছোট হল। সভ্যসংখ্যা বেশী নয়। অনেকেই অনুপস্থিত। বিরোধীদল বক্তৃতা করিতে-ছেন। সরকার-পক্ষের নিশ্চিন্ত ভাব। প্রধান মন্ত্রী চিফ্‌লীকে দেখিলাম। সভায় কোন ব্যস্ততা বা সজীবতা লক্ষ্য করিলাম না। খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া হোটেলে ফিরিলাম। ডাম্‌লে, শকুন্তলা, ডাম্‌লে-পত্নী স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান কবিলেন।

একদিন ডাক্তার গোরের সহিত এখানকার সামরিক বিদ্যালয় ডাণ্টরুন গেলাম। শহরের অদূরে সুন্দর জায়গায় কলেজটি অবস্থিত। ছোট ছোট কয়েকটি বাড়ী। প্রায় জনশূন্য। গোরে তাঁহার পুত্রকে এখানে ভর্তি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহারা রাজী আছেন, তবে ভারত-সরকারকে বলিতে হইবে যে, শিক্ষার পর ইহাকে ভারতীয় সৈন্যবিভাগে গ্রহণ করা

হইবে। এদেশের সৈন্যবিভাগে ইহাকে লওয়া সম্ভব নয়। যদি ভারত সরকারও ইহার ব্যবস্থা না করেন তবে ইহার শিক্ষা ব্যর্থ হইবে। সেইজন্যই ইহাদের এই সর্ত। নিউজিল্যাণ্ডের সামরিক শিক্ষাও এই কলেজে হয়।

৮ই মার্চ শনিবার সকালে ক্যানবেরা ত্যাগ করিয়া সিডনিতে 'হোটেল অষ্ট্রেলিয়ায়' আসিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন করিলাম। ১১ই মার্চ মঙ্গলবার সিডনী ত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিব। এখানে বিমানের টিকিট ও ডাচ্ 'ভিসা' সংগ্রহ করা ভিন্ন অন্য কোন কাজ নাই। বিমান ওলন্দাজ অধিকৃত স্থানের উপর দিয়া যাইবে বলিয়া তাহাদের 'ভিসা' প্রয়োজন। যে দু'দিন এখানে ছিলাম সান্ন্যাল ও সান্ন্যাল-পত্নীর আতিথেয়তা এবং যত্নে মুগ্ধ হইয়াছি।

সান্ন্যাল মহাশয় এখানে ভারতীয় নাবিকদের তত্ত্বাবধায়ক এবং কার্যতঃ ভারতীয় হাই কমিশনারের সিডনিস্থ প্রতিনিধি-স্বরূপ। তাঁহার পত্নী স্কচ, স্বামীকে ও স্বামীর দেশকে যথার্থই ভালবাসেন। সান্ন্যাল-গৃহিণী আমাকে ক্যানবেরায় পত্রদ্বারা ভোজনের ও থিয়েটার দর্শনের নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শনিবার বৈকালে সান্ন্যাল-দম্পতি আমার হোটেলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা শহরের উপকণ্ঠে তুরামুরা নামক স্থানে একটি হোটেলে থাকেন। স্থানটি আমার হোটেল হইতে ১০।১২ মাইল। তাঁহাদের সহিত তুরামুরা গিয়া ভোজনান্তে পুনরায় শহরে আসিয়া থিয়েটার দেখিলাম। থিয়েটারটির

নাম মিনার্ভা থিয়েটার। যে নাটকটি অভিনীত হইতেছিল তাহার নাম "মৃত ক্রাইষ্টোফার বিন্‌স্"। মিস মেগ্ জেঙ্কিন্‌স্ নামক লণ্ডনের জনৈক বিখ্যাত অভিনেত্রী প্রধান ভূমিকায় নামিয়াছেন। এখানে থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে কেহ ধূমপান করে না। আটটা হইতে সোয়া দশটা পর্যন্ত থিয়েটার চলিল। ভালই লাগিল। সান্ন্যাল-দম্পতি আমাকে হোটেলে পৌছাইয়া দিয়া বিদায় নিলেন। স্থির হইল পর দিন তাঁহারা আসিয়া আমাকে নগরোপকণ্ঠে ভ্রমণার্থ লইয়া যাইবেন।

সিডনি শহরটি প্রশান্ত মহাসাগরের তটভূমিতে অবস্থিত। আশেপাশে অনেকগুলি পাহাড়। অষ্ট্রেলিয়া বহু প্রাচীন দেশ ; কাজেই এখানে খুব খাড়া পাহাড় নাই। নগরোপকণ্ঠে পাহাড় ও সমুদ্রের লুকোচুরি খেলা পরম চিত্তাকর্ষক। গাছপালা যথেষ্ট। দূব হইতে গাছ ও পাহাড়গুলি যেন নীলবর্ণ বলিয়া মনে হয়। আমার হোটেলটি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এটিই শহরের সব চেয়ে বড় হোটেল। উত্তরে অদূরে 'সার্কুলাব কোয়ে' বা বৃত্তাকার সমুদ্রতীরে অনেক গুলি 'হেড' আছে। পাহাড়গুলি মাঝে মাঝে সমুদ্রের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই পাহাড়গুলির সমুদ্রগর্ভস্থ অগ্রভাগকে 'হেড' বা 'মাথা' বলা হয়। বন্দরের নাম পোর্ট জ্যাকসন। ইহা খুব বড় বন্দর। সমুদ্রের একটি 'ইন্‌লেট' বা খাড়ির উপর অবস্থিত। 'সার্কুলার কোয়ে' এই খাড়ির পাড়ে অবস্থিত। ওপারে উত্তর-সিডনি ; খাড়ির উপর অবস্থিত একটি বৃহৎ সেতু

উত্তর ও দক্ষিণ সিডনিকে সংযুক্ত করিয়াছে। পোলটি সুদৃশ্য। দক্ষিণ সিডনির দক্ষিণে বটানী উপসাগর। পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর।

৯ই মার্চ রবিবার। বেশ গরম পড়িয়াছে। পশমী বস্ত্র পরিধানই চলিতেছে। তবে একটু কষ্ট বোধ হইতেছে। ১১॥টায় সান্ন্যালদের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম। 'হারবা র' সেতু পার হইয়া উত্তর-সিডনিতে রোজভিলে ঘেরা স্নানের ঘাটে জনসমাবেশ দর্শন করিয়া, 'ফ্রেঞ্চেস্ ফরেষ্ট' নামক জঙ্গলের মধ্য দিয়া দুইটি পাহাড় ও তন্মধ্যবর্তী দুইটি উপত্যকা অতিক্রম করিয়া দূরে 'ম্যান্‌লি বিচ' নামক বেলাভূমি দেখিয়া একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে আসিয়া পড়িলাম। সার্থক-নামা মহাসাগর পাটীর মত পড়িয়া আছে। কোথাও এক একটা পাহাড় জল-মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত আগাইয়া গিয়া খাড়াভাবে সমুদ্রে নামিয়া গিয়াছে। তাহার উপর সবুজ বৃক্ষশ্রেণী। কোথাও বা মানুষের বাস। কোল্‌বয় স্নানের ঘাটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গচুম্বিত সুন্দর সৈকত। এই স্থান হইতে পাহাড়ের মধ্য দিয়া একটি 'ইন্‌লেট' বা খাড়ির পাড় ধরিয়া চলিলাম। দুই ধারে ঘনসবুজ বাননীসমাবৃত খাড়া পাহাড়। মাঝখানে 'ইন্‌লেট' বা খাড়ি। পাহাড়ের গা দিয়া রাস্তা। পাহাড়গুলি কখনও তরঙ্গায়িত, কখনও বা পাহাড়ের পার্শ্বে গভীর উপত্যকা। খাড়িটি কখনও আড়ালে যাইতেছে, কখনও সহসা নয়নপথে পতিত হইতেছে। বেলা ১টায় 'বেভিউ' নামক

রেষ্টুরেণ্টে চা পান করিলাম। রেষ্টুরেণ্টটি উপসাগরের তীরে। দু'ধারে বনানীসমাচ্ছন্ন পাহাড়, মাঝখানে উপসাগর। অদূরে উপসাগর মহাসাগরে মিলিত হইয়াছে। রেষ্টুরেণ্টে বসিয়া পাহাড় দুইটির ফাঁক দিয়া মহাসাগর দেখা যাইতেছে। উপসাগরে বহু ছোট-বড় নৌকা ভাসমান। রেষ্টুরেণ্ট ত্যাগ করিয়া হক্স্‌বেরি নদীর সেতুর উপর আসিলাম। চারিদিকে পাহাড়। নদীতে একটি ছোট ষ্টীমার চলিতেছে। দূরে রেলের পোল। মনোরম দৃশ্য। তখন বেলা প্রায় ৪টা। মাঝে মাঝে সান্ন্যাল ও সান্ন্যাল-পত্নী হাত-ক্যামেরায় ছবি তুলিতেছেন। এখান হইতে 'রবিন্ হেডে' পৌঁছিলাম। সেখানে লোকের বড ভিড়। কেহ স্নান করিতেছে, কেহ নৌকা বাহিতেছে, কেহ বন-ভোজনরত, কেহ নৌকায় বসিয়া ছিপে মাছ ধরিতেছে। রবিবারে সর্বত্রই লোকের ভিড়। এখানে গাছের মধ্যে গামই বেশী। বড় বড় ওকও কিছু দেখা যায়। দৃশ্য মনোরম—তবে বৈচিত্র্য কম। গাছগুলি সুন্দর, কিন্তু পর্যাপ্ত পুষ্পসমৃদ্ধ নহে। পাখীগুলি সুদৃশ্য, কিন্তু তাদের কণ্ঠে গান বেশী শুনিলাম না। কুমারসম্ভবের শ্লোক মনে পড়িল: "প্রায়েন সামগ্র্য বিধৌ গুণানাং পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ।" প্রবৃত্তিঃ কু-রিং গাই পার্কের মধ্য দিয়া 'তুরামুরা' পৌঁছিলাম। ফিরিবার সময় আলোকিত সিডনি শহরের পরম মনোরম দৃশ্য চোখে পড়িল। ভোজনের পূর্বে হোটেলে ফিরিলাম। যাতায়াতে ১০০ মাইলের উপর ঘুরিয়াছি। আমাকে হোটেলে পৌঁছাইয়া সান্ন্যাল-দম্পতি গৃহে ফিরিলেন।

১০ই মার্চ রবিবার সহরে ফিরিয়া ভারতীয় ট্রেড কমি-শনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। ভদ্রলোকের নাম শকসেনা। তিনি আমাকে মধ্যাহ্ন-ভোজনে আপ্যায়িত করিলেন। শহরটি বড়, পরিচ্ছন্ন ও কর্মব্যস্ত, এখানে লটারীর রেওয়াজ একটু বেশী দেখিতেছি। লোকেরা রাস্তায় বসিয়া লটারীর টিকিট বিক্রয় করিতেছে। পরদিন যে মহিলা কর্মচারীটি আমার হোটেলের পাওয়ানা বুঝিয়া লইতেছিলেন, আমি কলিকাতার অধিবাসী শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! কলিকাতায় সুন্দর একটা রেস কোর্স আছে।"

এখানে অনেক ভারতীয় নাবিক দেখিতেছি। সকলেই খালাসী। বাড়ী পূর্ববঙ্গে। সান্ন্যাল মহাশয় ইহাদেরই তত্ত্বাব-ধায়ক।

১১ই মার্চ মঙ্গলবার সান্ন্যালের আপিসে গেলাম। সেখানে কয়েকজন ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হইল। কেহ ছাত্র, কেহ ফিজি হইতে ভারতে যাইবার জন্য জাহাজে স্থানসংগ্রহের যোগাড়যন্ত্র করিতে আসিয়াছেন। সান্ন্যাল আমার টিকিট ও ভিসা নিজেই সংগ্রহ করিয়া দিলেন। দিবাভাগেই আমার মাল বিমান-আপিসে জমা দিয়া আসিলাম। ব্যাঙ্ক হইতে কিছু ভারতীয় টাকা কিনিলাম; তারপর সান্ন্যাল-দম্পতির সঙ্গে চিড়িয়াখানা দেখিলাম। এখানকার চিড়িয়াখানাটি বেশ বড়। খাড়ির তীরে অবস্থানটি বেশ নয়নানন্দকর। সান্ন্যাল-দম্পতি সন্ধ্যায় আমার হোটেলে আসিলেন। একত্র ভোজন সমাপন করিলাম।

ভোজনান্তে সান্ন্যাল-দম্পতি আমাকে শহরের অনেক স্থানে ঘুরাইয়া দেখাইলেন। যে বিমানে আমি যাইব ইহা ফ্লাইং বোট। জলে নামে এবং জল হইতে উড়ে। 'রোজবে' নামক উপসাগর হইতে উড়িবে। সান্ন্যাল-দম্পতি আমাকে 'বোজবে' পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া বিদায় নিলেন। সান্ন্যাল-পত্নী বাঙ্লা শিখিতেছেন। বিদায়কালে তাহাকে বলিলাম, "কলিকাতায যখন আপনার সহিত দেখা হইবে, তখন কিন্তু আমরা বাংলায আলাপ করিব।"

রাত্রি ১১॥টায বিমান উড়িল। আলোকমালাখচিত সিডনির নৈশরূপ আকাশ হইতে অপরূপ মনে হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়

সিডনি হইতে কলিকাতা

১১ই মার্চ মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে এগারটায় সিডনির উপকণ্ঠস্থ রোজ উপসাগর হইতে ফ্লাইং বোট উড়িল। আলোকোদ্ভাসিত সিডনি নগরী ক্রমশঃ দৃষ্টির অগোচর হইল। আমরা চব্বিশ জন যাত্রী। বিমানটিতে শয়নের ব্যবস্থা আছে। বিমানের লেজের মধ্যে কয়েকটি বার্থ আছে। কয়েকটি আসনকেও বার্থে পরিণত করা যায়। ষ্টুয়ার্ড আসিয়া বলিল,

আমাদের মোট ১৬টি বার্থ আছে। যাত্রীদের মধ্যে ষোল জন তাহাতে শয়ন করিতে পারেন। আমি প্রথম শুইতে চাহি নাই। শেষে বার্থ খালি থাকে দেখিয়া বিমানের লেজের মধ্যে একটি বার্থে শয়ন করিলাম। বেশ আরামেই ঘুমাইলাম। এক ঘুমে রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। প্রভাতে উঠিয়া কাপড়-চোপড় পরিতেই বিমান বাউএন উপসাগরে অবতরণ করিল। বাউএন কুইন্সল্যাণ্ড রাষ্ট্রে অবস্থিত, সিডনি হইতে ৯৭৪ মাইল। নৌকাযোগে উপসাগরতীরস্থ একটি ছোট ঘরে আমাদিগকে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে প্রাতরাশ সমাপন করিয়া পুনরায় নৌকাযোগে বিমানে ফিরিলাম। সোঁ সোঁ শব্দে দ্রুতবেগে জল কাটিয়া বিমান সগর্জনে আকাশে উঠিল। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ ভারত মহাসাগরের মধ্যে দুইটি হাতা বাড়াইয়া দিয়াছে। একটি প্রায় নিউগিনি পর্যন্ত উঠিয়াছে। অপরটি ছোট। তাহারই মাথায় পোর্ট ডারউইন। বাউএন হইতে ডারউইনের পথে হাতা দুইটির মধ্যবর্তী উপসাগরে আমরা সবেমাত্র পড়িয়াছি, সহসা বিমানটিতে বেশ জোর কয়েকটি ঝাঁকুনি লাগিল। মুহূর্তের মধ্যে বিমান আবার স্থিরভাবে চলিতে লাগিল। বিমান সবেগে ছুটিয়াছে। কিন্তু গৃহগামী মনের নিকট ইহার বেগ অতি তুচ্ছ। বেলা প্রায় ১১॥টায় উপসাগর অতিক্রম করিলাম। পুনরায় স্থলভাগ দৃষ্টিগোচর হইল। উপকূল-ভাগে বন, চাষ বা বসতি আছে বলিয়া মনে হইতেছে না, শুধু পাতলা গাছ দেখা যাইতেছে।

বৈকাল ৩॥টায় বিমান ডারউইনের সমুদ্রে নামিল। নৌকাযোগে তীরে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে গাড়ীতে হোটেলে নীত হইলাম। ভ্রমণক্লান্ত যাত্রীগণ স্নানাদি সমাপন করিয়া শহর দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলেন। নীচে টেলিগ্রাম করিবার ব্যবস্থা দেখিলাম। আমার আগমনবার্ত্তা জানাইয়া কলিকাতায় একটি তার পাঠাইলাম। তারপর আমিও শহর দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। শহরটিতে ৩০০০ লোকের বাস। বসতি বিরল—জনশূন্যতা চোখে ঠেকে। নারিকেল গাছ, গোল্‌মোহর গাছ ও তেঁতুল গাছ দেখিতে পাইলাম। তেঁতুল গাছগুলি আকারে ছোট, ফল কম। পেঁপে গাছ, কেলিকদম্বের বন এবং সপুষ্প অপরাজিতা লতা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। শহরের সবগুলি রাস্তা পিচ-বাঁধানো নয়। বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, এশিয়া ও ভারতবর্ষের নিকটবর্তী হইতেছি। অষ্ট্রেলিয়ার এই অংশে আদিম অধিবাসীর সংখ্যাই বেশী। অনেক কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী দেখিলাম। মনে হইল ইহাদের জীবনযাত্রার মান নিম্নশ্রেণীর। হোটেলের পাশেই সমুদ্র বা উপসাগর। অদূরে, সাগরতীরে স্থানীয় শাসনকর্ত্তার কুঠি। কাছে একটি "পায়ার" বা ঘাট। সেখানে দুই-তিনটি পুরাতন ষ্টীমার দাঁড়াইয়া আছে। ষ্টীমারগুলি ছোট এবং বোধ হয় বে-মেরামত অবস্থায় আছে। শুনিলাম গত যুদ্ধের প্রথমে জাপানীরা বোমাবর্ষণ করিয়া এখানে আটখানা জাহাজ ডুবাইয়া দেয়। সেগুলি এখনও এখানেই জলগর্ভে নিমজ্জিত

আছে। মাত্র একখানা জাহাজ নাকি পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। উপসাগরতীরে অনেকক্ষণ ঘুরিলাম। ওপারে দূরে বনাচ্ছাদিত ভূমি দেখা যাইতেছে। ডাহিনে দূরে ভারত-মহাসাগর। বেলাভূমি বন্ধুর ও শিলাময়।

আমার সহযাত্রীদের মধ্যে একজন সুইডিস্ ভদ্রলোক ছিলেন। ভদ্রলোক ছাব্বিশ বৎসর মেলবোর্ণে ক্রিষ্ট্যাল কর্ত্তনের ব্যবসা কবিয়া বৃদ্ধবয়সে সস্ত্রীক দেশে ফিরিতেছেন। ডার-উইনের হোটেলে ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হইল। ভদ্রলোক পূর্বে ইংরেজী জানিতেন না। মাতৃভাষা ভিন্ন ফরাসী, জার্ম্মান ও লাটিন জানিতেন। পরে মেলবোর্ণে আসিয়া ইংরেজী শেখেন। অষ্ট্রেলিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভদ্রলোকটি খুব আশান্বিত নন। ইহার মতে অষ্ট্রেলিয়া-সরকাবের কোন পরিকল্পনা নাই; সরকারী কর্মচারীদেব দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, মতামত বহু ক্ষেত্রে বালকোচিত, এদেশের শ্রমিক আন্দোলন যুক্তিপ্রতিষ্ঠ নয়; এখানকার শিল্পীরা উৎকৃষ্ট জিনিস প্রস্তুতে উৎসাহী নয়। গৃহগামী প্রবাসী বৃদ্ধের মুখে তাঁর স্বদেশের প্রশংসা খুব ভাল লাগিল। সুইডেন যুদ্ধকালে নিরপেক্ষ থাকায় যুদ্ধের আচড় এ দেশটির গায়ে লাগে নাই। সুইডেনে সাধারণ লোকের অবস্থা সচ্ছল। চিকিৎসার বন্দোবস্ত খুব ভাল। শ্রমিকদের বাস-গৃহের ব্যবস্থা এখানে উত্তম। জনসাধারণ প্রগতিশীল এবং তাহাদের মনোভাব উদার। শ্রেণীবিদ্বেষ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

ভদ্রলোকটি সুইডেন সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিলেন।

সেখানে রেল-ভাড়া সস্তা ; এক রাত্রির পথ মাত্র ১৭ শিলিঙে যাওয়া যায়। বাল্টিক সাগর পার হইতে লোককে গাড়ী-বদল করিতে হয় না। গাড়ী খেয়ায় পার হয় ; ৫॥ ঘণ্টা লাগে। প্রধান রেলপথগুলির সর্বত্রই বৈদ্যুতিক শক্তিতে গাড়ী চলে। দেশে বর্তমানে চল্লিশ লক্ষ অশ্বশক্তি জলবিদ্যুৎ তৈরি হইতেছে, এক কোটি দশ লক্ষ অশ্বশক্তি পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

সেখানে কৃষি ও শিল্পে সমসংখ্যক লোক নিযুক্ত। ইস্পাত ও কাগজ প্রধান শিল্প। দেশটি প্রায় স্ব-সম্পূর্ণ। তবে কফি ও তেল নাই। যে কয়টি লোহার খনিতে কাজ চলিতেছে সেগুলি আরও ২৫০ বৎসর চলিবে। ইহা ছাড়া আরও ১৫টি খনি আছে, তাহাতে এখনও হাত দেওয়া হয় নাই।

ভদ্রলোক নোবেল পুরস্কারের প্রসঙ্গ তুলিলেন। তাঁহার পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া বলিলেন, "পুরস্কার আনিবার জন্য মনীষিগণ প্রতি বৎসর ষ্টকহোমে সমবেত হন। রবীন্দ্রনাথ যে বৎসর নোবেল পুরস্কার পান সেবারকার কথা আমার মনে আছে। মনে পড়ে ইংরেজ সরকার রবীন্দ্রনাথকে পুরস্কার আনিবার জন্য ষ্টকহোমে যাইতে দেন নাই। কেন দেন নাই বলিতে পারেন কি ?"

আমি—এরূপ কথা আমার জানা নাই।

ভদ্রলোক—আনাতোল ফ্রাঁস এবং জার্মান অধ্যাপক নার্ষ্ট একই বৎসর নোবেল পুরস্কার পান। পুরস্কার-বিতরণী সভায়

ইঁহারা পরস্পরের করমর্দন করেন। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর ইহাই ফরাসী-জার্মানীর প্রথম করমর্দন।

ডারউইনের হোটেলে রাত্রি কাটাইয়া ১৩ই মার্চ বৃহস্পতি-বার সকাল সাড়ে ছয়টায় পুনরায় উড়িলাম। আমার পাশে বসিয়াছিলেন একটি প্রৌঢ় ইংরেজ ভদ্রলোক। আমাদের সামনে মুখোমুখি বসিয়াছিলেন একজন বর্ষীয়ান্ মার্কিন ভদ্রলোক এবং একজন অষ্ট্রেলিয়ান যুবক। ইংরেজ ভদ্রলোক সরকারী কার্যোপলক্ষে অষ্ট্রেলিয়া গিয়াছিলেন, এখন সিঙ্গাপুরে ফিরিতেছেন। মার্কিন ভদ্রলোকটি একটি বড় মার্কিন কেমিক্যাল কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট। পৃথিবী পর্যটনে বাহির হইয়াছেন। সিঙ্গাপুরে কয়েক দিন থাকিয়া চীন হইয়া ভারতবর্ষে যাইবেন। অষ্ট্রেলিয়ান যুবকটি একটি কোম্পানীর কাজেই লণ্ডন যাইতেছেন। আমাদের চারি জনের মধ্যে নানারূপ আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার স্থলভাগ অতিক্রম করিয়া ভারত-মহাসাগরে পড়িলাম। সাড়ে আটটায় টিমোর সাগর অতিক্রম করিলাম। পর্বতময় টিমোর দ্বীপকে তাহার দক্ষিণপ্রান্তের উপর দিয়া লঙ্ঘন করিলাম। পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপমালা এক এক করিয়া পার হইলাম। সুরাবায়া উপসাগরে যখন নামিলাম তখন ডারউইন-সময় সাড়ে চারটা, সুরাবায়া-সময় আড়াইটা।

আকাশ হইতে সুরাবায়ার দৃশ্য সুন্দর দেখাইতেছিল। তখন সবেমাত্র জোর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সদ্যঃস্নাত শহর। প্রত্যেক

বাড়ীতেই গাছপালা আছে। বেশ সাজানো-গোছানো। বাড়ীর ছাদগুলি প্রায়ই লাল রঙের। বেশীর ভাগ বাড়ীই দোতালা। দু-একটি তিনতলা। উপসাগরে নামিতেই শহরের রণবিধ্বস্ত রূপ প্রকট হইল। বন্দরটির প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। উপসাগরটির তিন দিকে স্থল। এক দিক ভারত মহাসাগরে যুক্ত। সমুদ্রগর্ভে ছয়-সাতখানা জাহাজ জলমগ্ন। প্রত্যেকটির চোং দেখা যাইতেছিল—মজ্জমান মানুষের ঊর্ধ্বপ্রসারিত বাহুর মত। অপর কয়েকটি বিধ্বস্ত জাহাজ জলমধ্য হইতে পারে তুলিয়া মেরামত করা হইতেছে। নামিবার সময় ক্যাপ্টেন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তীরে নামিয়া চা পান করিয়া আধ ঘণ্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরেই আমাদিগকে পুনরায় উড়িতে হইবে। কিন্তু নামিয়াই খবর পাইলাম যে প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য আমাদিগকে আজ এখানেই থাকিতে হইবে। আমাদের যাওয়া পিছাইয়া গেল বটে; কিন্তু যাত্রিগণ সুরাবায়া শহরটি দেখিবার সুযোগ পাইয়া খুশীই হইলেন। ঘাটিতেই জনৈক সরকারী কর্মচারী আমাদিগকে স্থানীয় মুদ্রা সরবরাহ করিলেন এবং অব্যয়িত অংশ পরদিন কিনিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। শুনিলাম মুদ্রাবিনিময়ের কালো-বাজার এখানে খুব চালু। বিমান-ঘাটির কর্মচারিগণ আমাদের অবস্থানের সকল ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাস আসিয়া আমাদিগকে হোটেলে লইয়া গেল। হোটেলটির নাম ওরাঞ্জে হোটেল। শহরের বৃহত্তম রাজপথের উপর অবস্থিত।

রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত। দু'পাশে দোকানের সারি। মাঝখান দিয়া ট্রাম লাইন। হোটেলটি বেশ বড়। আসবাবপত্র চমৎকার—অষ্ট্রেলিয়ার যে-কোন হোটেল হইতে ভাল। চেয়ারগুলির বেতের কাজ যেমন মজবুত তেমনি সুদৃশ্য। ভবনটি বৃহৎ ও ইহার প্ল্যান সুরুচিসম্মত ও সুনিপুণ, কিন্তু বর্তমানে যেন লক্ষ্মীছাড়া—হীনাবস্থ প্রাচীন জমিদার-বাড়ীর মত। পাখা ও বিজলী-বাতি আছে, কিন্তু কলে জল নাই। জাপানী যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু বর্তমানে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ ইন্দোনেশীয়গণের সহিত যুদ্ধরত। যে স্থান হইতে শহরের জল সরবরাহ হয় সে জায়গাটি এখনও ইন্দোনেশীয়দের হাতে —কাজেই শহরে জল নাই। শহরের দোকানপাটেরও যেন লক্ষ্মীছাড়া ভাব। মনে হয় এক সময় শহরটি উৎসব-মুখর ছিল। হোটেলের জনৈক কর্মচারী বলিল, "এই রাস্তা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার হুকুম নাই এবং এই রাস্তারও খানিক দূরের বেশী যাওয়া নিষেধ।" শহর দেখিবার জন্য বড় রাস্তার উপর একা বাহির হইয়া পড়িলাম। খানিকদূর যাইতেই একটি দোকানের সামনে জনৈক শিখ ভদ্রলোককে দণ্ডায়মান দেখিলাম। তিনি আমাকে সাদরে দোকানের ভিতর লইয়া গিয়া বসাইলেন। দোকানটি বেশ বড। তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল। তিনি যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এইরূপ ঃ

"আমি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী এখানে আসি। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ওলন্দাজগণ তত গা করে নাই। শেষে

যখন রীতিমত আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিল তখন তাহারা কিছু সৈন্যসংগ্রহ করিল। কিন্তু ইহাদের বিমান বা ট্যাঙ্ক ছিল না। যখন সিঙ্গাপুরের পতন হইল তখন ইহারা একরূপ নিরাশই হইল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জাপান সুরাবায়ায় বোমাবর্ষণ করে। সুরাবায়া হইতে প্রায় ২০০ মাইল দূরে এক জলযুদ্ধে ওলন্দাজ-রণতরীসমূহ বিপর্যস্ত হয়। মার্চ মাসের ৩ তারিখে জাপগণ সুরাবায়ার দশ মাইল দূরে অবতরণ করে। ওলন্দাজগণ তাহাদের মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার পূর্বেই অষ্ট্রেলিয়ায় পাঠাইয়া দিয়াছিল। এখন তাহারা ৩০০ মাইল দূরে এক পর্বতে আস্তানা স্থাপন করিল। জাপগণ যখন অবতরণ করিয়া তাহাদিগকে চারিদিক দিয়াই ঘিরিয়া ফেলিল তখন ওলন্দাজ-বাহিনী আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। জাপদের সংগঠন-শক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়। সাত দিনের মধ্যেই তাহারা যবদ্বীপের যাবতীয় কাজকর্ম নিযমিত-রূপে চালু করিয়া দিল। সকলেরই জীবনযাত্রা ঠিকমত চলিতে লাগিল। সাড়ে তিন বৎসর জাপগণ এখানে ছিল। উহাদের দয়ামায়া কম। কঠোর সাজা দিতে বা অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে ইহারা পরাঙ্মুখ নহে। ইহাদের গুপ্তচর বিভাগ অত্যন্ত সুনিপুণ। জার্মানী যখন দুর্বল হইয়া পড়িল তখন জাপানীরা বুঝিল যে অক্ষশক্তির পরাজয় অনিবার্য। তখন ইহারা দেশীয় লোকদের সহিত সদয় ব্যবহার সুরু করিল। তাহাদিগকে ভাল ভাল কাজে নিযুক্ত করিল এবং স্বাধীনতার অনিবার্যতা

সম্বন্ধে আশান্বিত করিয়া তুলিল। এদেশীয়গণ জাপানীদের কাছেই অস্ত্র-ব্যবহার শিখিল। জাপান যখন আত্মসমর্পণ করিল তখন তাহারা স্থানীয় জাপানীদের আক্রমণ করিয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইল। এখন পর্যন্ত ওলন্দাজগণ মাত্র চারিটি শহরের অধিকারী। দেশের বাকী অংশ সমস্তই দেশীয়গণের হাতে। উহারা এই শহর হইতে মাত্র দশ মাইল দূরে ছিল। দিন দশেক পূর্বে ওলন্দাজগণ এক আক্রমণ চালাইয়া উহাদিগকে আরও মাইল পঁচিশেক হটাইয়া দিয়াছে। যেখান হইতে শহরের জল সরবরাহ হইত সেই জায়গাটি এখনও উহাদের হাতে। কাজেই শহরে জল নাই। এখনও শহরের দোকানপাট ঠিকমত চলে না। সন্ধ্যার মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়। রাত্রি ১১টা হইতে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত "কারফিউ"।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শীঘ্র এ গোলমাল মিটিবে কি ?"

শিখ ভদ্রলোক বলিলেন, "না। একদল চায় স্বাধীনতা। অপর দল চায় উহাদিগকে অধীন রাখিতে। কাজেই গোল-মাল মিটিতে পারে না। দেশীয়গণের মধ্যে শিক্ষার বড় অভাব। ভারতবর্ষে যেরূপ শিক্ষিত ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ আছেন এখানে সেরূপ কেহ নাই। কাজেই ওলন্দাজেরা যদি ঘোষণা করে যে, আংশিক স্বাধীনতা এখনই দিয়া দিবে তবে আরও দশ-বার বৎসর এদেশে ভালভাবেই থাকিতে পারে। দেশীয়দের শিক্ষালাভের জন্য এই সময়টুকুর প্রয়োজন।

কিন্তু ওলন্দাজগণ ইংরেজের মত রাজনীতিজ্ঞ নয়। ইংরেজ যেমন যথাসময়ে ভারত ছাড়িবার সংকল্প ঘোষণা করিয়া নিজের ও ভারতের মঙ্গলই কবিয়াছে এবং তাহাতে লজ্জা বোধ করে নাই, ওলন্দাজেরা সেরূপ পাবিবে বলিয়া মনে হয় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "এদেশে ভারতীয়ের সংখ্যা কত হইবে?"

শিখ ভদ্রলোক বলিলেন, "সমগ্র দেশে ২০।২৫ হাজাব হইবে। আর এদেশের সভ্যতা তো মূলতঃ ভারতীয়। যদি পারেন তবে একবার বলিদ্বীপে যাইবেন। সেখানে কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতির প্রস্তরমূর্তি আছে। সেখানকার লোকেরা ভারতীয়দের মতই ধুতি ও পাগড়ি পরে। এই উভয় দেশের অনেক কথাও এক, যেমন—রুটি, নসিব। ভারতবর্ষেব মত সুন্দর সুন্দব মন্দিরও সেখানে আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "শিখজী, দেশে যাবে না?"

শিখের শ্মশ্রুল মুখে হাসি দেখা দিল। বলিল, "দেশ থেকে চিঠি পাইয়াছি। দোকানের ভার লইবার জন্য দেশ হইতে লোক আসিতেছে। আগামী মাসেই দেশে রওনা হইতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি।"

শিখ ভদ্রলোক আমাকে লেমোনেড্ পান করাইয়া আপ্যায়িত করিলেন। তাঁহার সহিত আলাপাদিতে পরিতৃপ্ত হইয়া আবার রাস্তায় বাহির হইলাম। পাশেই দেখিলাম দুইটি সিন্ধুপ্রদেশবাসীর দোকান।

একটু অগ্রসর হইতেই আমার সহযাত্রীদের একটি দল দেখিলাম। তাঁহারাও শহর দেখিতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলাম। ইহাদের মধ্যে চারিজন বিলাতের সংবাদপত্রের প্রতিনিধি। ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট খেলার রিপোর্ট করিতে অষ্ট্রেলিয়া গিয়াছিলেন। এখন স্বদেশে ফিরিতেছেন। অপব একজন শুভ্রকেশ বৃদ্ধ। ২৭ বৎসর অষ্ট্রেলিয়ায় যাপন করিয়া বৃদ্ধবয়সে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে বাস করিবার জন্য যাইতেছেন। বৃদ্ধ বেশ প্রফুল্ল। এই শহর হইতে স্মারক কোন একটি জিনিস কিনিতে ইচ্ছুক। একটি সোনা-রূপার দোকানে ঢুকিয়া এক জোড়া রূপার তারের দুল কিনিলেন। দেখিলাম পাউণ্ড পাইলে দোকানদারগণ অনেক কম দামে জিনিস বিক্রয় করিতে প্রস্তুত।

রাত্রে খাইবার সময় খবর আসিল যে, আগামী কাল আমরা সকাল ৮টায় রওনা হইয়া সিঙ্গাপুরে পৌছিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিব। ইহাতে আমাদের প্রোগ্রাম পুরা এক দিন পিছাইয়া যাইবে। কিন্তু সিঙ্গাপুব দর্শনের সুযোগ মিলিবে বলিয়া কেহ বিশেষ অখুশী হইলেন না।

১৪ই মার্চ শুক্রবার ভোবে হোটেল ত্যাগ করিয়া বিমান-ঘাটিতে উপস্থিত হইলাম। উপসাগর-তীরবর্তী বিমান-ঘাটির ঘরটি ছোট। কাঠের ঘর। বন্দোবস্ত সবই অস্থায়ী। সিডনি হইতে লণ্ডন পর্যন্ত এই বিমান-পথটা বিলিতী বি-ও-এ-সি এবং অষ্ট্রেলিয়ার কোয়ান্টাস এম্পায়ার এয়ার ওয়েজের

সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। সিডনি হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিমান কোয়ান্টাসের কর্মচারিগণের হাতে থাকে। সিঙ্গাপুরে ক্রু বদল হয় এবং বি-ও-এ-সি-র কর্মচারিগণ বিমানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুরাবায়ায় যে স্থানীয় কর্মচারীটির উপর আমাদের দেখাশুনা করিবার ভার ছিল তিনি অষ্ট্রেলিয়ান। বিমান-ঘাটিতে আমার মার্কিন সহযাত্রী সুবন্দোবস্তের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশীয়দের বিবাদ কত দিনে মিটিবে?"

স্থানীয় কর্মচারী—"জানি না। তবে বর্তমানে জোর গুজব যে, আগামী সপ্তাহে ইহাদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। চুক্তির মুসাবিদা পূর্বেই তৈরি হইয়াছে। ওলন্দাজগণ এখন আরও তুইটি সর্ত যোগ করিতে চাহিতেছে। ইন্দোনেশীয়গণ তাহাতে আপত্তি করিতেছে। ইহাদের আপত্তি যেরূপ দৃঢ় তাহাতে মনে হয় ওলন্দাজগণ সর্ত তুইটি ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়া যাইবে। চুক্তির সারমর্ম এই যে, তুই বৎসরেব মধ্যে ওলন্দাজগণ ইন্দোনেশীয়গণকে দেশের ভার ছাড়িয়া দিবে। তবে শেষ পর্য্যন্ত হয় তো ওলন্দাজগণ তুই বৎসরের স্থলে বিশ বৎসর থাকিয়া যাইবে।"

সহযাত্রী অষ্ট্রেলিয়ান যুবকটি প্রশ্ন করিলেন, "ইন্দোনেশীয়-দের শাসনপ্রণালী কি ওলন্দাজদের শাসন-প্রণালীর মত সুনিপুণ?"

স্থানীয় কর্মচারী, "মোটেই না।"

অষ্ট্রেলিয়ান যুবক, "তবে ইন্দোনেশীয়দের হাতে শাসনভার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়।"

স্থানীয় কর্মচারী, "এ ঝুঁকি লইতেই হইবে। ভারতবর্ষে কি হইতেছে ?"

আমার ইংরেজ সহযাত্রী একটু অপ্রতিভ হইলেন এবং আমার দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করিলেন।

সমুদ্রে বিমান প্রস্তুত। আমরা নৌকায় চড়িয়া বিমানে উঠিলাম। সোঁ সোঁ শব্দে জল কাটিয়া বিমান গর্জন করিয়া ছুটিল।

বিমান-ঘাটির অসমাপ্ত আলাপ বিমানে বসিয়া আবার সুরু হইল।

মার্কিন ভদ্রলোকটি বলিলেন, আমি দেখিয়াছি আমরা অন্যের সমস্যা বা সুখদুঃখ বুঝিতেই পারি না। অন্যের শাসিত দেশ আমরা কিনিয়া দেখিয়াছি কিরূপে দেশবাসিগণ ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া গিয়াছে। তাহাদের শাসনব্যবস্থা তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ পন্থা। আমরা ত ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিতেছি। জানি না তাহাদের শাসনব্যবস্থা কত দূর সুফলপ্রদ হইবে।

ইংরেজ ভদ্রলোক—ফিলিপাইনই বলুন আর ভারতবর্ষই বলুন, ইহাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের এখন সবে শৈশবাবস্থা। দাঁত উঠা, কথা বলা প্রভৃতির সময়ে শিশুর যেরূপ বিপদ উপস্থিত হয় ইহাদেরও অগ্রগতির পথে মাঝে মাঝে বিপর্যয় হইবেই, তাহাতে ঘাবড়াইলে চলিবে না।

মাকিন ভদ্রলোক—আমি একবার ত্রিনিদাদে গিয়াছিলাম। সেখানে জনৈক ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন, "আমেরিকা যদি আমাদের ভার লইত তবে বড়ই ভাল হইত।" আমি বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমরা আমেরিকার হাতে আসিলে ডলার পাইতাম এবং ডলার পাইলে আমাদের অনেক সুবিধা হইত।"

আমি—তাঁহার যুক্তি অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অষ্ট্রেলিয়ান যুবকটি মাকিন ভদ্রলোককে দক্ষিণ-আমেরিকা বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। মাকিন ভদ্রলোক উত্তরে বলিলেন, আমরা উহাদের শাসনব্যবস্থায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি না।

অষ্ট্রেলিয়ান যুবক—উহাদেব শাসনব্যবস্থা কি খুব সুনিপুণ ?

মার্কিন ভদ্রলোক—না, তবে আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করি না। কারণ আমরা তাহাদের সমস্যা বুঝি না। আমরা শুধু তাহাদের সঙ্গে ব্যবসা করিতে চাই। সে কারণে রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই ভাল।

অষ্ট্রেলিয়ান যুবকটি সসম্ভ্রমে রুজভেল্টের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মাকিন ভদ্রলোক—"হ্যাঁ, রুজভেল্ট একটি বড় যুদ্ধ বড় রকমেই লড়িয়াছেন।"

মাকিন ভদ্রলোকটির সকল কথাতেই তাঁহার রিপাবলিকান দলীয় মত পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল।

ভারত মহাসাগরের উপর দিয়া বিমান সগর্জনে ছুটিয়াছে।

আমাদের নানা বিষয়ে আলাপ চলিতেছে। মার্কিন ভদ্রলোকটি একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি চীন হইয়া ভারতবর্ষে যাইব। ভারতবর্ষ হইতে স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ আমি কি কি জিনিস আনিতে পারি?"

আমি—"কলে তৈরি জিনিষে আমেরিকা অদ্বিতীয়। তবে হাতের কাজের নৈপুণ্য ভারতবর্ষে বিশেষরূপে দেখিতে পাইবেন। গালিচা, রেশম ও পশমের উপর হাতের কাজ, হাতীর দাঁতের কাজ, সোনা-রূপার তারের কাজ, শ্বেত পাথরের কাজ প্রভৃতি আনিতে পারেন।"

সুনীল ভারত মহাসাগরের উপর দিয়া উড়িতেছি। কতদূর আসিয়াছি খেয়াল নাই। মাত্র ৪০০০ ফুট উপর দিয়া ঘণ্টায় ১৩০ মাইল বেগে বিমান ছুটিতেছে। স্থানীয় সময়, বেলা ১টা ১০ মিনিটে ক্যাপ্টেন ঘটা করিয়া প্রচার করিলেন যে, আমরা ভূ-বিষুব রেখা অতিক্রম করিতেছি। প্রশান্ত মহাসাগরে ভূ-বিষুবরেখা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ গোলার্দ্ধে নামিয়াছিলাম। ভারত মহাসাগরে পুনরায় ভূ-বিষুব রেখা অতিক্রম করিয়া উত্তর গোলার্দ্ধে উঠিতেছি। ক্যাপ্টেন প্রত্যেক যাত্রীকে একখানি করিয়া সুদৃশ্য ও সুন্দররূপে ছাপানো সার্টিফিকেট দিলেন। আমার সার্টিফিকেটে লেখা ছিল—"বরুণরাজের আদেশে শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত ভূ-বিষুব রেখার উপর দিয়া উড়িয়া স্বর্গসংস্পর্শজনিত পুণ্য অর্জনপূর্বক সর্বপাপমুক্ত হইলেন। অদ্য হইতে তিনি স্বর্গীয় বাহিনীর

অন্তর্ভুক্ত হইলেন।” শীঘ্রই স্থল-সান্নিধ্য প্রকট হইতে লাগিল। দু-একটা চর দেখা গেল। কোন কোন চর এখনও জলের নীচে। কোন কোন চরে বিস্তর গাছপালা, তন্মধ্যে নারিকেল গাছের প্রাচুর্য। ক্রমশঃ সিঙ্গাপুর শহর দৃষ্টিগোচর হইল। দূর হইতে ঘরবাড়ীগুলি সুন্দর দেখাইতেছিল। পোতাশ্রয়ে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা বিশেষরূপে প্রকটিত। চারিদিকে শতাধিক জাহাজ, তন্মধ্যে অনেকগুলি জলমগ্ন। গত যুদ্ধে পার্ল হারবার পর্যন্ত জাপানের রণতাণ্ডব চলিয়াছিল। পার্ল হারবার আজ নবকলেবর লাভ করিয়াছে। কিন্তু ডারউইন হইতে বরাবর ধ্বংসের চিহ্ন দেখিয়া আসিতেছি। কত জাহাজই যে জাপান ডুবাইয়াছিল তাহা কিছু কিছু অনুমান করিতেছি। কিন্তু কত দিনে যে এই সমস্ত অঞ্চল হইতে ধ্বংসের চিহ্নসমূহ অদৃশ্য হইবে তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না। বেলা প্রায় ২টায় (স্থানীয় সময়) সিঙ্গাপুরের সমুদ্রে বিমান নামিল। নৌকাযোগে তীরে উঠিলাম। কর্ম-ব্যস্ত বিমান-ঘাটির বন্দোবস্ত বেশ ভাল। আমাদের ইংরেজ বন্ধুটির পত্নী তাঁহার স্বামীকে অভ্যর্থনা করিতে বিমান-ঘাটিতে আসিয়াছেন। তিনি আমাদের নিকট বিদায় লইয়া শহরে চলিয়া গেলেন। মার্কিন ভদ্রলোকটি এখানেই থাকিবেন। তিনিও হোটেলের সন্ধানে গেলেন। আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা বিমান-ঘাটির রেষ্টুরেণ্টেই করা হইয়াছিল। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমাদিগকে যে হোটেলে লইয়া যাওয়া

হইল তাহার নাম রাফেল হোটেল। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই হোটেলটি বৃহৎ ও সুদৃশ্য—বন্দোবস্ত ভাল। স্বাধীনতার উপাসকদের এই সেই পুণ্যভূমি যেখানে কিছুদিন পূর্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া একটি ট্যাক্সি লইয়া শহর দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ট্যাক্সিওয়ালা পাঞ্জাবী। শহরটি ভারতের পুরনো শহরের মতই মনে হইতেছে। কয়েকটি রাস্তা বেশ প্রশস্ত। বীচ্ রোডে ভ্রমণ উপভোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্মারক স্তম্ভটি স্বতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শহরটিতে চীনাদের সংখ্যা সমধিক। ভারতীয়ও যথেষ্ট। ভারতীয়দের মধ্যে পাঞ্জাবী ও সিন্ধী বেশী দেখিতেছি। বোম্বাই বাজার, হিন্দু রোড, বাবু রোড, ইদ্রিস রোড প্রভৃতি নাম যেন পরিচিত। অরচার্ড রোড ও জালাল বাসের রোড খুব চওড়া। দ্বীপের একাংশ পর্বতসঙ্কুল, জনবিরল এবং বনবহুল। সেই দিকে গিয়া একটি চীনা প্যাগোডা দেখিলাম। প্যাগোডাটি পাহাড়ের উপর। তিনটি সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া প্যাগোডায় উঠিতে হয়। একটি কেন্দ্রীয় গম্বুজকে ঘিরিয়া পাঁচটি গম্বুজ। স্থানটি পরম রমণীয়। প্যাগোডা হইতে সমুদ্রের দৃশ্য সুন্দর। জায়গাটি এখন জনশূন্য। সুন্দর প্যাগোডাটি অরক্ষিত এবং মাঝে মাঝে ভগ্ন। ট্যাক্সিওয়ালা বলিল যুদ্ধের সময় জাপানীরা চীনাদের তাড়াইয়া দিয়া মন্দিরটিকে স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া দেয়। সেখান হইতে দ্বীপের পার্বত্য অংশের

দিকে চলিলাম। অদূরে সেনানিবাস। পাশে জাপ বন্দী-নিবাস। অনেক জাপানী যুদ্ধবন্দী দেখিলাম। ঐ দিকে ঘুরিয়া পুনরায় শহরে প্রবেশ করিলাম। বোটানিক গার্ডেনে নামিয়া খানিক পায়চারি করিলাম। দুই ঘণ্টায় নগর ও দ্বীপ পরিক্রমা করিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

হোটেলে এক ঘরে আমাদের তিন জনের স্থান। অপর দুইজন ইংরেজ সাংবাদিক, ইঁহারা অষ্ট্রেলিয়া হইতে টেষ্ট ম্যাচের রিপোর্ট করিয়া দেশে ফিরিতেছেন। শেষ রাত্রে উঠিতে হইবে। আমি উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সাংবাদিকদ্বয়কে জাগাইয়া দিলাম। তাঁহারা দ্রুত তৈরি হইয়া লইলেন। সমুদ্রগর্ভ হইতে ৬-১৫ মিনিটে বিমান উড়িল। তখন আলোক ও অন্ধকার মিশিয়া আছে। ক্রমশঃ আলোক ফুটিয়া উঠিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূর্যোদয় দেখা গেল না। নীচে সাদা ধবধবে মেঘ। সোজা মলয় উপদ্বীপের উপর দিয়া সুনীল বৃক্ষাচ্ছাদিত সমতল ভূভাগ দেখা যাইতেছে। সাদা মেঘগুলি কোথাও খুব ফাঁকা, মনে হয় যেন মেঘখণ্ডগুলি গাছের মাথায় বসিয়া আছে। কোথাও মেঘরাশি অবিচ্ছিন্ন। চন্দ্রাতপের নীচে যেন প্রকৃতির অপূর্ব লীলা চলিতেছে। আমরা উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূল দিয়া চলিয়াছি। গতিবেগ ঘণ্টায় ১৬২ মাইল; উচ্চতা ৬৫০০ ফুট। নীচে ডাঙ্গায় এবং জলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট পাহাড়। মাঝে মাঝে জনবসতি দৃষ্ট হইতেছে। কোথাও কৃশাঙ্গী স্রোতস্বিনী চপল চরণে আঁকিয়া-

বাঁকিয়া চলিয়াছে। কুয়ালালামপুর অতিক্রম করিলাম ৭টা ৫০ মিনিটে। ইপি শহরের উপর দিয়া উড়িতেছি; রাস্তা ও ছোট ছোট নদী যেন সঙ্গে সঙ্গে সর্পিল গতিতে চলিয়াছে। রাস্তার উপর দিয়া মোটরগাড়ী ছুটিতেছে। বাড়ী-ঘরগুলি সাজানো। শহরে বড় টিনের কারখানা আছে। দশ মিনিট পরে আর একটি শহর অতিক্রম করিলাম। শহরটি ছোট ও সুন্দর। নাম শুনিলাম তাইপিং। পূর্বদিকে দূরে পর্বতশ্রেণী। পশ্চিমে অনতিদূরে সমুদ্র। একটি নদী যেন বিরাটকায় সাপের মত পড়িয়া আছে। বড় বড় রবার-বাগান দেখিতেছি। বাগানে গাছগুলি ব্যূহাকারে সাজানো। দেখিতে মনোজ্ঞ। মাঝে মাঝে সুন্দর কৃষিক্ষেত্র ও গ্রাম দেখা যাইতেছে।

বিমানে ষ্টেট্স টাইম্স্ নামক একটি সংবাদপত্র আমাদিগকে পড়িতে দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধের পর ১২ পৃষ্ঠার এই কাগজটি প্রথম বাহির হইয়া ঘোষণা করিতেছে যে, এখন হইতে প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার ১২ পৃষ্ঠা এবং অন্য দিন ৮ পৃষ্ঠা লইয়া বাহির হইবে। কাগজে দেখিলাম সিঙ্গাপুরে যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত সাত জন জাপানী অফিসারের বিচার চলিতেছে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে চাঙ্গী উপকূলে জাপানীরা যে হত্যাকাণ্ড করিয়াছিল একজন চীনা আদালতে তাহার ভয়াবহ বিবরণ দিয়াছে। কৃষিজ রবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এবং কৃষিজ রবার ও রাসায়নিক রবারের গুণাবলীর তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে।

বিমান সগর্জনে ছুটিয়াছে। স্থলভাগ ছাড়াইয়া সমুদ্রে পড়িলাম। ক্রমশঃ উপকূল হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। ১০টা ১৫ মিনিটে (সিঙ্গাপুর সময়) আবার "পকেট" নগরীর উপরিভাগে প্রবেশ করিলাম। পকেট সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের অর্ধপথ, বক্র উপদ্বীপের কুঞ্জের উপর অবস্থিত। শহরে প্রবেশ-পথের মুখে সমুদ্রের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ ও পাহাড় ছড়ানো। একটু পরেই আবার দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রে পড়িলাম। আর স্থলভাগ দৃষ্ট হইতেছে না।

ক্যাপ্টেন বলিলেন রেঙ্গুনে এখন পর্যন্ত ভাল হোটেলের ব্যবস্থা হয় নাই। বন্দরে যাত্রীগণের মাল পরীক্ষা করিবার জন্য কাষ্টমস্ কর্মচারী নাই; তাহাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তার নাই। যাত্রীগণকে শহরে নামানো হইবে না। আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পরই বিমান রেঙ্গুন ত্যাগ করিবে এবং অদ্যই কলিকাতা পৌঁছিবে। শুনিয়া মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

পার্ল হারবার হইতে জাপানীদের কৃত ধ্বংসলীলার কথা শুনিতেছি এবং নিদর্শন দেখিতেছি। ধ্বংসের পর পার্ল হারবার আমেরিকার ধনবলে পুনরায় নবকলেবর লাভ করিয়াছে। কিন্তু সুরাবায়া, সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের এখনও বিধ্বস্ত অবস্থা। ডারউইনেও ধ্বংসের বহু নিদর্শন দেখিয়াছি। সুরাবায়া ও সিঙ্গাপুরে বহু জলমগ্ন জাহাজ দেখিলাম।

জাপান আজ পরাজিত। সিঙ্গাপুরে বহু জাপ যুদ্ধবন্দী

দেখিয়াছি। সামরিক বিচারালযে জাপানীদের অত্যাচার-কাহিনী বিশদরূপে বর্ণিত হইতেছে। এক দিন জাপান ছিল এশিযার গর্ব। অশ্বেতকায় জাতির দ্রুত উন্নতির উদাহবণরূপে জাপান এশিয়াব মনে আশার এবং অষ্ট্রেলিয়ার মনে ভযের উদ্রেক কবিযাছিল। জাপানেব প্রতাপবহ্নি আজ নির্বাপিত। কিন্তু নিভিবার পূবে পার্ল হারবাব হইতে রেঙ্গুন পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডের উপর জাপান যে স্বাধীনতা-স্পৃহার বর্তিকা জ্বালাইযা দিযাছে তাহা কখনও নিবাণ হইবাব নয।

দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রেব উপর দিযা উডিতেছি। সহসা একখানা নৌকা দেখা গেল। নীল জল ক্রমশঃ ঘোলা হইতে লাগিল। একটি জলমগ্ন চব দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ইহাব পর ইরাবতী নদীব মোহানা। নদীব উপব দিযা উডিতেছি। উভয কূলে পরিষ্কাব জমি। মাঝে মাঝে বৃক্ষচ্ছায়াপ্রচ্ছন্ন গ্রাম। বেঙ্গুন নগরী দৃষ্টিগোচর হইল। বিমান নগরীব উপর দিযা উডিয়া গেল। সুন্দব শহর, সোযেডাগণ প্যাগোডার স্বর্ণ-শীষ রৌদ্রে চক্‌চক্ করিতেছিল। ইরাবতীর পার ধরিয়া উডিযা বিমান নদীবক্ষে অবতরণ করিল। তখন বেলা ১টা। আকাশ হইতে যে নদীকে অপরিসর দেখাইতেছিল তাহা প্রস্থে অন্ততঃ তিন মাইল হইবে। নদীবক্ষে বহু জাহাজ ও নৌকা। বিমান হইতে আমাদিগকে একটি মোটর-নৌকায় নামানো হইল। আমাদের লইযা মোটর-নৌকাটি ইরাবতীবক্ষে আধ ঘণ্টা ঘুরিল। শেষে বিমানে ফিরিলাম। ১টা ৫০ মিনিটে

বিমান পুনরায় উড়িল। রেঙ্গুন-সময় সিঙ্গাপুর-সময়ের এক ঘণ্টা পিছনে।

আজ ১৫ই মার্চ শনিবার। বিগত ১লা অক্টোবর স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলাম, আজ আবার নিজেব দেশে ফিরিতেছি। ছয় মাসে কত দেশ দেখিলাম। মহাকালের বিধানে পৃথিবীর কিরূপ পরিবর্তন হইতেছে তাহার কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করিলাম। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যে ঘটনাবলী দ্রুত আবর্তিত হইতেছিল তাহাও বিদেশে বসিয়া শুনিতেছিলাম।

মহাযুদ্ধের ধাক্কা খাইবার পব পৃথিবী আজও তাল সামলাইতে পারে নাই—সামলাইতে বেশ কিছুদিন লাগিবে। পৃথিবী আজ নানা শক্তির দ্বারা মথিত ও আলোড়িত। এটম বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রুশিয়া তাহার নূতন আদর্শ, শক্তি এবং কর্মপদ্ধতি লইয়া পৃথিবীকে বিষম নাড়া দিতেছে। জার্মানীসহ পূর্ব-ইউরোপ আজ কঙ্কালসার। পশ্চিম ইউরোপ হতবল। ইংলণ্ড এক নূতন ক্ষেত্র রচনা করিয়া তাহাব মধ্যে দাঁড়াইবার জায়গা খুঁজিতেছে। এ বিষয়ে তাহার উদ্যম ও কষ্টসহিষ্ণুতা সত্যই প্রশংসনীয়। ফ্রান্স আর দাঁড়াইবে কি না সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিতেছে। এশিয়ায় চীন গৃহ-যুদ্ধে পর্যুদস্ত; জাপান ভূমিশায়ী। পূর্ব-এশিয়ায় গণজাগবণ দেখা দিয়াছে। কিন্তু সেখানে জনগণ দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত, শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত। পশ্চিম এশিয়া বৃহৎ শক্তিপুঞ্জের প্রত্যক্ষ ক্রীড়াভূমি; সেজন্য তত্রত্য দেশসমূহের পক্ষে স্বকীয়

গৌরবে দেদীপ্যমান হওয়া দুরূহ। অষ্ট্রেলিয়ায় জীবনযাত্রার স্বচ্ছন্দতা সত্ত্বেও অশ্বেতজাতি-ভীতি তাহাকে কতকাংশে খর্ব করিয়াছে। আমেরিকা ও কানাডাই এখন সগৌরবে গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়াইতেছে। সেখানে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ, স্বচ্ছন্দ, চিন্তাধারা অব্যাহত—শক্তি-বিকাশের পথ উন্মুক্ত।

ভাবতবর্ষকে মাথা তুলিয়া স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে, গৃহযুদ্ধ বন্ধ করিতে হইবে, বহিঃশক্তিব প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ এড়াইয়া চলিতে হইবে এবং সাধারণ মানুষেব জীবনযাত্রার পথ সুগম কবিতে হইবে। আজ তাহাব সম্মুখে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। ভারত-মাতাব ভবিষ্যৎ এখন তাঁহারই সন্ততিগণের কর্ম এবং আচরণের উপব নিভর কবিবে। মহাকালের প্রচণ্ড আঘাতে আজ ভারত-মাতাব শৃঙ্খল খসিয়া পডিতেছে। গৃহযুদ্ধেব অবসান কবাই এখন তাঁহাব বড সমস্যা। নেতাজীব আদর্শে উদ্বুদ্ধ, স্বদেশ-প্রত্যাবৃত্ত আজাদ হিন্দ ফৌজেব দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান মিলনেব বন্যা বহিযাছিল। সুরাবর্দী ও সতীশ দাসগুপ্ত হাতে হাত মিলাইয়া কলিকাতাব রাস্তায হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত শোভাযাত্রায় নায়কত্ব করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট ভাবতবর্ষের ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন। ঐ দিন পাকিস্থানের জন্য মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হয়: কলিকাতার বাস্তায হাজাব হাজার হিন্দু-মুসলমানের রক্তে তাহাদের মিলন-আন্দোলন ভাসিয়া যায়। ইংরেজ বলিতেছে,

১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যে তাহারা ভারত ছাড়িবেই। মুক্তি আসিতেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু কোন্ পথে আসিবে, কি রূপ লইয়া আসিবে, ভারতমাতার দেহ খণ্ডিত হইবে, না অখণ্ডিতই থাকিবে—ইত্যাদি নানা সমস্যা ও সংশয় আজ ভারতবাসীর মনকে আলোড়িত করিতেছে।

ভারতবর্ষের একটি স্বকীয় চিন্তাধারা আছে। ব্যক্তিগত চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত রাখিতে ভারত চিরকাল চেষ্টা করিয়াছে। ইহারই ফলে বহু চিন্তাধারার সামঞ্জস্যসাধনেও তাহার প্রতিভা অতুলনীয়। স্বাধীন-চিন্তার সহিত সমাজ-বন্ধনের দৃঢ়তা ভারতে এক সময়ে বিশেষরূপে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আজ তাহার চিন্তাশক্তি পরাধীন, সমাজ পঙ্গু। সমাজের বন্ধন রহিয়াছে, কিন্তু জীবনাদর্শ নাই; বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আছে, কিন্তু সু-প্রয়োগ নাই। চিন্তাশক্তি স্বকীয় মূল উৎস হইতে বিচ্যুত হইয়া মৌলিকত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। ব্যক্তি হিসাবে ভারতবাসী ইংরেজ বা মার্কিন হইতে হীন নয়। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে সম্পূর্ণরূপেই ভারতবাসী ইংরেজ বা মার্কিনের সমকক্ষ। কিন্তু ভারতবাসী আজ স্বধর্মচ্যুত; কাজেই তাহার সংগঠন নাই, সাফল্য নাই। আমাদের ছেলেরা যে কোন দেশে পরীক্ষায় ভাল ফল করে, কিন্তু জীবনের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে হটিয়া যায়।

পাশ্চাত্ত্য ডিমোক্রাটিক বা গণতান্ত্রিক সমাজের কয়েকটি বিশেষত্ব স্বতঃই চোখে পড়ে। প্রথমতঃ সুযোগ-সাম্য।

সকলেই অন্ততঃ ম্যাট্রিক পর্যন্ত লেখাপড়া করিবার সুযোগ পায়—পরবর্তী শিক্ষা জীবনযাত্রার সহিত সমতালে চলে। বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার দিকে কম ছাত্রই যায়। বরং আমাদের দেশেই উচ্চ শিক্ষার পিছনে বেশী ছাত্র ছুটে। বি-এ, এম-এ পাস-করা কেরানী আমাদের দেশ ছাড়া অন্য কোথাও দেখি নাই। আমাদের দেশের শিক্ষা জীবনযাত্রার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারায় আমাদের শিক্ষিত সমাজ সাধারণ সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। উভয় সমাজের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য ডিমোক্রাটিক সমাজে দারিদ্র্যের তাড়না কম। মোটা ভাত, মোটা কাপড় প্রায় সকলেরই আছে। ধনী, নির্ধন অবশ্যই আছে, কিন্তু নিরন্ন বিবল এবং কেহই আশাহীন হইযা জীবন আরম্ভ করে না।

ইহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সাধুতা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছি। লণ্ডনের হোটেলে ব্যাগ ফেলিয়া আসিয়াছি, কেহ স্পর্শ করে নাই। ওয়াশিংটনে বাস-যাত্রীগণের নিকট কেহ টিকিট দিয়া পয়সা আদায় করে না; যাত্রীরা নিজেরাই নির্দিষ্ট বাক্সে পয়সা ফেলিয়া দিয়া যায়।

খাদ্য বিষয়েও ইহাদের অনেকটা সমতা দেখিয়াছি। মাছ, মাংস, তরকারি, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য—ইহাই সর্বত্র মানুষের খাদ্য। কিন্তু আমাদের দেশে রান্নার বিভিন্নতা অফুরন্ত। পাশ্চাত্ত্য দেশে সাধারণতঃ সিদ্ধ ও ভাজার মধ্যেই রান্না

সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ লোকই হোটেলে খায় বলিয়া খাদ্য-বিষয়ে রুচির পার্থক্যও কম। আমাদের প্রতি পরিবারেই খাদ্যের পার্থক্য। এমন কি একই পরিবারে এক এক জনের এক এক রকম খাদ্য।

ইহাদের সমাজ-ব্যবস্থায় বিশেষ জটিলতা দৃষ্ট হয় না। পরিবার বহুপ্রসারী নয়, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। পিতাপুত্রের সম্পর্কও অত্যন্ত স্বল্পপরিসর।

সাধারণ লোকের চিন্তাধারা জটিলতাশূন্য। ইহারা সব জিনিসের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান খোঁজে না। নিরামিষ বা আমিষ আহারের আধ্যাত্মিক মূল্য বিচার করে না। অভ্যস্ত জীবনধারা স্ব স্ব রুচি অনুসারে সহজভাবে অনুসরণ করিয়া যায়। এই সমস্ত কারণেই সে সব দেশে "স্নবারি" বা সামাজিক ভেদ-বুদ্ধিমূলক অভিমান কম। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় ধনী নির্ধন একই কেফেটেরিয়ায় বসিয়া একই খাদ্য পরমানন্দে ভোজন করে।

ইহাদের যানবাহনেও রকমারি কম। রাস্তায় শুধু বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত গাড়ী বা মোটরগাড়ীই চলিতেছে। আমাদের দেশে একই রাস্তায় রিক্সা, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, মোটর গাড়ী ও ট্রাম গাড়ী ভিড় করিয়া চলিয়াছে। ফলে প্রত্যেকের গতিবেগ ব্যাহত হইতেছে এবং রাস্তার শৃঙ্খলাও বজায় থাকিতেছে না। ইহা যেন আমাদের সমাজেরই অনুরূপ। সেখানে বৈদিক সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ ভিক্ষু, চার্বাকপন্থী, গোঁড়া

মুসলমান ও উগ্র আধুনিকপন্থী একত্র ভিড করিযা ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করিতেছে।

এত দারিদ্র্য, এত অসাম্য ও এত জটিলতা যাহাতে আমাদেব দেশে ডিমোক্রাসির পরিপন্থী হইযা না উঠে সে বিষযে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহার সঙ্গে রহিযাছে আমাদের ব্যক্তিগত অধৈর্য ও কর্মবিমুখতা এবং সমাজে জীবনী-শক্তির অভাব। শিক্ষিত সমাজেব সহিত সাধারণ সমাজেব যোগ নাই। ফলে শিক্ষিত সমাজ স্বীয বুদ্ধিতে অতিরিক্ত বিশ্বাসী এবং সাধারণ সমাজেব বুদ্ধিতে আস্থাহীন। এরূপ অবস্থা ডিক্টেটরশিপের অনুকূল। ডিমোক্রাসি সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে আস্থাবান। ডিক্টেটরশিপের উৎস একটি, ডিমোক্রাসির উৎস অগণিত। সেইজন্য পরস্পরকে বুঝিবার চেষ্টা এবং পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা ডিমোক্রাসির সাফল্যেব পক্ষে অত্যাবশ্যক। চুলচেরা বিচার করিযা পদাধিকার বলে স্ব-স্ব ক্ষমতাব সম্পূর্ণ প্রযোগ ডিমোক্রাসিব পরিপন্থী। স্বেচ্ছায স্বক্ষমতা খর্ব করিযা অন্যের দাবি মানিতে হইবে, প্রত্যেকেব প্রাপ্য সম্মান প্রত্যেককে স্বেচ্ছায দিতে হইবে, ব্যক্তি, আইন সভা এবং বিচারালযের পূর্ণ মর্যাদা দিতে হইবে—ইহাই ডিমোক্রাসিব নিযম। যদি আমরা ডিমোক্রাসি চাই তবে এ নিযম আমাদিগকে মানিতেই হইবে। ভারতবর্ষে এরূপ শিক্ষার অভাব ছিল না। আবার কি আমরা সেই শিক্ষা ফিরাইয়া আনিযা ভারতমাতাকে স্বমহিমায প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব?

এইরূপ নানা চিন্তায় মন আলোড়িত হইতেছে। বিমান রেঙ্গুন ছাড়িয়া সগর্জনে ছুটিয়াছে। রেঙ্গুন ছাড়িবার ২০।২৫ মিনিট পরে নদীতীরে সুন্দর একটি ছোট শহর অতিক্রম করিয়া কিছুক্ষণ উপকূল ধরিয়া উড়িয়া সমুদ্রে পড়িলাম। উপকূল অদূরেই রহিল—মাঝে মাঝে চর। আমরা ১১০০০ ফিট উঁচু দিয়া উড়িতেছি। ক্রমশঃ উপকূল-ভাগ অদৃশ্য হইল। চারিদিকে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র বিরাট একখানি পাটির মত পড়িয়া আছে। গৃহগামী মন চঞ্চল কালকেও পিছনে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে চাহিতেছে। সমুদ্রের মধ্যে আবার তু-একটি চর দেখা দিল। তরঙ্গিণীগণ সহস্র ধারায় সমুদ্রে মিলিত হইতেছে। সুন্দর সবুজ বনানী। মাঝে মাঝে গৃহস্থদের ঘরবাড়ী। প্রত্যেক বাড়ীতে বিস্তৃত পরিষ্কার প্রাঙ্গণ। ধানের মরাই দেখা যাই-তেছে। মাঝে মাঝে পুকুর। দৃশ্য দেখিয়া মন যেন ভরিয়া উঠিতেছে। নীচেকার নারিকেলবৃক্ষশ্রেণী যেন মাথা নাড়িয়া আমাকে নাচে ডাকিতেছে। বনের এত শোভা, জলের এত নির্মলতা এবং গৃহস্থ-কুটীরের এত পবিত্রতা তো কোথাও দেখি নাই। দ্রুত কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি। হিমাদ্রি-শিখর হইতে নামিয়া আসিয়া শত তরঙ্গিণী যেখানে সিন্ধুর সঙ্গে মিলিতেছে সেই মিলন-লীলাক্ষেত্র দিগন্তের অন্তরালে মিলাইয়া গেল। বিমান গর্জন করিয়া ছুটিতেছে। কলিকাতায় তখন বেঙ্গল টাইম চলিতেছে। দমদম বিমান-ঘাটির উপর দিয়া উড়িয়া বিমান পাঁচটায় গঙ্গার উপরে আসিয়া উপস্থিত

হইল। নিকটেই বালি ব্রিজ ও দক্ষিণেশ্বরের শ্রেণীবদ্ধ শিবমন্দির। ভক্তিভরে মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম। অদূরে কলিকাতার সৌধশ্রেণী ও হাওড়া পোল। গঙ্গাবক্ষে শত শত নৌকা ও ষ্টীমার। সবেগে জল ছিটাইয়া বিমান গঙ্গাবক্ষে অবতরণ কবিল। বিমান হইতে নৌকায় নামিতেই দেখি অনতিদূরে গঙ্গার পশ্চিম তীবে দণ্ডায়মান আমার দাদা, বৌদি, ভাইয়েরা, পুত্র-কন্যাগণ, আমার চারি বৎসরের ভাইপো দীপু, বন্ধুবর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং তাহাদেব সঙ্গে আমার রোগম্লানা পত্নী।

শেষ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১৬	৫৮১	৪৮১
৫	১৭	৫৮১	৪৮১
২৯৫	৮	বন্ধুদ্বয়	বন্ধুত্রয়
৩১৫	২	আমাদিগকে	আমাকে
৩৩৩	১২	ওযাডামালা	ওযাডামানা
৩৩৫	৬	সতস	সহিস